

বড়পীর সাহেবের জীবনী

৩

আশ্চর্য্য কেরামত ।

ধর্ম্মবলে বলি লোক জগত মাঝার ।
বড়পীরের কেরামতে মুক্তি এ সংসার ॥

খলিসানি নিবাসী
মৌলবী আজহার আলি কর্তৃক

প্রণীত ।

প্রথম সংস্করণ ।

কলিকাতা,

৩৩৭ নং অপর চিৎপুর রোড, মোলেনমানী মুগ্ধ পুস্তকালয় হইতে

মোহাম্মদ মোলেনমান ও মোহাম্মদ

আফতাবুদ্দীন ও মোহাম্মদ কোমরুদ্দীন

দ্বারা প্রকাশিত ।

[মূল্য ১।০ দেড় টাকা ।



এম্, ডি, প্রেস;

কলিকাতা,—১২ নং গোপীকৃষ্ণ পালের লেন হইতে,

শ্রীকৃষ্ণবিহারী বর্ধন দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩২৪ সাল।

বঙ্গের তাপসকুল রত্ন হজরত মওলানা সাহ সূফি
মোহাম্মদ আবুবকর সাহেবের প্রদত্ত

সমালোচনা ।

আমি কলিকাতা গবাণহাটা ৩৩৭ নং অপার চিংপুর বোডস্থ
সোলেমানী স্কুলে পুস্তকালয়েব সত্বাধিকারি মুন্সী মনিরুদ্দীন মোহাম্মদ
'এও সঙ্গ কর্তৃক প্রকাশিত হজরত পিরগণীব দস্তগীর মহবুবে সোবহানী,
গওসে সামদানি সৈয়দ শেখ আবুল কাদীর জি'লানি কুদ্দস্ সরহল
আজিজ রহমাতুল্লাহের জীবন চবিত্ত ও আশ্চর্য্য কেরামত নামক
কেতাব খানির মোটামুটি বিষয় গুলি দেখিয়া ও কতকাংশ শুনিয়া
অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। আজকাল এই প্রকার কেতাবের প্রচার
বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। প্রকাশক সাহেব সূযোগ বুঝিয়া ঠিক
সমরোপযোগী কেতাব খানি প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া ধন্তবাদের
পাত্র। এইরূপ গ্রন্থের যতই প্রচার হইবে ততই সমাজের উপকার
হইবে। আমি সর্ব-সাধারণকে ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

মোহাম্মদ আবু বকার আফি আনছ ।

আভাস ।

যিনি করুণাময় সৃষ্টিকর্তা, ত্রিঙ্গগতের অধীশ্বর, তাঁহাবই দয়া রূপে একমাত্র সহায় । আমি যখন খোদাতায়ালার রূপায় আরবী ও উর্দু গ্রন্থ হইতে হজবত আলি করমুল্লাহে অজহব জীবনী লিখিলাম তখন অনেকেই তাঁহার জীবনী পাঠ করিয়া তাঁহার সাধুত্ব ও বীরত্বের পরিচয় পাইলেন । কিন্তু জগতে একটা অভাব রহিয়া গেল । বড়পীর সাহেবের জীবনী পাঠ করিতে কেহই পাইলেন না । তজ্জন্ত ঢাকা জেলাব অধিবাসী ধার্মিক প্রবর মুন্সী মোহাম্মদ সোলমান মিয়া আমাকে বড়পীর সাহেবের জীবন বৃত্তান্ত লিখিতে অনুরোধ করেন । আমি তাঁহার অনুরোধে বাধ্য হইয়া আমি দিল্লি ভ্রমণকালে সেখান হইতে যে পুরাতন গ্রন্থ আনিয়াছিলাম সেই প্রাচীন গ্রন্থকেই জাগ্রাব সম্বল করিতে হইল । হজবত বড়পীর সাহেবের শিষ্য জনাব মোলানা শাহ মহাম্মদ এলমোল একিন খোলাফায়ে রাশেদিন হামদানি কাদরি সাহেব সোলতানোল আজকার ও মনাকর গওসোল আবরাব গ্রন্থে স্থানে স্থানে আরবী রাখিয়া উর্দু ভাষায় যাহা তছনিফ করিয়াছিলেন । আমি উক্ত মহাত্মার ঐ প্রাচীন পুস্তক গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালায় বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় হজবত বড়পীর সাহেবের জীবনী লিখিলাম । তবে যদি বড়পীর সাহেবের কোনরূপ কেহ পুস্তক লিখিয়া থাকেন তাহাতে সম্পূর্ণ নাই বড়পীর সাহেবের দশ বিশটা কেবামতের কথা লেখা থাকিতে পারে এইমাত্র । কিন্তু এই গ্রন্থে মনদের সহিত বড়পীর সাহেবের বাল্যকাল হইতে পরলোক গমনের শেষে যে যে ঘটনা হইয়াছিল, তাহাও লিখিত হইয়াছে । এখন আশা করি পাঠক পাঠিকা বড়পীর সাহেবের জীবনী পাঠ করিয়া সন্তোষ হইলেই পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব ।

বিনীত—শেখ আজহার আলি ।

এসলাম প্রচারক ।

হজরত বড়পীর সাহেবের জীবনী

বা

আশ্চর্য্য কেরামত ।

পরম করুণাময় সৃষ্টিকর্তা অনাদি অনন্তময় যিনি বিশ্ব জগতের অধীশ্বর, সেই দাতা দয়ালু নিরঞ্জন নিরাকার নিজ মহাত্ম্য প্রকাশ করিবার মানসে এক অপূর্ব মনোহর জ্যোতির সৃষ্টি করিয়া, তাহা হইতে আকাশ, কুরশি, লহোহ, কলম, স্বর্গীয় দূত, স্বর্গ, মর্ত, আকাশ, পাতাল, চন্দ্র, সূর্য্য, রাত্র, দিবা, উজ্জ্বল, অন্ধকার, গ্রহ-উপগ্রহ, রাহু, কেতু, নক্ষত্র, বিদ্যুত, সাগর, মলিল, নদ, নদী, অগ্নি, বায়ু, গিরি, পর্বত, অরণ্য, প্রান্তর, ভূগ, লতা, বৃক্ষ, কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী, দেব, দৈত্য, ভূচর, খেচর, দানব ও মানব ইত্যাদি সকল প্রাণীর সৃজন করিয়াছেন । তৎকারণেই সেই অদ্বিতীয় বিশ্ব-পালক সৃষ্টি কর্তারই সর্ববিধ প্রশংসা করাই কর্তব্য । সকল মনুষ্যগণেই এই ধরাতলে আসিয়া একমনে একধ্যানে নিরঞ্জন নিরাকারের উপাসনা, অর্চনা করিতে

করিতে, সত্যধর্মের থাকিতে থাকিতে, পৃথিবীর মায়ায় ভুলে, ঐশ্বর্যের মদগর্বে, প্রিয়জনের প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া, কু প্রকৃতির বশীভূত হইয়া, ক্রমে ক্রমে ভ্রমাস্ত্রে পড়িয়া নানাবিধ দেবদেবী প্রতিমা, মূর্তি সকলের পূজা উপাসনা করিতে বাধ্য হইয়া পড়িল। দয়াময় বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি পৃথিবীর শেষ যুগে মনুষ্যের মতি গতি দর্শন করিয়া, পাণীগণকে উদ্ধার করিবার জন্য দয়াজ হৃদয়ে শেষ প্রেবিত পুরুষ মহাত্মা মহাম্মদ (সঃ) কে জগতে পাঠাইয়া দিলেন। যে কালে পূর্বে আরব দেশের অন্তর্গত মক্কানগরে মহাত্মা মহাম্মদের (সঃ) আদি পুরুষ একেশ্বর ধর্ম প্রচারক মহাত্মা এব্রাহিম (আঃ) বাস করিয়া বিশ্ব পালকের আদেশানুসারে পবিত্র কাবা শরিফ নির্মাণ করিয়া ছিলেন। তিনি সমস্ত জগতের লোককে ঐ কাবা শরিফে একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার নিরূপম নিরঞ্জম জগত পালকের উপাসনা করিবে নির্দ্বারণ করিয়া একটা মহাশব্দ 'শুনাইয়' ছিলেন, তাহাতে বহু দেশের লোক আসিয়া পবিত্র কাবা শরিফের মধ্যে একেশ্বর খোদাতায়ালার উপাসনায় সকলেই নিযুক্ত হন। ক্রমে সেই পবিত্র কাবা শরিফ হইতে অদ্বিতীয় একেশ্বরের উপাসনা অর্চনা বিলুপ্ত হইয়া পড়িল এবং সেই কাবাতে নানাবিধ প্রতিমা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া জন সাধারণ কর্তৃক পূজিত

হইতে থাকে, দেখিতে দেখিতে সমুদয় আরব বাসীগণ
 জড়োপাসক হইয়া, মূর্তি পূজাতেই মনোনিবেশ করিলেন ।
 এমন কি তাহারা তিন শত যাট প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন
 নামের দেব দেবীর মূর্তি গঠিয়া তাহাদেরই আরাধনা
 পূজা উপাসনা করিতে নিযুক্ত হয় । ঐ সময়ে পবিত্র
 মক্কা নগরে উচ্চগামী কোরেশ বংশে হুজবত মহাম্মদ
 (সঃ) জন্ম গ্রহণ করিয়া, তিনি তেতাল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম
 কালে প্রত্যাদিষ্ট হইয়া বিলুপ্ত একধরবাদ ধর্মকে
 পুনরুদ্ধার এবং কাবাকে পৌত্তলিকতা মুক্ত করিয়া,
 হজরত জ্বলন্ত উৎসাহের বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন ।
 পুনঃ পবিত্র কাবায় এক অদ্বিতীয় বিশ্ব পালক খোদা-
 তায়ালার উপাসনা করাইতে এবং দিন এসলাম
 প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন । প্রথমাবস্থায় হজরত আলি
 করমুল্যা আজহু এসলাম ধর্ম গ্রহণ পূর্বক হজরতের প্রচার
 সাহায্যে অগ্রগামী হইয়াছিলেন । আলি করমুল্যা
 আজহুর বাল্যকালে সত্য ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে
 কয়েকজন কোরেশ ও হাশেম বংশীয় বিশ্বাসী প্রোঢ়, যুবা
 ও বীরপুরুষগণ ক্রমে তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিয়া
 তাঁহার সত্য ধর্ম প্রচারে সহায়তা করেন । তন্মধ্যে
 আবুবকর, ওমর ফারুক, হজরত ওসমানগণি, আলি
 করমুল্যা আজহু ও মহাবীর হজরত হামজা ইহার প্রধান

ছিলেন। যখন মহাপুরুষ হজরত মহাম্মদ (সঃ) সদলে মক্কা নগরে এসলাম ধর্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময়ে অংশীবাদী পৌত্তলিক জাতি কুটুম্বগণ কর্তৃক ক্রমাগত দশ বৎসর পর্যন্ত অতিশয় উৎপীড়িত হইয়া নানা কষ্টে কালযাপন করিতে থাকেন। পরে বিধর্মীদের নিদারুণ নিপীড়নে হজরতের মক্কায় বাস করা ছাড়িয়া হইয়া উঠে। অবশেষে মদিনাবাসীদের আহ্বানে সহচর সহ প্রিয় জন্মভূমি মক্কা পরিত্যাগ করিয়া মদিনা নগরে যাইয়া আশ্রয় লন। মদিনাবাসীগণ হজরতকে সবাৎসব সহ আশ্রয় দিয়া, তাঁহার স্নেহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া এবং এসলাম ধর্মের সত্যতা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া, সকলেই এসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন। আনসার ও মহাজেরগণ নানা উপায়ে এসলাম ধর্ম প্রচারে হজরতের সাহায্য করিতে বদ্ধ পরিকর হন। তাঁহার মধুর উপদেশালোকে কোটি কোটি পাপীর অন্তরের পাপ তিমির দূরীভূত হইয়া ভীষণ নরকাগ্নি হইতে পরিত্রাণ পাইয়া আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল, সেই এসলাম ধর্মের পূর্ণজ্যোতিতে সকলেই পুণ্যবান হইয়া জ্যোতির্ময় মূর্তি ধারণ করিলেন। অবশেষে মক্কানগর জয় করিয়া কাবা শবিফেব মধ্যস্থিত মূর্তি সকল চূর্ণ বিচূর্ণ করতঃ একমাত্র খোদাতায়ালার উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কত কত লোক হজরতের

দয়া ও স্নেহে বিমুক্ত হইয়া, অতি অল্প দিনের মধ্যে প্রায় সমুদয় আরববাসী এসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইলেন এবং সমুদয় আরবদেশ হইতে প্রতিমা পূজা বিলুপ্ত হইয়া, একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকারের পূজা ও উপাসনা হইতে লাগিল । হজরত মহাম্মদ (সঃ) দশবৎসর মাত্রে মদিনায় বাস করিয়া সত্য ধর্ম প্রচার করিতে কবিত্তে ইহলোক হইতে পরলোকে গমন করিলেন । হজরতের পরলোকাশ্বে তাঁহার চারিজন প্রচার বন্ধু খলিফার পদ প্রাপ্ত হইয়া, দেশদেশান্তরে এসলাম ধর্মের পুনর্জ্যোতি বৃদ্ধি করেন । কিন্তু হজরত আলি করমুল্যা অজহর নেতৃত্ব কালেব শেষ সময় হইতে, খারেজীয়া সম্প্রদায় গঠিত হইয়া দিন এসলামকে জ্বরাজীর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল । তাহার পরে হজরত হোছেনের সময় কালে এজিদ দামেস্কেব বাদসাহ হইয়া, মোস্লেম গণের প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ কবিল । তৎপরে রাফজি ও শিয়া দল গঠিত হইয়া বিদ্বেষ বশত, ঐ সময় হইতে ক্রমে চাব্বিশত বৎসর মধ্যে দিন এসলামকে জ্বরাজীর্ণ কবিয়া, এসলাম মণ্ডলীকে হীন অবস্থায় পরিণত করিল ।

পরম করুণাময় দাতা দয়ালু পুনর্বার দিন এসলামকে নববলে বলিয়ান করিবার জন্ত পরম পবিত্র সৈয়দ বংশ হইতে হোসেন কুলে, পরম তাপসিক ধারিকুল শ্রেষ্ঠ

অদ্বিতীয় এক মহানুভব মহাত্মার সৃষ্টি করেন এবং সেই মহাত্মাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করত, পির দস্তগির, আব্দল-কাদের মহিউদ্দিন জ্বিলানী নামে অভিহিত করিয়া, কাদুরিয়া তরিকার নেতা করিয়া এই ধরাতে ধর্মের সত্যতা দেখাইতে প্রেরণ করেন । তিনি সত্য পথদ্রষ্ট পথিকের পথ প্রদর্শকের জন্য এসলাম ধর্মের উজ্জ্বল আলোক হস্তে করিয়া এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া-ছিলেন । যাঁহার উপদেশালোকে, মহামহা পাপী জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ভীষণ নরকাগ্নি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঋষিববের চরণ যুগলে আশ্রয় লইয়া শান্তি লাভ করিল । এমন কি চোর, দস্য, ভণ্ডাষি, জ্বালেম ও লক্ষ্যট পর্যন্ত পবিত্র চরণ কমল স্পর্শ করিয়া, পবিত্র হইতে পবিত্র হইয়া তাঁহারাও শত শত পাপীগণকে উদ্ধার করিয়া ছিলেন । যাঁহার বাক্যসুধা পান করিয়া লোকে যার-পর নাই সন্তোষ হইয়া, ঐ চরণ কমলে বিনামূল্যে বিকাইয়া যাইত । যাঁহার অলৌকিক কেরামত দর্শন করিয়া, আত্মবিস্মৃত হইয়া, মুখে কেবল আল্লাহু আল্লাহু নাম জপ করিতে করিতে, পুত্র পরিজন ত্যাগ করিয়া, বৈরাগ্য বেশে দেশ দেশান্তরে ও নিবিড়বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত, সেই মহাপুরুষ তাপস প্রবরের জীবন বৃত্তান্ত লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম । কতদূর যে কৃতকার্য হইতে

পারি, তাহা সেই অন্তর্যামী দয়াময়ই বলিতে পারেন
এবং গীরের চরণকমলে ভক্তি রূপধারা লিখনি চালাই
করিলাম ।

শান্তি ।

পরম তাপস প্রবর সর্বশ্রেষ্ঠ ঋষিকুল-চূড়ামণির
নাম লইতে হৃদয় ভক্তিরসে পূর্ণ হইয়া যায়, তাপিত
প্রাণ শীতল হয়, দক্ষ হৃদয়ে শান্তিবারি বর্ষণ হইয়া, প্রেম
শ্রোতে অঙ্গ ভাসিয়া বেড়ায় । যে নাম লইলে কোটী
কোটী পাপীর পাপতমির দূষীভূত হয় । যে নাম লইতে
মুসলমান ও হিন্দু সমাজ ক্রান্ত চাতকেব মত হাজারতের
সমাধী স্থান বোগদাদ শরিফ দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া
থাকে । যে নামের গুণে ধনী, নিধনী, আমির, ফকির,
অনাহাবী, ভিক্ষুক, তাপসগণ বিজন-বনে গহন-কাননে
নির্ভয়ে বাস করে । যে নামের গুণ কীর্তনে বন, জঙ্গল,
নদ, নদী, সাগর, মহাসাগর, প্রান্তর, পর্বত, পশু, পক্ষী,
বৃক্ষ, ফল, ফুল, জ্ঞানী মহাজ্ঞানী, রাজা, প্রজা, সকলেই
আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন । সেই নামের বর্ণনা
কথঞ্চিৎ কবিগণে আপন আপন গ্রন্থে ব্যাখ্যা করিয়া
গিয়াছেন যথা—

হাজারত মহাবুঝে সোধ্হানি, কোতোবে রক্ষানি, সুরেই-

জাদানি, গওসে সামদানি মহিউদ্দিন জিলানি, সৈয়দ আব্দোল কাদেব গিলানি, পীদস্তগিব আফজোলোলু আওলিয়া এই সকল বড়পীরসাহেবের গুণকীর্তন হইয়া থাকে এবং যে স্থানে সালেহিন মহর্ষিগণের মহিমা বর্ণনা করা হয়, সে স্থানে দয়াময় খোদাতাযালার দয়া বারি বর্ণন হইয়া থাকে, সেই জন্য মহামহা সাধু পুরুষগণে এই আরবী বচনটি পাঠ করিয়া গিয়াছেন ।

তানজ্জিলোরাহমাত এন্দা জেকরেচ্ছালেহিন ।

অর্থ

যে স্থানে সালেহীন সাধু পুরুষগণের মহিমা বর্ণনা হয়, নিশ্চয় সেই স্থানে খোদাতাযালার শান্তি বারি বর্ণন হইয়া থাকে ।

ভবিষ্যৎ বাণী ।

একদিন বেলা দুই প্রহরের সময় ভীষণ সূর্যের কিরণ তাপে মরুময় আরবদেশ ধু ধু করিতেছে, কেবল বালুকা-রাশি হইতে কুয়াসার ন্যায় অগ্নিময় ধূমরাশি বাহির হইতেছে । পথে ঘাটে জনমানবের গতিবিধি নাই । প্রথর সূর্য কিরণে আরবদেশ যেন একেবারে জনপ্রাণী শূন্য হইয়াছে; সে সময় কোন খানেই কোন পশু পক্ষীরও গমনাগমন দেখা যায় না । কেবলমাত্র মদিনা-

নগরের রাজপুরীর বহির্ভাগে একটা বৃক্ষ তলায় মান বদনে তিনজন মহাপুরুষের আগমন, তাঁহারা সেই বৃক্ষ তলে বসিয়া একটু শ্বশ্ব হইলেন। পাঠকগণ চিনিতে পারিয়াছেন কি ইহারা কে? ইহাদের মধ্যে একজন ভূষপালের কর্ণধর হজরত মহাপ্রভু মহান্নাদ (সঃ) দ্বিতীয় ভ্রাতৃত্বয় হজরত ফাতেমার উজ্জ্বল রত্ন কর্ণহার হৃদয়ের মানিক হজরত হোসেন ও হাসেন, মাতামহেব দুই পার্শে বসিয়া মনে মনে যেন কি চিন্তা করিতেছেন। হজরত রসুলে করিম (সঃ) ভ্রাতৃত্বয়কে চিন্তায়ুক্ত দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। হজরতের সরল প্রাণে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। আর তিনি সহ্য করিতে না পারিয়া মৃদুস্বরে এমাম হোসেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “যৎস হোসেন! কেহ যদি তোমার সঙ্গে শত্রুতাচরণ করে, কিম্বা তোমাকে অন্যায় করিয়া কষ্ট দেয়, তখন তুমি তাহার প্রতি সৎ ব্যবহার কি অসৎ ব্যবহার করিবে।” তখন হজরত এমাম হাসেন মাতামহকে বলিলেন, “হে পতিত পার্বন অধম ভরণ রহমাতুল্লেল আলামিন! যে আমাকে বিনা কারণে প্রহার করিবে কি আমার সঙ্গে শত্রুতাচরণ করিবে, তাহাকে আমি একবার দুইবার ক্ষমা করিব; কিন্তু তৃতীয় বারে নিশ্চয় তাহার পরিশোধ গ্রহণ করিব।” মানব কি দানব হইলেও

আমার করে তাহাব রক্ষা নাই, নিশ্চয়ই তাহার অধঃ-
পতন হইবে । যদ্যপি সে সাগর সলিলে, বন জঙ্গলে,
গিরীশুহায় লুক্কাইত হয় তথাপি তাহাব নিস্তার নাই ।
তৎপর হজ্জবত রসুলে করিম (সঃ)—এমাম হাসানকে
জিজ্ঞাসা কবিলেন, হাঃ হাসান ! তোমার সহিত যদি
কেহ শত্রুতাচরণ করে, কিম্বা বিনা কারণে তোমাকে
বিপদগ্রস্ত করে, তখন তুমি তাহাকে ক্ষমা করিবে কি
না ?” হজ্জবৎ প্রতি উত্তবে হজ্জবত মহর্ষি এমাম
হাসান কহিলেন, হে মাতামহ পূজ্যপদ মহাপুরুষ, যদি
কেহ আমার প্রতি শত্রুতাচরণ করিয়া অসৎ ব্যবহার
করে, আমি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া সৎ ব্যবহার
করিব, এবং তাহাকে অসৎ পথ হইতে সৎপথে আনয়ন
করিয়া বন্ধুত্বভাবে গ্রহণ কবিব, কখনই তাহার প্রতি
কোপদৃষ্টিে চাহিয়া দেখিব না । হাসানের মুখে ইহা
শ্রবণ করিয়া, হজ্জবৎ রসুলে মকবুল (সঃ) প্রফুল্লচিত্তে
সন্তোষ হৃদয়ে আশীর্ব্বাদ কবিত্তে করিত্তে কহিলেন ।
হে ভ্রাতৃগুণাধর, ফাতেমার অমূল্য নিধি ! তোমার ঐ
সৎকর্মের পরিবর্তে অবশ্যই আল্লাহুতায়াল্লা কৃপা করিয়া
তোমার পবিত্র বংশে, এক পরম শ্রেষ্ঠ তাপসিক
সালেহিমকে প্রেরণ করিবেন, তিনি জগৎমধ্যে আরাধ্য
দেবতা হইয়া পাপীগণকে উদ্ধার করিবেন । সকল

সাধুগণ তাঁহার দুর্লভ চরণ যুগল লইয়া আপনার স্বন্ধে ধারণ করিয়া সকলেই ধন্য হইবে এবং সেই সময় স্বর্গ হইতে পুষ্পরুষ্টি বর্ষণ হইয়া জগতের সাধুদিগকে পুলকিত করাইবেন। সে সময় সকল মর্ষি আনি আলাগণ তাঁহার কৃপাদৃষ্টির প্রার্থী হইয়া থাকিবে। জগতের সাধুপুরুষগণ তাঁহার নিকট হইতে গুণ্ড বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া জগতবাসীদের নিকট সর্বদা সম্মানিত হইয়া রহিবে। ধন্য তাঁহাবই ধন্য যাঁহারা গওসেমাগদানি আব্দল কাদের জ্বিলানির পদ দুখানি লইয়া আপন আপন স্বন্ধে ধারণ করিবে। অধম লেখক বলেন, যদি স্বপ্নেও কখন ও পদ স্বন্ধে ধারণ করিতে পাই, তাহা হইলে মানব জীবনের সার্থকতা লাভ করি।

একদিন হজরত হাসান রাজি আছাহুতায়লা আনহো নির্জজন গৃহে পরম করুণাময় বিশ্বপালকেব ধ্যানেন নিমগ্ন হইলেন। হাসানের ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গেই যেন সমস্ত জগৎ শান্তিময় ধারণ কবিয়াছে তাহা তিনি দর্শন করিয়া পুলকিত হইলেন। তাপস প্রবর ধ্যানযোগে উদ্ভেদৃষ্টি করিয়া দেখিলেন যে, আরশের দক্ষিণভাগে জ্যোতিষ্ময় একটা উজ্জ্বল বস্তু স্বর্গ আলোকিত করিয়া রহিয়াছে। সেই সুবিমল জ্যে তিঃতে সমগ্র স্বর্গের দূতগণ আনন্দে অধীর হইয়া বিভূ সন্নিধানে কবডোডে মঙ্গল কামনা

করিতেছেন । তিনি সেই অপরূপ রূপলাবণ্য দর্শনে
আনন্দে বিভোর হইয়া, বিস্ময় বিহ্বলচিত্তে জিজ্ঞাসা
করিলেন, হে উজ্জ্বল রত্ন তুমি কে এবং কি জন্মই বা
আরশ মध्ये বিরাজমান করিতেছ, তাহা বলিয়া আমার
মনের বিকার দূর করিয়া দাও । তখনই কৃপাময়ের
কৃপায় ঐ জ্যোতির্ময় বস্তু হইতে শব্দ হইল, হে সাধু-
প্রবর ! আমরা বহুপ্রাণী একত্রিত হইয়া ঈশ্বর গুণগানে
নিযুক্ত আছি, আলি করমূল্যে অজহর বংশে তোমার
কনিষ্ঠ ভ্রাতার বংশ মধ্যে নয় জন এমাম জন্ম গ্রহণ
করিবে, অবশিষ্ট একভাগ তোমারি বংশে একজন
এমাম বা কোতব হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবেন । তখন
তিনি আনন্দে অধীর হইয়া, খোদাতায়ালাার নিকট
প্রার্থনা করিলেন, হে দয়াময় বিশ্বপালক সৃষ্টিকর্তা
ইহাদের আদি বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া এ দাসের
প্রার্থনা পূর্ণ করুন । দয়াময় ভণ্ডের মনবাঞ্ছা পূর্ণ
করিতে আর কাল বিলম্ব না করিয়া বলিলেন, হে
আমার বান্ধবেব বন্ধু ! তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হোসেনের
বংশে নয়জন এমাম জন্ম গ্রহণ করিবেন এবং অবশেষে
তোমার বংশে আমার এক পবন বন্ধু তাপস শ্রেষ্ঠ
এমাম ও কোতব হইয়া জন্ম গ্রহণ করতঃ দিন এম্বলামকে
নব বলে বলিয়ান্ন করিয়া তুলিবে ।

প্রভু কর্তৃক দৈববাণী শ্রবণ করিয়া হজরত হাসান আনন্দ হৃদয়ে সেই দিনে স্ত্রী-সহবাসে নিমুক্ত হইয়াছিলেন, তাহাতেই খোদাতালার কৃপায় হজরত হাসান (রঃ) ঔরসে আব্দোল্যা জন্ম গ্রহণ করেন । তৎক্ষণ্য বড় পীর সাহেবের পিতৃ পুরুষগণের নাম একে একে বর্ণনা করা হইল ।

(১) এমাম জয়নাল আবেদিন, (রাজিঃ) ২ এমাম মহাম্মদ বাকের (রাজিঃ), ■ এমাম জাফর ছাদেক (রঃ) ■ এমাম মুসি কাজেম (রঃ), ■ এমাম মুসি আলি রেজা (রঃ), ৬ এমাম জোয়েদ (রঃ), ৭ এমাম আলি আস্কারি (রঃ), ৮ এমাম হাসন খালেছ (রঃ), ৯ এমাম মেহুদি আলায়হেছাল্লাম এই নয়জন এমাম কনিষ্ঠ ভ্রাতা হাসিন বংশে জন্ম গ্রহণ করিবেন । এই এমামগণের আমার লিখিত জীবনী দেখিলেই সমুদয় অবগত হইতে পারিবেন ।

হজরত বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানীর
পিতৃপুরুষগণের নাম ।

হজরত মহিউদ্দি আব্দোল কাদের জিলানী (রঃ)
পিতা হাসেন ও হোসেনী ইনি মৈয়দ বংশে পরিচিত

ইহার আদি পিতৃপুরুষ হজরত আলি করমুল্যা অজহ
 ১ ইহার পুত্র এমাম হাসান রাজি আল্লাহ্ আনহে
 ২ । ইহার পুত্র সৈয়দ আব্দোল্যা ৩ । সৈয়দ আব্দোল্যার
 পুত্র মুসাল জুন ৪ তৎপুত্র সৈয়দ আব্দুল মানি (রঃ)
 ৫ । তৎপুত্র সৈয়দ মুসা (রঃ) ৬ । তৎপুত্র সৈয়দ
 দাউদ (রঃ) ৭ । তৎপুত্র সৈয়দ মহান্মদ (রঃ) ৮ ।
 তৎপুত্র সৈয়দ জাহেদেহি (রঃ) ৯ । তৎপুত্র সৈয়দ
 আবু আব্দোল্যা (রঃ) ১০ । তৎপুত্র সৈয়দ ছফিউদ্দিন
 (বঃ) ১১ । তৎপুত্র সৈয়দ আবুসালে মুসা জঙ্গি (বঃ)
 ১২ । ইহার পুত্র সৈয়দ আব্দোল কাদের মহিউদ্দিন
 জ্বিলানি কুদসু সরহল আজিজ রহমাতুল্যাহে ।

হজরত বড় পীরের জন্ম বিবরণ ।

অদ্বিতীয় তাপস শ্রেষ্ঠ সাধু প্রবর মহাত্মা গওসল
 আজম মহবুবে সোবহানি আব্দোল কাদের গিলানী
 চারশত একাত্তর হিজরীতে পুণ্যভূমি গিলান সহরে
 সৈয়দ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন । ইহার পিতার নাম
 আবুসালে মুসা জঙ্গি (বঃ) ও পরম সতী সাধ্বী সদ-
 গুণবতী সৈয়দ বংশীয় রমণী রত্ন । আব্দোল্যা জোয়ে-
 বের কন্যা বিবি উন্মালখায়ের ফাতেমা ইহার জননী বা

গর্ভ ধারিণী মাতা। এই ঋষি বাননেব এ স্মৃতিত
 সুগন্ধ যুক্ত ফুল সৈয়দ বংশে মাতৃগর্ভে যখন অবতারণ
 হইল তখন উন্মাল খায়ের ফাতেমাব মাটি বৎসব বয়েস।
 তিনি প্রবীণা বেশ ধারণ কবিয়াছেন মতা কিলে অধিতায়
 সাধু পুরুষকে গর্ভে ধারণ করিয়া, কুয়ূদনীর মত বিমল
 ছটায় গিলান ভূমিকে বিমুক্ত করিয়া জগৎবাসী দিগকে
 পুণ্যের জ্যোতিঃ ছড়াইতে লাগিলেন। ফাতেমার
 প্রথম মাসে গর্ভের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে স্বপ্নে হজরত
 হাওাবিবি আসিয়া কহিতে লাগিলেন। ফাতেমা
 খায়েরোন নেসা। জগতে তুমিই ধন্যা, তোমারি
 পবিত্র গর্ভে গওসল আজম স্থান পাইয়াছেন। দ্বিতীয়
 মাসে হজরত এব্রাহিম (আঃ) পত্নী বিবি সারা খাতুন
 স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন, হাসন বংশের গুণবতী
 রমণী। তুমি গর্ভবতী হইয়াছ, তোমার পবিত্র গর্ভে
 নুর আজম জগৎ গুরু, গুণু তদ্বৈব সংবাদ দাতা স্থান
 পাইয়াছেন, এই বলিয়া অন্তর্ধান হইলেন। তৃতীয়
 মাসে বিবি আসিয়া স্বপ্নযোগে কহিলেন, তোমাকে
 আমি শুভ সংবাদ দিতে আসিয়াছি, সাবধান হও,
 তোমার গর্ভে রোসন জমির স্থান পাইয়াছেন। চতুর্থ
 মাসে ইসা নবির মাতা বিবি মরিয়ম স্বপ্নযোগে দেখা
 দিলেন, তৎপরে কহিলেন, তোমার ঐ গর্ভে জগতের

পূজ্যপাদ মহান সাধু পুরুষ স্থান পাইয়াছেন । পঞ্চমাসে শেষ নবি প্রেরিত পুরুষের পত্নী ; বিবি খোদেজা কেব্রিয়া বাজি আল্লাহ্ আনহা স্বপ্নযোগে কহিলেন, তুমি গর্ভবতী আছ এবং তোমর ঐ গর্ভে দিন এসলামের উজ্জ্বল রত্ন মহিউদ্দিন জিলানি বিদ্যমান রহিয়াছেন । ষষ্ঠ মাসে হজরত আয়সা রাজি আল্লাহ্ আনহা স্বপ্নে আসিয়া কহিলেন, যাঁহার অলৌকিক ক্ষমতাগুণে জগতের লোক মুগ্ধ হইয়া থাকিবেন, সেই মহা পুরুষ তোমার ঐ পবিত্রে কোড়ে স্থান পাইবেন । সপ্তম মাসে মহাবীর হজরত আলির সহধর্মিনী ফাতেমা জোহরা স্বপ্নে দেখা দিলেন, পরে হাত্ত বদনে কহিলেন যে, সৈয়দ কাননের প্রস্ফুটিত গোল প্রকাশ পাইবে এবং সে সময়ে আলিকুল আওলিয়াগণ মত্ত হইয়া তোমার ঐ আদরের ধনকে যত্ন করিবেন । অষ্টম মাসে হজরত হাসান পত্নী জয়নাব স্বপ্নযোগে কহিলেন, তোমার গর্ভে যে সাধু পুরুষ জন্ম লইয়াছেন, উনি দিন এসলামকে নববলে বলিয়ান করিয়া তুলিবেন । ঐ সাধু পুরুষের যশঃগান কাননের বিহঙ্গম কুল পর্যন্ত শাখায় প্রশাখায় বসিয়া গান করিতে থাকিবে । নবম মাসে হজরত হোসেনের সহধর্মিনী স্বপ্নে আসিয়া বলিলেন, হে গুণবতী রমণী রত্ন ফাতেমা খায়রননেমা । সাবধান হও, সর্বদা সতর্কে থাকিও ; স্তম্ভ উপস্থিত

আর অধিক কাল বিলম্ব নাই তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইবে জগতারাধ্য ধন প্রকাশ পাইবেন এবং গিলান নগরের গৃহে গৃহে সুখেব হিল্লোল প্রবাহমান হইবে। আজ পিরান পীরের মাতা সাহেবাণীর কি পরম সৌভাগ্য, যাহা জগতের কোন রমণী সাধবী সতীষ ভাগ্যেও ঘটে নাই, আজ ফাতেমা সাহেবাণীর ভাগ্যে তাহাই ঘটিল, দেখ স্বর্গেব দেব নারীগণ মাসে মাসে আসিয়া শুভ সংবাদ দান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। ধন্য, গওস মাতাই, ধন্য, দেখুক জগতেব পাণীগণ সাধুপুরুষ-গণের কীর্ত্তি কাহিনী দেখিয়া যেন সেই জগত পালক খোদাতায়ালাকে শত শত ধন্যবাদ দেয়।

বড়পীর সাহেব গর্ভে থাকিয়া ব্যাঘ্ররূপে
বাহির হইয়া একজন লম্পটিকে
সংহার করেন।

আজ পিরান পীরের মাতা সাহেবাণী পবিত্রে গর্ভে উজ্জ্বল রত্নের স্থান দিয়া, আনন্দ সাগরে ডাসিয়া বেড়াইতেছেন। আবার সময়ে সময়ে মনে মনে কত কি ধারণা করিতেছেন। হায়, কখন আমার ভাগ্য আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইবে, কতদিনে গর্ভস্থিত

বালককে প্রসব করিয়া, তাঁহার চন্দ্রমুখ দর্শনে সকল
 যাতনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া শান্তি পাইব ।
 হায়, আমার মে সৌভাগ্য কবে হইবে যে, স্বল্প
 বয়সে ছেলের মা হইয়া, বৎসকে ক্রোড়ে করিয়া
 স্নেহভরে আদর ক'রে বালকের মুখচন্দ্রিমায় লক্ষ লক্ষ
 চুম্ব দান করিয়া তাপিত হৃদয় শীতল করিব । আমি
 যাহা স্বপ্নে দর্শন করিতেছি, ইহাকি সত্য, হা ! সকলই
 সত্য, যখন নয় মাসের গর্ভ হইয়াছে নিশ্চয় বিধাতার
 কৃপায় সন্তানের মুখ দেখিয়া মহা আনন্দে আনন্দিত
 হইব । হায়, কালের কি কুটিল গতি, দৈব বিড়ম্বনা
 কি ভয়ানক ব্যাপার, অদৃষ্ট দেবীর কি চঞ্চলা স্বভাব,
 গ্রহ নক্ষত্রের কি ভয়ানক দৃশ্য, কাহার ভাগ্যে যে কখন
 কি ঘটে কে তাহা বলিতে পারে । গ্রহতারা ছায়ারূপে
 সর্বদাই সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে । আজ গ্রহ-
 তারা প্রচণ্ডমূর্তি ধারণ করিয়া, ফাতেমা সাহেবাণীর
 অদৃষ্ট পথে উদয় হইল । হঠাৎ দ্বারদেশে একটি ভিখারী
 ফকির আসিয়া ইলাল্লা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে একটি জিকির
 ছাড়িল । তৎসঙ্গে সঙ্গেই বলিল, বাটীতে কে আছে
 গো ? দ্বারে অনাহারী ভিক্ষুক ফকির মিস্কিন দণ্ডায়মান,
 যদি কেও আল্লার বান্দা থাকত, দয়া করিয়া ক্ষুধার্থ
 ফকিরের সংবাদ লও । বড়ই ক্ষুধা পাইয়াছে আর সহ্য

করিতে পন্নিনা । ছাই উদরের জ্বালায় অস্থির হইয়া
 পড়িয়াছি । -যে সময় ফকির জিকির করিতেছিল, মে
 সময় কেবল মাত্র বড়পীরের মাতা সাহেবাণীই বাটাতে
 ছিলেন । কেইবা অনাহারী ফকিরের তদ্ভাবধান করে,
 কেইবা তাহার সঙালের জওয়াব দেয়, সমস্ত মহল
 নিস্তরক একটি প্রাণীর সাড়া শব্দ নাই । ফকির বাটা
 হইতে কোন লোকের শব্দ না পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে
 কহিল, কি আশ্চর্য্য এমন আলিসান মহল হইতে
 কেহই এই গরিব মিস্কিন ফকিরের কথার উত্তর
 দিল না এবং আমার ছুরাবস্থার প্রতি চাহিয়াও দেখিল
 না । হা ছুরাদৃষ্ট ভাগ্যে, একটু পানি পাইলেও জল
 পিপাসা নিবারণ করি, আরত আমার চলিবার শক্তি
 নাই হায়, হায়, অতিথির মুখের দিকে কেহই ফিরে
 চাহিল না ; সোবহানাল্লা ! আবার দম ফেলিয়া কাদ
 কাদ স্বরে বলিল, এ আলিসান মহলে কে আছে গো ?
 অনাহারী ক্ষুধার্থ ফকিরকে কিছু খাইতে দিয়া প্রাণরক্ষা
 কর । আমি তোমাদের বাটা হইতে বিগুথ হইয়া
 ফিরিয়া গেলে, তোমরা খোদার কাছে কি বলিয়া
 মুখ দেখাইবে, রোজ কেয়ামতে কি বলিয়া জওয়াব
 দিবে, তোমাদের কি পাপের ভয় নাই আহা ! দয়াদে-
 হদয়া সরল অন্তরা স্নেহময়ী পিরান পীরের মাতা সাহেবাণী,

ফকিরের কাতব ও করুণস্বর আর সহ্য - করিতে না পারিয়া পর্দার আড়াল হইতে কিঞ্চিৎ আহাৰ্য্য বাসনে লইয়া সেই ছুষ্ঠ ফকিবকে হাত বাড়াইয়া দিতে গেলেন । যে সময় হজরত ফাতেমা খায়রননেসা আহাৰ্য্য লইয়া দেন, সেই সময় ফকির বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, এ মহলে একটা রমণী ব্যতীত আর অন্য কেহই নাই । তখন লম্পট ফকির কু-প্রবৃত্তি পূর্ণ করিবার মানসে স্ববলে ফাতেমার অন্তর মহলে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল । ফাতেমা লম্পট ও ভণ্ড ফকিরের ছুরাশা দেখিয়া সতীত্বনাশের ভয়ে একাকী অন্তর মহলের কোণে যাইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন, এবং মুখে সতীত্ব ধর্ম রক্ষা করিবার জন্য খোদাতায়ালা নিকট প্রার্থনা করিতে করিতে বলিলেন, - হে বিশ্ব পালক অন্তর্যামী করুণাসিন্ধু তুমি আমার অন্তরের সকল ভাবই অবগত আছ, এ সময় কৃপা করিয়া এ নিঃসহায়া কিস্করীকে নির্জন গৃহে রক্ষা কর । সে সময় হজরত গওসল আজম পিরান পীর রহুমাতুল্যা আলায়হে পবিত্র-গর্ভে থাকিয়া মাতার এ ভয়ানক বিপদ দর্শন করিয়া, আর নিশ্চিন্ত ভাবে মাতৃগর্ভে থাকিতে পারিলেন না, তখনই হজরতের পবিত্র আত্মা মাতৃগর্ভ হইতে অদৃশ্য হইয়া লয়হ মোফুজে উপস্থিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ

দেহ পরিবর্তন করিয়া ব্যাঘ্র মূর্তিতে ভণ্ড ফকিরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন সে দুই ফকির অকস্মাৎ ব্যাঘ্র দেখিয়া, প্রাণভয়ে চীৎকার ছাড়িতে লাগিল, কিন্তু অধিক্ষণ আর চীৎকার করিবাব সময় পাইল না। সেই ব্যাঘ্রের হাতেই প্রাণ হারাইয়া পঞ্চ পাইল। দুই ফকির দুঃখভঙ্গির প্রতিকল হাতে হাতেই ফলিয়া গেল।

হজরত আব্দুল কাদের মহিউদ্দিন জ্বিলানী রহমাতুল্যা আলায়হে যে সময় মাতৃগর্ভ হইতে অদৃশ্য হইয়া, ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করতঃ ফকিরের প্রাণ সংহার করিয়া পুনরায় মাতৃ-গর্ভে ছিলেন, তাহা তাঁহার মাতা সাহেবাণী জানিতেন না। যখন হজরত বড়গীর সাহেবের বয়স আট বৎসর মাত্র, সে সময় তাঁহার মাতা কোন কারণ বশতঃ রাগান্বিত হইয়া বলিয়াছিলেন, রে দুঃখ বালক! আমার স্নেহ একবারেই কি বিস্মরণ হইয়াছে। মায়ের কথায় এরূপ ভাবে তিনি প্রতি উত্তর করিয়াছিলেন যে, মাত! আমার উপকার কি তুমি একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছ। যেদিন তুমি একাকী ফকির হস্তে পতিত হইয়া সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছিলে, সে সময় আমি তোমার গর্ভ হইতে অদৃশ্য হইয়া ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করতঃ সেই দুই ফকিরের

প্রাণবধ করিয়া তোমার কি উপকার করি নাই ?
 তাঁহার মাতা পুত্রের মুখে, তাঁহার এরূপ 'অলৌকিক'
 ক্ষমতার কথা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য হইলেন এবং
 গুণধর পুত্রকে শত শত বার আশীর্বাদ করিতে
 লাগিলেন ।

চার শত সত্তর বা একাত্তর হিজরীর উনত্রিশে সাবান
 মাসের সন্ধ্যার পূর্বে আকাশে ঘোরতর মেঘের উদয়
 হইল । ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতে লাগিল, শোঁ শোঁ
 করিয়া ঝড় বহিতে লাগিল, কখন কখন বিদ্যুৎ হইতে
 লাগিল, তথাপিও লক্ষ লক্ষ লোক রমজানের চন্দ্র
 দেখিবার জন্য, উৎসাহের সহিত একদৃষ্টে আকাশের
 দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন । কিন্তু আকাশে নব
 মেঘের ঘটায় গিলানবাসীরা পরিত্র রোমজান শরিফের
 চন্দ্র কেহই দেখিতে পাইলেন না । হতাশ হইয়া
 গৃহবাসীরা স্ব স্ব গৃহে রাত্তিকালে শয়ন করিল । সমস্ত
 রাত্তিতে মেঘের গভীর গর্জনে, কাহার বা নিদ্রা হইল
 কাহার বা নিদ্রা হইল না । এমন দুর্গম রাত্তির মধ্যে
 গিলান নগরে ফাতেমা দেবী একটি কুটির মধ্যে প্রসব
 যাঁতনায় অস্থির হইয়া ছট ফট করিতেছেন । প্রতিবাসী
 রমণীগণ আসিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্য
 নিযুক্ত আছে । কিন্তু কচের রজনী শীঘ্র প্রভাত

হইতে চায়না যেন কতই ভার বোধ হইতে থাকে ।
তথাপি পরিণাম কাহার না আছে ? শৈশবের পর
যৌবন, রোগের শেষে আরোগ্য, অন্ধকার অমানিশার
পর পূর্ণিমার জ্যোতিঃ, রাত্রির শেষে দিবা, কষ্টের
পর সুখ; সেইরূপ ফাতেমা দেবীর দুঃখের রজনী
প্রভাত হইয়া সুখের দিবা উপস্থিত হইল । দেখিতে
দেখিতে মাতৃগর্ভ হইতে হজরত গওসল আজম সুমিষ্ঠ
হইয়া, হজরত রহুলে করিম (সঃ) মের উন্মত্তের
জন্ম মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন ।

একজন গিলানবাসী মহাজ্ঞানী বর্ণনা করিয়াছেন যে,
যখন উন্মত্ত খায়ের ফাতেমা দেবীর একঘটি বৎসর
বয়েস, সেই সময় তিনি পুত্র সন্তান প্রসব করেন ।
সকল ঐশ্বর্য্যকর্তার মতে, হজরত ফাতেমা সাহেবাণী, চার
শত সত্তর বা একাত্তর হিজরীর রোমজান মাসের প্রথম
দিবস সোমবার দিনে ভোরের সময় একটা পুত্র রত্ন
প্রসব করেন । ফাতেমা খায়েরন নেসা শুভদিনে শুভরূপে
নিরূপম রূপলাবণ্য যুক্ত পুত্র রত্ন লাভ করিয়া অসীম
আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িলেন । জগতারাধ্য ধন
মহান সাধু পুরুষকে জোড়ে পাইয়া মাতা যেন আজ
আকাশের পূর্ণ চন্দ্রকে নিজ জোড়ে পাইলেন । মর্ত্তে
বাস করিয়া যেন স্বর্গের সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন,

দরিদ্র ব্যক্তি যেন গুপ্ত ধন প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে অধীরা হইলেন । সমস্তান বৎসলা জননী স্নেহভরে পুত্রের মুখে শত শত চুম্বন করিতে লাগিলেন, পিরান পীরমাতা অমূল্য রত্ন কোলে পাইয়া জগতের সমুদয় দুঃখ যন্ত্রণা ভুলিয়া অনিমেঘ নয়নে পুত্রের মুখচন্দ্রিমা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । পুত্রের মাতা স্কুমার নবজাত শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া, যেন আকাশের শশধরকে ক্রোড়ে পাইয়াছেন বলিয়া স্বর্ধানুভব করিতে লাগিলেন । আবু সাঈদেহের পুত্র হইয়াছে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া প্রতিবাসী আত্মীয় স্বজন বর্গ শিশুবরকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল । সকলে বালকের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল যে, স্বর্গীয় রূপ জ্যোতির্ময় মূর্তিতে মাতৃক্রোড় আলোকিত করিয়া রহিয়াছেন । একশত পূর্ণচন্দ্রের বিমল ছটায় যত না সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়, শিশুবরের মুখচন্দ্র ততোধিক শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছে । তাঁহার আজানু-লম্বিত স্ককোমল বাহুযুগল, ভ্রমরকৃষ্ণ নয়নদ্বয়, স্কন্ধে রত্নের পদচিহ্ন (১) রঙজবা রাগরঞ্জিত অধরোষ্ঠ হইতে যেন ক্রুপাময় বিশ্ব পালকের গুণ কীর্তন স্তব স্তুতি

(১) হজরত রশূল করিম (সঃ) মাতৃগর্ভ হইতে পৃষ্ঠদেশে মহবে নবু-ওয়াতের চিহ্ন আনিয়াছিলেন । আর বড়পীর সাহেব মাতৃগর্ভ হইতে হজরত রশূলের পদচিহ্ন পৃষ্ঠদেশে আনিয়াছিলেন ।

সর্বদাই প্রকাশ পাইতেছে প্রসব গৃহের চতুর্দিকে স্বর্গীয়, দূতগণে বেফটন করিয়া আনন্দ মনে দরুদ শব্দে পাঠ করিতেছেন ।

জোনাব মোলানা নুব মহাম্মদ বড়পীরের মোদুদ গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মহবুবে সোবহাণী আব্দুল কাাদের জেলানী • যখন গিলান ভূমিতে ভূমিষ্ঠ হইলেন, সে সময় জগতের তাপসিক সাধু পুরুষগণের ভাগ্যে শোবেময়ারাজ রজনী প্রকাশ পাইল এবং সে সময় সকল অলি আল্লাহ্গণই বড় পীরের সম্মান রাখিয়া, আপন আপন মস্তক হেঁট কবিয়া দিল অর্থাৎ তাঁহার চরণে দুখানি স্কন্ধে বাখিবার জন্য একযোগে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন ;—

এস পীর দস্তগীর মহবুবে সোবহাণী ।

স্কন্ধে মোদের রাখ দিয়ে চরণ দুখানি ॥

ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করিয়াছেন, ঘেরজনীতে মহবুবে সোবহাণী ভূমিষ্ঠ হইলেন, সেই পুণ্যাহ রজনীতে খাতেমলনাবিহীন সাইয়েদল মোরসালিন শেখু নবি প্রেরিত পুরুষ, আপন মহচয় ও আওলিয়াগণকে সঙ্গে লইয়া, সৈয়দ আবু সালেহের গৃহে আসিয়া

পদার্পণ করিলেন এবং আপন দলবল লইয়া, নিজ বংশধর বা গুণধর পিরান পীরের প্রতি দরুদ পাঠ করিতে লাগিলেন ।

দরুদ ।

ইয়ারাবেক আয়জিনি মেন হোবেক মাহবুবেকা ।

ও হাবলি মেন এসকে মায়্ শুকেকা ।

রাবিগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত আবু সালেহু এই দরুদ শরিফ শ্রবণ করিয়া বড়ই আশ্চর্য্য বোধ করিলেন । তাহার পরক্ষণেই শুনিতে পাইলেন, হে আবুসালে ! জগতে তুমিই ধন্য, তুমিই ভাগ্যবান ; যে হেতু তোমার ঔরসে ঈশ্বর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষের বন্ধু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । তুমি ঐ বালকের নাম রাখ, মহবুবে সোবহাণী অর্থাৎ ঈশ্বরের বন্ধু, পুনরায় শুনিতে পাইলেন, জগতে ইহার 'আক্দল' কাদের নাম প্রচার হইবে, অর্থাৎ যথার্থ ইনি প্রভু ভক্ত বা বিশ্বপালক জগত কর্তার প্রকৃত দাস হইবেন ; আশীর্বাদ করি, তোমার ঐ পবিত্র রক্ত গুণধর পুত্র বংশাবলী উজ্জ্বল করিয়া, জগতে মহান পূজ্যপদ লাভ করেন । আবু সালেহু এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া, মহা হর্ষে হরষিত

হইয়া খোদাতায়ালার গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, এবং শোকরের দুই রাকাত নামাজ পড়িয়া, পুত্রের মঙ্গল কামনা করিলেন । আমাব হবিবে দোজাহান রসুলে করিম (সঃ) মহবুবে সোবহানির প্রাত্তি যে, আশীর্বাদ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা ফজায়েল গওসিয়া নামক গ্রন্থের মধ্যে, এই হাদিস আলি করমুল্যা অজুহু হইতে বর্ণিত আছে ।

হাদিস ।

কালী রসুলোল্লাহে (সঃ) আল্লাহোম্মারহাম খোলাফাএ আল্লাজিনা ইয়াতুনা মে-বায়দেইয়াল্লাজিনা ইয়ারউনা আ হাদিসে ওা সোনানি ওা ইউ আল্লেমু নাহান্নাসা ।

অর্থ ।

হজরত রসুল করিম (সঃ) বলিয়াছিলেন, হে বিশ্ব পালক খোদাতায়ালা (রহম) দয়া কব আমার প্রতি-নিধিত্ব (খলিফার) পর এবং যে আমার পরে জগত-গ্রহণ কবিয়া ধবাধামে আসিবেন, যে মহাজ্জা আমার হাদিস বর্ণনা করিয়া, আমার তরিকা (পথ) ভালরূপে সকলকে শিক্ষা দিবেন ।

জোনাব মোলানা নুর মহাম্মদ সাহেব আপনাব উর্দু গ্রন্থের মধ্যে লিখিয়াছেন যে, যে তারিখে হজরত গওসল আজম জন্ম গ্রহণ কবেন, ঐ সময়ে তাঁহার কুপায় একটি আশ্চর্য ঘটনার সজ্জটন হয়। তাঁহার জন্ম ভূমি গিলান সহরে ঐ দিনে পুত্র সন্তান ব্যতীত কোন রমণী কন্যা প্রসব কবেন না। কথিত আছে ঐ পবিত্র গিলান সহরে এগার শত রমণী গর্ভবতী ছিলেন, তৎ সমুদয় ভাগ্যবতী রমণী পিরান পীরের জন্ম-দিনে পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া আপনা আপনি আনন্দ সাগবে ভাসিতে থাকে। হজরতের সমবয়স্ক ১১ শত বালকগণ তাঁহার সঙ্গ লাভ করিয়া, এককালের মধ্যে একবারে সকলেই মহা উপস্থী অলি আল্লাহ্ হইয়া-ছিলেন। হজরত গওসল আজম ভূমিষ্ঠ হইয়া বিশ্ব পালক খোঁদাতায়ালাব প্রশংসা করিতেছিলেন, সে সময় ষাঁহাবা প্রসব গৃহে ফাতেমাব সেবার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারা বর্ণনা করিয়াছেন যে, বালকের গোলাপসম ছুই ওষ্ঠ আন্তে আন্তে হেলিতেছে, আর ঐ ওষ্ঠধর হইতে অদ্বিতীয় বিশ্ব পালকের নাম জপনা হইতেছে। প্রত্যেক মনুষ্যের জন্য ঈশ্বব সন্নিধানে মঙ্গল কামনা করিতেছেন কেবল একদৃষ্টে বিশ্ব পালক সৃষ্টি কর্তার রচনা কোশল দেখিতেছেন। যখন তিনি

সৃষ্টি কর্তার দিকে নয়ন, মন, শ্রোণ, কর্ণ যুগল একাত্রে চিতে রাখিয়া ছিলেন, সে সময় দয়াময় খোদাতায়াল স্বর্গের দ্বার খুলিয়া দিতে আদেশ করিলেন এবং স্বর্গ হইতে ফেরেস্তা স্বর্গীয় দূতদিগকে শান্তি বারি বর্ষণ করিতে, পবিত্রে ভূমি গিলান সহরে পাঠাইয়া দিলেন, দেখিতে দেখিতে স্বর্গীয় দূতের আগমনে গিলান ভূমি পরিপূর্ণ হইয়া গেল, তাঁহারা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ঘন ঘন দরুদ শরিফ পাঠ করিতে লাগিলেন ।

দরুদ ।

আল্লাহোন্মা সাল্লেআলা সৈয়েদেনা মহান্মাদি সৈয়েদেল মরসালিন । এরসাদে আওলাদেহি সেখ আব্দুল কাদের মহিউদ্দিন কাদবী তবিকাতে আওালিন ॥

বড়পীর সাহেবের শিশুকালের রোজা ।

সেখ আবুসৈয়দ রহমাতুল্যা আশায়হে বর্ণনা করিয়াছেন যে, গওসলে আজম বড়পীর সাহেবের মাতা সাহেবাণী এরূপ বলিয়াছেন, আমার পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া সোবে সাদেকের পূর্বে কেবল আমার দুগ্ধ পান করিয়া ছিল, কিন্তু সোবে সাদেকের পর হইতে আর আমার

স্তনের দুগ্ধ পান করিলেন না । তাহার পরে বেলা অধিক হইতে কয়েক জন প্রতিবাসী রমণী আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমরা সন্ধ্যার সময় রোমজানের চন্দ্র দেখিতে পাই নাই এখন আমরা রোজা (উপবাস) থাকিব কিনা ? তখন আমি তাঁহাদিগকে কহিলাম, তোমরা রোজা রাখিতে পার, কেননা আমার দুগ্ধের শিশু অণু রোজা বলিয়া স্তনের দুগ্ধ পান করেন নাই । ইনিও আজ ঈশ্বরের নিকটে (রোজা) উপবাস আছেন এবং তিনি সন্ধ্যার পরে ইহাও বলিয়াছিলেন যে, প্রাতঃ-কাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার প্রাণাধিক পুত্র দুগ্ধ পান করেন নাই, আর দুগ্ধ পান করিবার জন্য বিশেষ কোনরূপ চেষ্টাও পান না । কোন কোন লেখক বলিয়াছেন, গণ্ডুল আজম পিরান, পীরের জন্ম রজনীতে আকাশে ঘোরতর মেঘ ছিল, এজন্য অনেকেই রোমজানের চন্দ্র দেখিতে পান নাই, সকলেই চন্দ্র দর্শনে নিরাশা হইয়া ছিল, তবে রোমজানের চন্দ্র নিশ্চয়ই উদয় হইবে বলিয়া সকলেবই মনে ধারণা ছিল কিন্তু সেই দেশে একজন প্রবীণ দরবেস সাধুপুরুষ বাস করিতেন, তিনি মনের সন্দেহ ঘুচাইবার জন্য ফাতেমা সাহেবাণীব নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবী আজ কি সাহাজাদা আপনার দুগ্ধ পান করিয়াছেন ?

তখন তিনি বলিলেন, আজ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমাব দুগ্ধপুষ্য বালক কিছুই পান করেন নাই । ইহা শুনিয়া দববেম সন্তুষ্ট হৃদয়ে বালককে আশীর্বাদ করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন, এবং দেশে দেশে প্রচার হইয়া গেল যে, গিলান নগরের মধ্যে একটী সঙ্গ প্রসূত বালক রোজা রাখিয়াছেন । ইহা শুনিয়া বোম্বাদা দেশেব তপস্বীগণ মনে মনে ধারণা করিলেন, নিশ্চয়ই কোন মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন । হজরত মহিউদ্দিন রহমাতুল্যা আলায়হে প্রথম বোম্বজানে যে কুমিষ্ঠ হইয়া রোজা রাখিয়াছিলেন, তাহা দুই চার দিবসেব পরেই স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়া গেল । আজ জগতেব ভণ্ড তপস্বীগণেব স্নীতি নীতি দেখিয়া অবাক হইয়াছি ? তাঁহারা কি বুঝিয়া যে, নাগাজ, রোজা ত্যাগ করিলেন, তাহা বলিতে পারি না । যিনি গুণ্ড তস্তের (মারফতেব) পরম গুরু তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াই রোজা রাখিলেন, আর ইহারা কি সকল পথ তয় করিয়া স্বর্গে উঠিলেন ।

হজরত আব্দুল কাদেরের প্রতি দৈববাণী ।

দেখিতে দেখিতে চারশত ছিয়াত্তর সাল আসিয়া দেখা দিল, গওসল আজম আর মাতৃ-জোড়ে সর্বদা

শোভা পান না, পঞ্চমবৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন, পাড়ায় পাড়ায় ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়ান, কখন কখন আদর ক'রে মাকে মামা বলিয়া উচ্চৈঃস্ববে ডাকিয়া থাকেন, কখন কখন ছেলেদের সঙ্গে মাঠে ঘাটে খেলা করিয়া বেড়ান । একদিন পঞ্চ বৎসব বয়ক্রম কাগ্রে প্রতিবাসী বালকদেব সহিত ছুটাছুটা করিয়া খেলা করিতেছিলেন, এমন সময় একটি দৈববাণী স্বকর্ণে শুনিতে পাইলেন । কে যেন শব্দ কবিতা বলিতেছেন ;—

উবিবইয়া মোব'রেক ! অর্থাৎ তুমি অ'মার দিকে শীঘ্র শীঘ্র এস মবাবক ! যে হেতু জগতে তোমাকে খেলা কবিতা বেড়াইবার জন্য পাঠাই নাই, তুমি আমার দিকে আগমন করিবে, আর অন্য লোকদিগকেও আমার দিকে আহ্বান করিবে, এবং পাণীকুল দিগকে উদ্ধার কবিতার জন্য তোমাকে এই ভূমণ্ডলে প্রেরণ করিয়াছি ; তুমি জ্ঞানের আলোক জ্বালিয়া পাণীগণকে অন্ধকার হইতে উদ্ধার করিয়া লইবে । আবার একটি শব্দ শুনিতে পাইলেন ;—

মিছে খেলায় মত্ত কেন হে শ্রিয় বন্ধুজন ।

এস এস, খেলা ছাড়ি বন্ধুকে কর স্মরণ ॥

হজরত মহাবীরে সোবহানী এই শব্দটী শ্রবণ করিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া উর্কে দৃষ্টি করিয়া চাহিয়া দেখিলেন,

কাহাকে কোথাও দেখিতে পাইলেন না কিন্তু চক্ষের
 পালট মারিতে না মারিতেই পুনরায় সেই শব্দটি শুনিতে
 পাইলেন, তখন ভয়ে ভীত হইয়া গৃহে পলায়ন করিলেন
 এবং মাতা সাহেবাণীকে ঐ শব্দের আদি বৃত্তান্ত সগুদয়
 করিলেন । তখন তিনি বলিলেন, বৎস ! খুব সাবধান,
 নিশ্চয় জগতে তুমি একজন মহান তপস্বী বলিয়া এক
 সময়ে পবিচয় দিবে ; তুমি যে শব্দ শ্রবণ করিয়াছ
 উহা জগত কর্তা বিশ্বপালকের নিকট হইতে, আবার
 যখন শুনিতে পাইবে তখন অতি মনযোগের সহিত
 শ্রবণ করিও । একবার মহাবুবে সোধহানির আট বৎসর
 বয়ঃক্রমকালে রজনী যোগে নিদ্রায় অত্যন্ত কাতর হইয়া-
 ছিলেন, সেই সময় তাঁহাকে একজন স্বর্গীয় দূত স্বপ্নে
 আসিয়া করিলেন, হে আব্দুল কাদের জিলানী ! তুমি
 করুণাগর সৃষ্টিকর্তা বিশ্বপালক খোদাতায়ালাকে ডুলিয়া,
 নিদ্রাঘোরে পতিত আছ, উঠ ! সেই প্রতিপালকের
 গুণ কীর্তনে নিযুক্ত হও । তিনি এই মহা স্বপ্ন দর্শনে
 নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিলেন এবং সকল চিন্তায়
 বিসর্জন দিয়া, ঈশ্বর প্রেমে নিগম হইয়া মহাচিন্তায়
 নিযুক্ত হইলেন ।

হজরত বড়পীরের বিদ্যা শিক্ষা করিতে যাওয়া ।

আগবা নিবাসী মোলবী মহান্মদ সাংদেক আলী আপন গ্রন্থের মধ্যে লিখিয়াছেন হজরত গওসল আজম রহমা-
তুল্যা আলায়হের বয়স যখন দশ বৎসর, তখন তাঁহার
মাতা একটা লোক সঙ্গে দিয়া গিলান সহরের মাদ্রাসায়
বিদ্যা শিক্ষা করিতে দিলেন । হজরতের সঙ্গে পথি মধ্যে
মানবাকারে একটা স্বর্গীয় ফেরেস্তা আসিয়া সঙ্গী
হইলেন এবং বড়পীর সাহেবকে সঙ্গে লইয়া বিদ্যালয়ে
উপস্থিত হইলেন । মকতবে আসিয়া দেখিলেন যে,
চতুর্দিকে বালকের সমাগমে বিদ্যালয় পরিপূর্ণ, এমন
স্থানের অসঙ্খ্য হইয়াছে যে, একটা বালক আসিয়া
যে বসিবে, তাহারও উপায় নাই, তখন নিরুপায়
হইয়া ছদ্মবেশী স্বর্গীয় দূত कहিলেন, তোমরা একটু
স্থান দাও এই বালকটী বসিবেন । তাহাতে কোন
লোকই সড়িল না, এমন সময় দৈববাণী হইল, “উঠ,
স্থান ছাড়িয়া দাও ;—আল্লাহ—অলি আসিয়াছেন, তিনি
বসিবেন, আর কাল বিলম্ব করিও না ; তাঁহাকে বসিতে
স্থান দাও ।” দৈববাণী শুনিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্র ও
শিক্ষক পর্যন্তে চমৎকৃত হইয়, আশ্চর্য্য বোধ করিতে

লাগিলেন, বালকেরা তাড়াতাড়ি করিয়া সারখা পড়িল, হজরত গওসে পাক খোদাকে স্বয়ং করিয়া একস্থানে বসিয়া পড়িলেন । পরে শিক্ষক মহাশয় আসিয়া তাঁহাকে পড়িবার জন্য আদেশ করিলেন, পুনরায় বলিলেন, পড় “বিসমিল্লাহ্ হেব্বাহাগা নের্বাহিম ।” শিক্ষকের শিক্ষা পাইয়া তখন তিনি, আউজবিলা ও বিসামিল্লা হইতে আরম্ভ করিয়া পবিত্র কোব্বাণ শবিরের আলিফ, লাম, মিম শব্দ সহ পঞ্চদশ পারা কোরাণ শরিফ পাঠ করিলেন । তাহা শুনিয়া শিক্ষক মহাশয় আশ্চর্য্য বোধ করিলেন । পুনর্ব্বার বলিলেন, “খামিয়া রহিলে কেন ; আব্ব খার পঞ্চদশ পারা পাঠ কর ” পিরান পীর গওসল আজম কহিলেন, “আর আমি জানিনা, এই পর্য্যন্ত আমি মাতৃ-গর্ভে থাকিয়া শিক্ষা করিয়াছি ।” ওস্তাদ কহিলেন, “ভাল ! আর কেন শিক্ষা কর নাই ?” তিনি কহিলেন, “মাতা আমার পঞ্চদশ পারার হাফেজ ছিলেন, এই পঞ্চদশ পারা পর্য্যন্ত পড়িতেন, আর বেশী তিনি পাঠ করেন না, তৎপ্রত্যু জামিও শিক্ষা পাই নাই ।

হজরত বড়পীর সাহেব মাতাকে আনোক
দানে সাহায্য করেন ।

আনিসেল কাদারি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, মৈয়াদ

আব্দোল জর্বা বহুতে বর্ণিত আছে যে, যখন হজরত বড়পীর সাহেবের মাতা ফাতেমা সাহেবাণী অন্ধকার রাত্রিতে কোথায় গমনাগমন করিতেন ; তখন অকস্মাৎ একটা আলোক আসিয়া পেছীর শ্রায় জ্বলিতে থাকিত । ফাতেমা তাহাতেই অতি আনন্দলাভ করিতেন । কেননা অন্ধকারে আলোকের সাহায্য হইতেছে ।

একদিন অন্ধকার রাত্রিতে কোন কার্য বশতঃ যেমন বাহিরে আসিলেন, অমনি একটা প্রজ্বলিত আলোক জ্বলিতে জ্বলিতে সঙ্গে চলিল ; হঠাৎ সেই স্থানে বড়পীর সাহেব ঘাইয়া উপস্থিত হইলেন । অমনি সেই আলোকটা নির্বাণ হইয়া গেল । তাহা দেখিয়া ফাতেমা কহিলেন, “বৎস আব্দোল কাদের ! তুমি আসা মাত্রই আমার সম্মুখের আলোকটা নির্বাণ হইয়া গেল কেন ?” তখন তিনি বলিলেন, “মাতঃ ! ওটা একটি উপ আলোক মাত্র সমতান পেছী ; আমি উহাকে দূব করিয়া তাড়াইয়া দিমাছি । উহার পরিবর্তে তোমার সাহায্যে একটা খোদাতায়াল কর্তৃক দৈব আলোক নুব জ্যোতিঃ প্রদান করিতেছি, আপনি যখন অন্ধকারে কোথাও গমনাগমন করিবেন, তখনই দৈব আলোকে আলোকিত করিয়া সকল সময় সাহায্য করিবেন । এ কথা গিলান নগবে প্রচার আছে যে,

সেই দিন হইতে ফাতেমাদেবী অন্ধকারে যখনই মেথা যাইতেন সেখানেই দৈব আলোক প্রাপ্ত হইয়া অবাধে সকল কার্য্য সমাধা করিতেন । এমন কি সেই আলোকে সমস্ত গৃহদ্বার আলোকিত হইয়া পড়িত, তাব অন্য প্রদীপের আলোকের আবশ্যক হইত না ।

বড়পীর সাহেবের বোগদাদ গমন ।

অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃকালকালে হজরত বড়পীর সাহেব, নিজের জমিতে চাষ চষিবার জন্য গরু হাঁকাইয়া লইয়া যাইতে ছিলেন এবং সময়ে গরুকে ঘাটীর দ্বারা তাড়না করিয়া ভূমির দিকে লইয়া যাইতেছেন । তাহাতে সেই বুযটী পীরসাহেব তাড়নায় বিরক্ত হইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া কহিল, হে আব্দুল কাদের । “মালেহাজা খোলেকতা ওয়া বেহাজা উমরেতা ।” অর্থাৎ তুমি এই কার্য্যের জন্য জগা গ্রহণ করনাই, আর তোমাকে এই সকল কার্য্যেব আদেশ করিতে ঈশ্বর তোমাকে জগতে পাঠান নাই । তিনি চতুস্পদ জন্তুর নিকট এই উপদেশটি প্রাপ্ত হইয়া তখনই আপনার গৃহেব দিকে ফিরিয়া আসিলেন । ঘরে তামিয়া আট্টালিকার উপর উঠিয়া চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে,

আরফাতের প্রান্তবে লোকে লোকারণ্য হইয়াছে, সে সকল লোক হস্ত তুলিয়া বিশ্ব পালকেব নিকট মঙ্গল কামনা করিতেছেন (১)। আরফাত প্রান্তরের হাজিগণের এই মহান দৃশ্য দর্শন করিয়া হজরত পিরান পীরের জ্ঞান চক্ষু উন্মিলন হইল। তখনই নিম্নে আসিয়া কবজোড়ে বিনয় বচনে মাতৃ সম্মিধানে নিবেদন করিলেন যে, “মাত। আমাকে আশীর্বাদ করিয়া স্প্রসন্ন মনে বিদায় দিন, আমি বিদ্যা শিক্ষা হেতু বোগদাদ রাজ্যে গমন করিব ; সেই বোগদাদ নগরের মহা মহা সাধু সংসর্গ লাভ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব। তৎপরে প্রান্তরের আদি সুওস্ত একে একে মাতার নিকট প্রকাশ করিয়া শুনাইয়া দিলেন তখন মাতা সাহেবাণী পুস্ত্রের বিদেশ যাত্রার জন্য নিজের হস্তে একখানি পিরহান সেলাই করিয়া সেই পিরহানের ভিতবে চল্লিশটি দিনার যত্নেব সহিত সেলাই করিয়া দিলেন, কেননা কখন কোন প্রকার বিপদগ্রস্ত হইলে গুপ্ত মুদ্রা দ্বারা বিপদে রক্ষা হইতে পারিবে তাহার পরদিন একদল বণিক আসিয়া উপস্থিত হইল, হজরত বড়পীর তাঁহাদের সমভিব্যাহারে বোগদাদ গমন করিতে মাতার নিকট বিদায়

(১) আরফাত, মুসলমান দিগে ■ হজরতের পুণ্য ভূমি ।

চাহিলেন । মাতা কহিলেন, 'যাও বৎস . তোমার রক্ষক
সেই কৃপাময় বিশ্ব পালক ঈশ্বর কর্তা, তিন প্রোম কে
সর্বাস্থানে সকল সময়ে রক্ষা করবেন, বিপদে পাড়নে
তাঁহারই শরণাগত হইও, কখনই তাঁহাকে বিশ্বাস
হইয়া অন্তর আশ্রয়ের প্রার্থী হইও না ; ইহাও
দেখিয়া থাকিবে ; মাতা দুঃখপোষ্য বালককে যতই
কেননা প্রহার করে, তথাপি বালক অন্তর পিতার
দৃষ্টিপাত না করিয়া মায়ের কোড়ে স্থান পাইবার জন্ত
কালাহিত হয় । তখন সেই পুত্র বৎসলা জননী বালককে
কোড়ে লইয়া সোহাগভরে, তাঁহার চাঁদমুখে লক্ষ্য
চুম্বন প্রদান করিতে থাকে,। ঈশ্বরও ভোক্তাদের প্রতি
সেইরূপ দয়াবান, মানব যখন বিপদে পতিত হইয়া
অন্তর আশ্রয় অন্বেষণ করেনা, তখন তিনিই দয়াদ্র
হৃদয়ে তাঁহার প্রতি শান্তিবারি বর্ষণ করিয়া থাকেন,
যেমন ভীষণ সঙ্কটে অগ্নি হইতে এলোহিমকে রক্ষা
করিয়াছিলেন । যে হেতু আল্লাহুতায়ালা আপনার
পবিত্র কোবা শরিফের সুরা আম্মিয়াব পাঁচ রক্ষক
মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন ।

আয়েত ।

“কোলনা ইয়া নারনকুনি বারদাঁওওসাদামান
আলা এত্রাহিমা ।”

অর্থ ।

খোদাতায়ালা বলিলেন, “হে অগ্নি, তুমি এত্রাহিমের উপরে শীতল ও শান্ত হও ।” অর্থাৎ জ্বলন্ত হুতাশনে এত্রাহিম আলায়হেচ্ছাল্লামকে সেই অগ্নি হইতে তাঁহার জন্ম মনোহর পুষ্পোদান করিয়া দিয়া খোদাতায়ালাই রক্ষা করিয়াছিলেন । সারধান তুমি খোদাতায়ালা সাহায্য ব্যতীত অন্যের সাহায্যের প্রার্থী হইও না । আর একটি কথা স্মরণ রাখিও, তোমার জামাব বগলের নিন্দে চল্লিশটি দিনার সেলাই করিয়া দিয়াছি ? কখন বিপদে পড়িলে ইহার জন্ম মিথ্যা বলিও না ; যে হেতু তুমি মিথ্যা বলিলে খোদাতায়ালা সিকট গোপন করিতে পারিবে না এবং সত্য কথা মার নাই, কিন্তু অসত্যের শতক দোষ ।” হজবত গওসল আজম মাতৃ আজ্রা পালন করিতে স্বীকার পাইয়া বণিকদলে মিলিত হইলেন, তাঁহারা হজরতকে সঙ্গে লইয়া বোগদাদের দিকে গমন করিল, দুই একদিনের পরে একটি প্রান্তর

মধ্যে সকলে তাঁবু ফেলিয়া (শিবির স্থাপন করিয়া)
 রহিল, বণিকদল পথ চলার পরিশ্রমে আহারের পবে
 যে যাহার তাঁবুর মধ্যে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতে
 লাগিল । কিন্তু হঠাৎ একদল দস্যু আসিয়া বণিক-
 দিগকে আক্রমণ করিল । বণিকদল নিদ্রা ভঙ্গে দস্যুর
 ভীষণাঘাতে কেহ প্রাণত্যাগ করিল, কেহ আহত
 হইয়া বন জঙ্গলে পলায়ন করিল, দস্যুগণ বণিকদের
 মাল আসবাব সমস্তই লুণ্ঠন করিয়া লইল । হজরত
 পীর সাহেব দস্যুগণের অত্যাচার দেখিয়া কাষ্ঠ পুত্তলিক-
 বৎ নির্ঝাক হইয়া সেই প্রান্তর মধ্যে দাঁড়াইয়া
 ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ একজন প্রচণ্ডমূর্তি ভীমকায়
 কুম্ভবর্ণ দস্যু আসিয়া কহিল, রে বালক ! তোমার
 সঙ্গে কিছু আছে ? তাহার সেই করালবদন বিকট-
 মূর্তি ও কৰ্কশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি কিছুমাত্র ভীত
 হইলেন না বরং অকুত সাহসে বলিলেন, হ্যা আছে
 বৈকি ? উত্তর হইল কি আছে ? কহিলেন, চল্লিশটি
 দিনার আছে । পুনঃ উত্তর হইল, কৈ কোণায় আছে ?
 তখনই বলিলেন, এই আমার পিবহানের সঙ্গে মেনাই
 করা বগলের নীচে আছে । বালকের কথায় দস্যু
 ঠাট্টা বুঝিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল । দ্বিতীয়
 জন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাকেও সেইরূপ

উত্তর করিলেন, উভয়ে তাহারা আপন সর্দারের নিকট যাইয়া, সমস্ত বিষয় অবগত করাইলে, সর্দার তখনই বালককে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কৈ তোমার নিকট কি আছে ? তিনি নির্ভয় চিত্তে কহিলেন, চল্লিশটি দিনার আমার বগলের নীচে আছে, সর্দার তখনই পিরহান খুলিয়া দিনার কয়টি বাহির করিয়া কহিতে লাগিল, হে বালক ! তুমি আমাদিগকে দেখিয়াও কি সাহসে নির্ভয় চিত্তে দাঁড়াইয়া আছ, আমাদের হত্যাকাণ্ড দেখিয়া তোমার একটু কি ভয় হইল না ; আমরা তোমার সম্মুখে কতশত জনকে মারিয়া ফেলিলাম, তথাপি তোমার গুপ্ত মুদ্রা গোপন না করিয়া, আমাদের নিকট সত্য বলিয়া প্রকাশ করিয়া দিলে যে ? “হজরত বলিলেন, একা জগত পালক শাসনকর্তা ব্যতীত কাহাকে কখন ভয় করি নাই এবং করিব না, অসত্য কাহার নিকট কখনও বলি নাই এবং কখনও বলিব না, এই বলিয়া এই বয়েতটি পাঠ করিলেন ;—

বয়েত ।

রাস্তি মুজবে রেজাই খোদাস্ত ।

কেস নাদায়েম কে গম শদাজ রাহেরাস্ত ■

অর্থ ।

সত্য কথা কহি যবে সন্তোষ খোদায় ।
সত্যপথে কভু নাহি কেহ ভয় পায় ॥

বড়পীর সাহেব দস্যুগণকে ঘুরিদ করিবার বিবরণ ।

ডাকাত সর্দার একদৃষ্টে বালকের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার বাক্যাবলি শুনিতেন, বালকও তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া নির্ভয় চিত্তে বলিতে লাগিলেন, হে দস্যুদলপতি । আমি আসিবার কালে আমার মাতার নিকট সত্য করিয়াছিলাম যে, কখনই সত্য ভিন্ন মিথ্যা বলিব না এবং তোমার সহিত যে সত্য করিলাম এ সত্য কখনই ভঙ্গ করিব না, তবে কেমন করিয়া সত্য ভঙ্গ করিয়া মিথ্যা বলিয়া মহাপাপে লিপ্ত হইব এবং ভবধামে আসিয়া দুই চারি দিবসের জন্য মাতৃ আঙ্কালঙ্ঘন করিয়া নিজের জীবন রক্ষা করিব । দস্যুপতি বালকেব মুখে এই সত্যবাণী শ্রবণ করিয়া পরকালের ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে আল্লাহু আকবার বলিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, সোবহানালা এই বালকটী

আপনার মাতাব ওয়াদা সত্য পালনে বাধ্য ; আর আমি আমার প্রতিপালক জগত পিতৃব আদেশ ত্যাগ করিয়া পাপকর্যেই জীবন অতিবাহিত করিয়া দিলাম, হায় আমার মত মহাপাপী জগতে আবত কেহই নাই ; এই বলিয়া সঙ্গি দস্যাদিগকে বলিল, আর আমার পরধনে আকাঙ্ক্ষা নাই, তোমরা সকলই গ্রহণ কর ; এখন আমি পরকালের পথ পরিষ্কার করিবাব জন্য, এই বালককে গুরুরূপে গ্রহণ করিয়া, গুপ্ত তত্ত্ব অবগত হই । এই বলিয়া দস্যুপতি বালকের হস্তে (মুবিদ) অনুস্মরণ ব্রতে দীক্ষিত হইয়া মহাপাপ হইতে মুক্তিলাভ কবিলেন । সর্দারের দেখাদেখি দস্যুগণও মুবিদ হইয়া বণিক দলের সকল মাল আসবাব ফিরাইয়া দিল, খোদাতায়ালার কৃপায় বড়পীরের অঙ্গস্পর্শে ষাটজন দস্যু সকলেই মহা তপস্বী সাধু পুরুষ হইয়া গেল । কিন্তু বড়পীর সাহেবেদ গীব (গুরু) সৈয়দ আবু মখজুনি ছিলেন ।

মহিউদ্দিন নামের ব্যাখ্যা ।

সেখ আব্দুল হক মহদস্ দহলবী রহমাতুল্যা আলায়হে আখবারুল আখিয়ার গ্রন্থে লিখিয়াছেন, হজরত বড়পীর সাহেব যে সময় দস্যুদিগকে মুবিদ করিয়া, একাকীই

বোগদাদ নগরের দিকে চলিলেন, সেই সময় দাতা দয়ালু খোদাতায়ালা তাঁহাকে পবিত্র করিবার জন্ত, এসলাম ধর্মকে মনুষ্যরূপে পাঠাইয়া দিলেন । তিনি যে পথ দিয়া বোগদাদ নগরে যাইতে ছিলেন, দেখিলেন সেই পথিমধ্যে একটি লোক ক্ষীণ জীবি জ্বর-জীর্ণাবস্থায় হীনবল হইয়া পড়িয়াছে ; সেই লোকটী পীরসা'হেবকে দেখিতে পাইয়া ক্ষীণস্বরে কহিলেন, হে মহবুবে সোবহানি ! আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া উঠাও, আমি অত্যন্ত অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি । ইহা শুনিয়া দয়ালু হৃদয় মহবুবে সোবহানি হস্ত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন । যখন হজবত তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন তখনই সেই হীনবল ক্ষীণ-জীবি পুরুষটী নববলে বলিয়ান হইয়া, মহাবলবন্ত ও জ্যোতির্ময়রূপে তেজপুঞ্জ শক্তিতে দাঁড়াইয়া বলিলেন, যেমন তুমি আজ আমাকে নববলে বলিয়ান করিয়া পূর্ণশক্তি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়াছ, তেমন তুমি আমাব নিকট হইতে মহা গৌরব সূচক মহিউদ্দিন নাম প্রাপ্ত হইলে । আজ হইতে জগতে তোমার মহিউদ্দিন নাম ঘোষণা হইতে থাকিবে হে পবিত্র পুরুষ ! আমি কে তাহা তুমি বুঝিতে বা জানিতে পার নাই ? আমি দিন এসলাম ; এই বলিয়া দিন এসলাম বড়পীরের আদৃশ্য

হইয়া গেলেন । হজরত তথা হইতে বোগদাদের মাদ্রাসায় আসিয়া ওস্তাদের কাছে নানা প্রকারের বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন । হজরত সামান্য দিনের মধ্যেই হাদিস, ফেকা, তফসির পড়িয়া বিদ্যায় মহা পণ্ডিত হইয়া ছিলেন । তিনি যে বিদ্যায় মহা বিদ্বান হইয়া ছিলেন, তাহা তাঁহারই কৃত আরবী পদ্যটি পাঠ করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় ।

আরবী কেসিদাহ্ ।

দারাস্তল এলমা হাত্তা ছের্তো
কোল ইয়াও ওয়ানেল তেচ্ছ ছায়াদা
মেম্ মাওলাল মাওয়ালি ।

অর্থ ।

এত বিদ্যা শিক্ষা আমি করিনু জগতে ।
নিশ্চয় কোতব আমি হইনু তাহাতে ॥
মহাপুণ্যবান যবে হইনু ধরায় ।
লভিলাম গুণ বিদ্যা ঈশ্বর কৃপায় ॥

হজরত আবুহেবেরা বর্ণনা করিয়াছেন যে, রছুল মকবুল (সঃ) মহরুবে, সোবহানি (রঃ) বিদ্যার প্রশংসা

করিবার কালে, এই বাক্যটী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, “কালু ওমাল মোফরাছনা” এই বাক্যটী উচ্চারণ করিতে, কোন সহচর হজরত রশ্মলে করিম (সঃ) কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, হে প্রেরিত পুরুষ ! মোফরদিন কাহাকে বলে, তিনি বলিলেন, মোফরদিন ঐ লোক যিনি সদা সর্বদা খোদাতায়ালাকে স্মরণ করিয়া থাকেন । এজম্ব হজরত বড়পীর সাহেব মোফরদিন নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । মজমুয়ে ফজায়েল গ্রন্থের মধ্যে লিখিত আছে যে, সেখ ওসমান বোগদাদি (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন ; যে সময় হজরত আব্দুল কাদের জিলানি (রঃ) বোগদাদ সহবের বিশ্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইয়া ছয়শত ছাত্রদিগকে তছুয়েফ বা গারফত বিদ্যা ও ফেকা, হাদিস, তফসির শিক্ষা দিতেন, সে সময় কি মনোহর দৃশ্য দেখা যাইত । যে ছাত্রদের পড়িবার কেতাব না থাকিত তাহাদিগকে তিনি স্বয়ং নিজেই হস্তে হাদিস, ফেকা, তফসির ইত্যাদি লিখিয়া দিতেন ।

কেরামতি কোরাণ ।

জোব্দাতল আবার নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, সেখ আবুল মজফুরের পুত্র মোবারেক তিনি হেকমত,

বা ভোজবিদ্যায় মহা পাবদর্শী ছিলেন, তিনি যেখানে সেখানে মেজিক বা ভোজবিদ্যা দেখাইয়া অনেক অর্থ উপার্জন করিয়া বেড়াইতেন। একদিন তিনি হেকমতের কেতাব খানি সঙ্গে লইয়া হজরত পিরান গীরের নিকটে উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে দেখিবামাত্র কহিলেন, মোবারেক! তোমার সঙ্গে যে হেকমতের কেতাব খানি আছে উহা তোমার জতি আগবের সামগ্রী নয়? তুমি ঐ পুস্তকটি জলে ধৌত করিয়া লইয়া আইস, নিশ্চয় জানিবে ঐ পুস্তকেব বিদ্যা শিক্ষা করা মুসলমান দিগের নীতি বিরুদ্ধ। হজরতের কথায় লজ্জিত হইয়া মোবারেক বড়ই ভাবনা চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায় আমার গাধের কেতাব কেমন করিয়া জলে ধুইয়া ফেলিব! কত চেষ্টা করিয়া এই পুস্তকটি পাইয়া ছিলাম, আবার ইহা নষ্ট করিয়া দিলে কোথায় বা পাইব। হজরত তাহার মনেব ভাব বুঝিতে পারিয়া আরম্ভ লোচনে কর্কশম্বরে কহিলেন, মোবারেক! তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, নতুবা হাতের কেতাব দূরে নিক্ষেপ কব, নচেৎ তোমার গৃহে রাখিয়া এস, আর উহা কখনই আমার সম্মুখে লইয়া এস না। মোবারেক বড় গীবেব কোপদৃষ্টিে পতিত হইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, হাত পা অবশ হইয়া পড়িল,

মস্তক হেঁট করিয়া অধোগুথে কতই কি চিন্তা করিতে করিতে বলিলেন, “প্রভু! ক্ষমা করুন, আর আমি পুস্তকের মায়া করিব না।” তখন দয়ার সাগর মহাবল মোবহানি, বলিলেন, “দাও তোমার পুস্তকটা আমার হাতে দাও।” মোবাবেক পুস্তকটা দিবাব সময় একবার খুলিয়া দেখিলেন যে, তাহাতে একটামাত্রও অক্ষর নাই, সকল পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় অক্ষর শূন্য হইয়া সমস্ত পুস্তকটা শুভ্রবর্ণ হইয়াছে; তখন তিনি বিস্ময়পূর্ণ হইয়া তাহা বড়পীরের হস্তে অর্পণ করিলেন। হজরত ঐ পুস্তকটা হস্তে লইয়া, তাহার সমুদয় পৃষ্ঠা একে একে উল্টাইয়া দেখিলেন, পরে মোবারেককে দিয়া বলিলেন, উহা কি উত্তম গ্রন্থ যাহা পাঠ করিলে ক্ষুধা ভ্রমণা নিবারণ হইয়া যায়, ধর গ্রন্থ, পবিত্র হইয়া ধর? মোবারেক তৎক্ষণাৎ অজু করিয়া সমাদরের সহিত হজরতের হাত হইতে লইয়া প্রথম খুলিয়া দেখিলেন যে, ইহা মহা গ্রন্থ পবিত্র কোরাণ শরিফ এবং সমস্তই অনুবাদ করা তফছির। এই কেরামতি কোবাৎ দর্শন করিয়া মোবারেক গীনের পদতলে লুষ্ঠিত হইয়া পড়িল, হজরত তাহাব হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, “মোবাবেক! তুমি ঐ ভোজবিদ্যা যাহা শিক্ষা করিয়াছ, তাহা একবারেই তুলিয়া যাও এবং পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য সরল অন্তরে তওবা কর। তিনি

তখনই পীরের হস্তে হাত দিয় কৃত পাপ বিমোচনের জন্য সরল অন্তরে তওবা কবিলেন এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার শিক্ষিত ভোজবিদ্যা সমুদয় লোপ পাইয়া গেল। সেই ব্যক্তি ও বড়পীরের হস্তে হস্ত দিয়া জগতের মধ্যে সাধু হইয়া ঈশ্বর সাধনায় নিযুক্ত হইলেন ।

হজরত বড়পীরের ওয়াজ বা বক্তৃতার বিবরণ ।

মহাত্মা আব্দুল কাদের জিলানি তাঁপসকুল চুড়ামণি দয়াময় খোদাতায়ালার ও প্রেরিত পুরুষের আদেশ সমূহ কায়মনোবাক্যে ও শ্রাণপণ যত্নে পালন করিতেন । প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা কখনও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই । সত্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও আস্থা ছিল । ইনি সময়ে সময়ে নিভৃত অবশ্যে মানব চক্ষের অন্তরালে লুকাইত থাকিয়া তন্ময় চিন্তে বিশ্ব পালক সৃষ্টি কর্তার আরাধনায় নিমগ্ন থাকিতেন । কখন কখন উপদেশ দিবার জন্য নগরে নগবে, রাজ্যে রাজ্যে, দেশে দেশে, পল্লিতে পল্লিতে, মসজিদে মসজিদে, বক্তৃতা করিতেন । তাঁহার স্মধুর উপদেশ বাক্যে শত শত পাপী পাপ পথ ত্যাগ করিয়া এসলাম ধর্মের আশ্রয়

গ্রহণ করিত, শ্রোতাগণ একদৃষ্টে হজরতের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত ; এমন কি শ্রোতাগণ নিবব নিঃশব্দে নির্বাক হইয়া একাত্রে চণ্ডে ওয়াজ শুনিয়া নিজের জীবনকে চরিতার্থ জ্ঞান করিত । তাহার বক্তৃতার কি মোহিনী শক্তি ছিল তাহ কবেগে নিজ নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন ।

কেসিদা ।

জেসূতরফ করতে থে ওহু ফেরকে নেগাহু ।
মোগ হোতা থা সঙ্গ দেল ওয়ালাহু ॥

অর্থ ।

যেদিকে ফিরেন তিনি চাহিয়া দেখিত ।
পাষণ হৃদয় যাদেব কোমল হইত ।

তিনি বড় বড় সভাসমিতিতে এইভাবে ওয়াজ নাছিহতে উপদেশ করিতেন যে, হে মসূলেম ভ্রাতৃগণ ! ' তোমরা মন্দ বা দুর্ঘট লোককে কখনও আশ্রয় দিও না, মন্দ বাসনা পূর্ণ না হইলে তজ্জন্য দুঃখিত বা বিরক্ত হইও না ; সচ্চরিত্রে ও সৎলোককে কখনও কষ্ট দিওনা ; অতি

আবশ্যক ও অভাব হইলেও কাহার নিকট যাচ্ঞা করিও না ; পরকাল প্রাপ্তির জন্য সর্বদা সাধু লোকের সঙ্গ লইও ; যে সকল দরিদ্র লোক দান পাইবার উপযুক্ত, প্রার্থনা করিবার পূর্বেই তাহাদিগকে দান করিও , জ্ঞানবান ও বিদ্যান্ লোকদিগকে ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিও ; ধর্মবহির্ভূত কথাব প্রতি মনোযোগ দিওনা ; ঈহারা ঈশ্বর প্রেমিক সাধুলোক তাহাদের সংস্রব পরিত্যাগ কবিওনা ; যে সকল জ্ঞানী ও সাধু লোকের দ্বারা ইংকাল ও পবকালের সকল উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে, নিজের ক্ষতি বোধ হইলেও এরূপ লোকদিগের সঙ্গ ছাড়া হইও না । এইরূপ নানা উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা কবিয়া কত শত পাষণ ছদয় ও মুর্থ লোকদিগকেও সৎপথে আনয়ন করিয়া ছিলেন ।

বক্তৃতার সভায় একটা স্ত্রীলোকের অদৃশ্য রুমাল ।

সেকাতল আওলিয়া নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, একদিন হজরত বড়পীর সাহেব তেজঃপুঞ্জ শরীবে এক্ষে এলাহীতে নিমগ্ন হইয়া ওয়াজ ' বক্তৃতা করিতে ছিলেন, হঠাৎ হজরতের মস্তক হইতে পাগুড়ীটি

খুলিয়া পড়িল, তাহা দেখিয়া সভাস্থিত শ্রোতাগণ, সকলেই নিজের নিজের মস্তক হইতে পাগ্‌ড়ী ও টুপী যে যাহার খুলিয়া পীরান পীরেব পাগ্‌ড়ীব সঙ্গে একত্রে রাখিয়া দিল । পরে যখন ওয়াজ নছিহত বন্দ হইয়া গেল, তখন হজরত আপনার পাগ্‌ড়ীটা লইয়া সভাস্থিত সকলকে, নিজ নিজ পাগ্‌ড়ী ও টুপী তুলিয়া লইতে বলিলেন । পীর সাহেবের আদেশে তখনই যাহাব যে পাগ্‌ড়ী ও টুপী তাহা তুলিয়া লইলেন । সকলে আপন আপন পাগ্‌ড়ী ও টুপী লইবার পরে দেখিলেন যে, সেস্থানে বেশীভাগ একটা স্ত্রীলোকের মস্তক ঢাকা রুমাল পড়িয়া আছে, তাহাতে সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, “এ সভায়তো কোন স্ত্রীলোকেব আগমন নাই—তবে এ রুমালটা কোথা হইতে আছিল, এইরূপ বলাবলি করিতে করিতে সেই রুমালটা সকলের নয়নগোচর হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল ; তখন সভাস্থিত সকলেই আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিলেন । এমন সময় সেখা আবুওল কায়েম রহমাতুল্যা আলায়হে হজরতের নিকটে করজোড়ে নিবেদন করিলেন, “মহাজ্ঞান ! ঐ রুমালটা কাহার এবং উহা কোথায় চলিয়া গেল ?” তিনি কহিবেন, “এই পল্লীর মধ্যস্থিত বাটীর একজন মহা তপস্বিনী স্ত্রীলোক অন্দর মহল হইতে আমার ওয়াজ শ্রবণ করিতেছিলাম,

যখন তোমরা মস্তক হইতে নিজ নিজ টুপী ও পাগড়ী খুলিয়া রাখিলে সে সময় ঐ গৃহবাসিনী তপস্বিনী রমণী আমার সম্মান রক্ষা করিবার নিমিত্ত মস্তকের রুমাল খুলিয়া এখানে রাখিয়াছিলেন, সেই রুমালটী এখন অদৃশ্য হইয়া তাঁহার কাছে চলিয়া গিয়াছে । আর একদিন তিনি অগ্নিময় তেজঃপুঞ্জ শরীরে ধাতু গৃহে ওয়াজ করিতেছিলেন, তাঁহার সেই অগ্নিবৎ তেজঃপুঞ্জ শরীরের তেজঃ গৃহস্থিত জ্বলন্ত প্রদীপ সহ্য করিতে না পারিয়া ঘূর্ণিত বায়ুর মত চতুর্দিকে ঘূর্ণিতে লাগিল । ওয়াজ বন্ধ হইবার পরে সেই জ্বলন্ত প্রদীপ স্থির ভাবে বসিয়া গেল । ধাতু গুণবতী প্রদীপের আশ্চর্য্যভাব দর্শন করিয়া হজরতকে আদি বৃত্তান্ত অবগত করাইল । তখন তিনি তাহাকে কহিলেন, হে ধাতুমাতা ! আমার অগ্নিময় তেজঃপুঞ্জ শরীরের (জ্বালানি ফায়েজ) জ্বলন্ত প্রদীপ কখনই সহ্য করিতে পারে নাই বলিয়া, প্রদীপটী স্থির থাকিতে না পারিয়া চতুর্দিকে ঘূর্ণিয়াছিল ।

দরুদ সালাম ।

অস্‌সালাম আলায়কা ইয়ামারুফো ।

আস্‌সালাম আলায়কা ইয় গওসে পাককো ॥

আসসালাম আয় সাইদে ওাম ওলালি ।

আসসালাম আয় সাইদে ওাজ্জিলানি ॥

বড়পীর সাহেব স্বপ্নে হজরত আয়েসা

সিদ্দিকার শুনদুখ পান করার

বিবরণ ।

জওাহেরল কাদরি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, হজরত এবনে এসহাক বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদিন হজরত গওসে সাকলায়েন পিরান পীব রহমাতুল্যা আলায়েহে বলিলেন, আমি এক সময়ে রাত্রিকালে নিদ্রাবশতঃ স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইলাম যে, আকাশ হইতে কয়েক জন স্বর্গীয় দূত আসিয়া, আমাকে শূন্যে উঠাইয়া মদিনা সরিফে হজরত আয়েসা সিদ্দিকা রাজি আলাহু আনহার পার্শ্বে রাখিয়া তাঁহারা কে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন । হজরত আয়েসা সিদ্দিকা (রাজিঃ) আমাকে অতি যত্নে ও স্নেহের সহিত আদর করিয়া, নিজের ক্রোড়ে তুলিয়া হৃদয় মধ্যে ধারণ করিলেন, যখন তিনি বাৎসল্যভাবে স্নেহ হৃদয়ে ধারণ করিলেন, তখন তাঁহাব পবিত্র শুন দুইটি হইতে প্রবলবেগে নদীর স্রোতের ন্যায় দুখ স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল, আমি সেই স্রবাতুল্য পবিত্র

সুন্দর দুগ্ধ পান করিয়া উদর পরিপূর্ণ করিলাম । সেই
সুধাসম দুগ্ধ পান করিয়া, প্রাণ সুশীতল হইল, হৃদয়ে
শান্তি আসিল, দৈব বলে সর্ব শরীর বলিষ্ঠ হইল এবং
প্রত্যেক লোককূপে গুপ্ত মারফত বিদ্যায় পরিপূর্ণ হইয়া
গেল । স্বর্গের সুশীতল সমীরণে হৃদয় যেন আনন্দে
মৃত্যু করিতে লাগিল, এমন সময় সরওরে আশ্বিয়া
খাতেমল মোরসালিন নবি মোজাহান আসিয়া, হজরত
আয়েসা সিদ্দিকা (রাজিঃ) কে বলিলেন ;—

ইয়া আয়েসাতা লেহাজা ওলাদোনা ওাকোরাতো
অয়ইউনেনা ওাজিহান কিদ্দুনিয়া ওাল আখেরাতে ;

অর্থ ।

হে আয়েসা । ইনি তোমারই বংশধর সন্তান,
ইহকালের ও পরকালের জন্ম ।

বড়পীর সাহেব হজরত রসূলকে স্বপ্নে
দর্শন করেন ।

তালখিয়েছ কালাদ নামক গ্রন্থে সেখ আবু জেকবিয়া
(রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরত গওস পাক পিরান
পীর (রঃ) বলিলেন, একদিন আমি দেখিতে পাইলাম

যে, হজরত মহাম্মদ মস্তুফা (সঃ) একটী সিংহাসনে
আয়োহণ করিয়া, শূন্যমার্গে আমার গৃহমধ্যে আসিয়া
প্রবেশ করিলেন এবং সিংহাসন ধরনীতলে রাখিয়া,
আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে উজ্জ্বলবস্ত্র বংশধর
চুড়ামণি মুরল আইন ! (জ্যোতির্গায় দর্পণ) আমার
নিকটে শীত্র আইস । আমি আর কালবিলাস না করিয়া
তখনই তাঁহার পার্শ্বে সলাম করিয়া দাড়াইলাম । দয়ার
সাগর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেরিত পুরুষ সন্মুখে আমার হস্ত ধারণ
করিয়া নিজের পার্শ্বে সিংহাসনে বসাইয়া, অতি স্নেহে
আমার ললাট দেশে চুম্বন প্রদান করিলেন । তৎপরে
আপনার পবিত্র অঙ্গ হইতে, পরিধান করা পিরহানটী
খুলিয়া স্বহস্তে আমার অঙ্গে পবাইয়া দিয়া সহাস্ত্র বদনে
বলিলেন ;—

হাজা খালয়াতোল গাওসিইয়েতে
আলাল কোতাবে ।”

অর্থ ।

তোমাকে প্রতিনিধি বাদশাহী পদ দান করিয়া মহা
আদেশ দাতা বা সহর রক্ষাকর্ত্তা করিয়া দিলাম ।

শূন্যে ভ্রমণকারী এক সাধু পুরুষের শাস্তি ।

জোওহারাল আসুরার নামক গ্রন্থে লিখিত আছে,

আবুগাল গানায়েম (রঃ) বলিয়াছেন যে, একদিন আমি হজরত মহিউদ্দীন বড়পীর সাহেবের সঙ্গে মাফাৎ করিতে যাইতেছিলাম, দেখিলাম হজরত যে বৃক্ষতলায় সদা সর্বদা আসিয়া বসিতেন, সেই বৃক্ষমূলে একটা অর্ধবয়সী লোক ধূলায় শুইয়া যেন শয্যাগত রুগীর মত হাত পা আছড়াইয়া ছটফট করিতেছেন। স্বচক্ষে তাঁহার সে দুর্দশা দর্শন করিয়া আমার চক্ষে জল আসিল, আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, তখনই তাঁহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা কবিলাম, হে শয্যাগত পথিক ! আপনি কি জন্য এই বৃক্ষ তলায় পড়িয়া ছটফট করিতেছেন ? আপনার কি হ'য়েছে বলুন, সাধ্য থাকে উপকার করিতে চেষ্টা করিব। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, আমি হজরত মহবুবে সোবহানী আব্দুল কাদের জ্বিলানির নিকট মহা অপরাধ করিয়া এ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। আপনি অনুগ্রহ পূর্বক সাহায্য করিয়া, আমার কৃত পাপের বিমোচনের জন্য হজরতের নিকট প্রার্থনা করিয়া এ যন্ত্রণা হইতে মুক্তি করিয়া দিতে পারেন কি ? আমি সেই অপরিচিত পথিকের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ বড়পীরের নিকট আসিয়া সেই পথিকের সমুদয় দুর্দশার কথা বলিয়া, তাঁহার চরণতলে পতিত হইয়া করুণায় অন্নয় বিনয় করিয়া বলিলাম, হুজুর ! অধম তারণ

পতিত পাবন । দয়া করিয়া সেই মহাপাপী নির্বেদ্য পথিকের অপরাধ ক্ষমা করিয়া ৫ দাসের প্রার্থনা রক্ষা করুন । তখন দয়ার আধার পিরান-পীর कहিলেন, ভাল ! তোমার কথা রক্ষা করিয়া ওরূপ মহা অপরাধীর অপরাধ মার্জনা করিলাম ; কিন্তু তাহাকে সাবধান করিয়া দিও, দ্বিতীয়বার যেন এমন অন্যায় কার্য্য জাব না করে, আবার যদি তাহাকে এরূপ হিংসাতুর কার্য্য করিতে দেখি । ইহা হইতেও অধিক শাস্তি প্রদান করিব । আমি হজরতের নিকট বিদায় হইয়া সেই পথিককে সমুদয় কথাই অবগত করাইলাম, সে সমুদয় কথা স্বীকার পাইয়া, তখনই উঠিয়া শূন্যে উধাও হইয়া উড়িয়া গেল, দেখিতে দেখিতে আমার দৃশ্যের বহির্ভূত হইয়া পড়িল । পুনরায় আমি হজরত পিরান-পীরের নিকটে আসিয়া বলিলাম, হুজুব ! উনি কে ? এবং আপনার নিকট এমন কি অপরাধ করিয়া ছিলেন যে, আপনি তজ্জন্য উহাকে শাস্তি না দিয়া নিশ্চিত হইতে পারিলেন না । আমি দেখিলাম যে, উহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে, কেননা দেখিতে দেখিতে শূন্যমার্গে উধাও হইয়া উড়িয়া গেল । তবে কি উনি দানব না দৈত্য ! সেই কথা আমার মনের মধ্যে সর্বদাই আন্দোলন হইতেছে, আপনি ইহার আদি বৃত্তান্ত বলিয়া আমার মনের কোতুহল নিবারণ করুন । তখন তিনি

বলিলেন, ঐ ব্যক্তি আওলিয়ায়ে মোরদানে, মহা তপস্বী । আপনার সাধনাবলে, বাতাসে ভর করিয়া শূন্যমার্গে উড়িয়া যেখানে সেখানে গমনাগমন করে । একদিন বায়ুভরে শূন্যে ভ্রমণ করিতে করিতে আমার সহরে যখন আসিয়া পৌঁছিল, মদগর্বে গর্বিত হইয়া বলিল যে, এই সহরে আমার মত উপযুক্ত এমন কোন মহান্ বোজর্গ সাধু পুরুষ নাই যে তাঁহার জন্ম নিম্নে নামিয়া তাঁহার সহিত সংক্রাণ্ড লাভ করিয়া যাইব ; এই আত্ম গরিমার দোষেই আমার নিকট তাহাকে শাস্তি পাইতে হইল, যখন আমি উহার ঐ অলৌকিক মহাবিদ্যা বেলায়েত কাড়িয়া লইলাম, তখন ঐ তপস্বী নিকপায় হইয়া বৃক্ষমূলে পড়িয়াছিল । যদি না তুমি উহার সাহায্যে আমার নিকটে আগমন করিতে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ঐ মদগর্বিত তপস্বী ঐ বৃক্ষতলে হাত পা আছড়াইতে আছড়াইতেই প্রাণ ত্যাগ করিত ।

বড়পীর সাহেবের অলিআল্লাহ্ হইকার নিদর্শন ।

সোলতানোল আজকার নামক গ্রন্থে মোলানা শাহ্ মহান্মদ এলমাল একিন খোলফায়ে রাসেদিন লিখিয়াছেন

যে, একদিন বোগদাদের কোন কোন লোক হজরত বড়পীর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি যে সময় হইতে অলি বা সাধু হইয়াছেন, তাহা কোন সময়ে টের পাইয়া ছিলেন । হজরত পীরসাহেব কহিলেন, যে সময় আমি বিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষা করিতে যাইতাম, সেই সময় দেখিতে পাইতাম স্বর্গীয় দূতগণ আমার রক্ষক প্রহরী হইয়া সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন, আবার বিদ্যালয়ের নিকটবর্তী হইলে পরেই উচ্চৈশ্বরে ডাকিয়া বলিতেন, হে বালকগণ ! তোমরা উঠ—সম্মান কর, আমার সঙ্গে খোদাপ্রাপ্তি মহাপূজ্যবান লোক আছে, তাহাতে বালকগণ সকলেই সম্মান করিয়া নিজের বিছানায় বসাইবার জন্ম চেষ্টা পাইত । আর একদিন একটা বালক একজন অর্দ্ধবয়সী লোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, উনি কে ? কেনই বা উঁহার সম্মান করিতে হয় ? তখন তিনি কহিলেন, তুমি উঁহাকে চিনিতে পার নাই, উনি আবু সালাহের পুত্র, আওলিয়া পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইনিই সাধুপুরুষগণের রাজা, ইঁহারই নাম বড়পীর আব্দোল কাদের জিলানি । সেইদিন হইতে আমি জানিতে পারিলাম যে আমি খোদাপ্রাপ্তি পদ প্রাপ্ত হইয়াছি, দয়াময় দয়া করিয়া আমাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, সেইদিন হইতে আমিও মির্জান স্থানে লোকের অগোচরে

তন্ময় চিন্তে জগৎ পিতা বিশ্বপালকের অর্চনা ও সাধনা করিতে নিযুক্ত হইলাম, দয়াময় খোদাতায়ালা সামান্য দিনের মধ্যেই আমাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিলেন ; সেই জগতকর্তা বিশ্ব পালক যখন আমার পরম বন্ধু হইয়া গেলেন, তখন আমার আর কোন বস্তুর অভাব হইল না । তিনি যেন স্বয়ং আমার হাত হইয়া গেল, এ জন্ম জগতে আমার অপর একটি নাম পীর দস্তগীর ; এই গৌরব-সূচক নাম প্রাপ্ত হইয়া আমি জগতে কতই খেলা খেলিয়াছি, তাহা দেখিয়া কত কত লোক বিস্ময়পূর্ণ হইয়াছে এবং কত কত সাধু পুরুষ আমার সহিত হিংসা করিয়া, অধঃপতনে পতিত হইয়াছে ।

ভার্জা ডিম হইতে বাচ্ছা বাহির হইয়া শব্দ করিবার বিবরণ ।

খাওয়ারাকাল আখিয়া নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, সেখ আবুলফজল বেন কাসেম (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, বসন্তের সময়ে হজরত মহিউদ্দীন জিলানি বড়পীর সাহেব দেশ পর্য্যটনের ইচ্ছা করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, মনের আনন্দ লাভ করিবার জন্য এদেশ সেদেশ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ; দয়াময় বিশ্ব-

পালকের বিশ্ব-রচনার কৌশল দেখিতে দেখিতে, নানা-
দেশের নানা রকম ভাব বুঝিতে বুঝিতে, দেশদেশান্তর
পর্য্যটন করিতে করিতে অন্য একটা সহর মধ্যে যাইয়া
উপস্থিত হইলেন । সেই সহরের মনোহর দৃশ্য দর্শন
করিতে করিতে একটা রাজ্যের মধ্যে যাইয়া পড়িলেন,
পথ চলার পরিশ্রমে হজরত অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন,
সাম্মুখে একটা তাববাগের (১) দোকান দেখিয়া বসিয়া
পড়িলেন । দোকানি নানারূপ খাবার সামগ্রী লইয়া
স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখিয়াছে; পোলাও, কাবাব, রুটী,
মাংসের ঝোল, মুরগীর ডিম ভাজা পর্য্যন্ত রেকাধিতে
সাজান আছে । সেই সময় তাববাগ, কয়েকটা মুরগীর
ডিম লইয়া কড়ায় ফেলিয়া ঘূতে ভাজিতেছিল । হজরত
ডিম ভাজা দেখিয়া কহিল, আহা ! ঐ ডিমগুলি যদি
এরূপ ভাবে কড়ায় ফেলিয়া ঘূতে না ভাজিত, তাহা
হইলে ঐ ডিম হইতে বাচ্ছা বহির্গত হইয়া, পর ঝাড়িয়া
উড়ে যাইয়া, কেমন চিউঁ চিউঁ শব্দ করিয়া সকল লোক
সিগকে শুনাইত । এই কথা বলার শেষ হইতে না
হইতেই কড়াস্থিত ভাজা ডিম হইতে বাচ্ছাগুলি বহির্গত
হইয়া তখনি উড়িয়া গিয়া বাজারের মধ্যে চিউঁ চিউঁ
শব্দে ডাকিতে লাগিল । তাহার এই আশ্চর্য্য অলৌকিক

(১) তাববাগ, ছোট্ট গুয়ালদা ।

কেরামত দর্শন করিয়া, শত শত লোক বড়পীর সাহেবের সেবার নিযুক্ত হইল । এই আশ্চর্য্য কেরামতের কথা প্রকাশ হওয়াতে, প্রত্যহ সহরের সহস্র সহস্র লোক আসিয়া হজরতের কাছে গুরুমন্ত্রে দীক্ষিত হইল এবং গৃহে গৃহে পীর সাহেবকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন । প্রত্যহ লোকের জনতায় পীর-দরবার রাজ-দরবার হইতেও অধিকতর সুশোভিত হইতেছিল । হায়রে হিংসাপূর্ণ জগত ! তোমার কি কুটিল ভাব, তুমি কি পবেব ভাল দেখিতে পাব না, পরের সৌন্দর্য্য কি তোমাব চক্ষে তীর সম তীব্র বোধ হয়, পরহিংসায় কি তুমি কাতর হইয়া জ্বলন্ত অনলে দগ্ধীভূত হও, হে মর জগত ! এই করিয়া না তুমি অধঃপতনে যাইতে বসিয়াছ, যাক, পৃথিবী রসাতলে যাক, ধ্বংস হউক ; তথাপি যেন মহাত্মা ও পবিত্র সাধু পুরুষদিগের মহানভাব দর্শন করিতে করিতে এ পাপ নয়নের তৃপ্তি সাধন করিতে পাই । সেই সহর মধ্যে একজন তপস্বী সাধু পুরুষ বাস করিতেন, তিনি হজরত বড় পীরের কেরামতের কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, আবার তাঁহার যশকীর্তনের কথা শুনিয়া পবিত্র-কাতর সাধুপুরুষ হিংসানলে জ্বলিয়া উঠিল । মনে ভাবিল, ঐ লোকটি আমার সহরে আসিয়া যে রূপ কেরামত দেখাইয়া লোকের কাছে সম্মান পাইতেছে,

বোধ হয় আর অধিক দিন এখানে থাকিলে পরে, সকলেই তাহার বশীভূত হইয়া পড়িবে, কেহই আর আমাকে গ্রাহ্য করিবে না ; হিংসাবাদী তপস্বী কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া, বড়পীরের নিকট একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন । হে পথিক ! তুমি মশাফেব, দিনকতকের জন্ত আমার এই দেশে আসিয়াছ ; দিনকয়েক মাত্র বাস করিয়া পুনরায় চলিয়া যাইবে, তবে কেন সহরের লোকদিগকে নানা প্রকার কেরামত দেখাইয়া আপনার বশীভূত করিয়া লইতেছ । ইহাতে আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে, কেবল আমা হইতে উচ্চপদ দেখাইয়া নিজের সম্মান বাড়াইয়া আমাকে সকলের নিকট হীনাবস্থায় রাখিবে ; ইহাকি আমার প্রতি তোমার, বিদ্রোহীতাচরণ করা নয় ? কেননা আমার দাত শত শত সেবক তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেছে তুমিও তাহাদিগকে আমার অনুসরণ বা স্মরণাগত হইতে ফিরাইয়া লইতেছ, তাহারাও নির্ঝোঁধের মত তোমার স্মরণাগত হইতেছে । এখন যদি আপনার সম্মান রক্ষা করিতে চাও তাহা হইলে শীঘ্র আমার দেশ হইতে চলিয়া যাও । হজরত বড়পীর সাহেব মদগর্ভিত দরবেশ সাধু পুরুষের পত্রখানি পাঠ করিয়া, দন্তে অঙ্গুলী দিয়া চিন্তা করিতে করিতে এই কোরাণের আয়েতটী পাঠ করিলেন,

“লিল্লাহে মাফিসুমাগাত্তে ওমাফিল আরদে ।”

আকাশে যাহা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সকলই বিশ্বপালক খোদাতায়ালার । পরে পত্রের মধ্যে লিখিলেন, সমুদয় পৃথিবীর কর্তা সেই বিশ্বপালক জগদীশ্বর ; তিনিই অদ্বিতীয় অংশিহীন সৃষ্টিকর্তা । তাঁহারই অধীনের মধ্যে ত্রিজগত আবদ্ধ আছে । আকাশ, পাতাল, নদ, নদী, স্বর্গ, বসুন্ধরা, ইহকাল ও পরকাল ; সকল রাজ্যের রাজা সেই সৃষ্টিপালক জগতকর্তা, এমন ক্ষমতা কাহারও নাই যে সেই বিশ্বপালক জগত কর্তার জগতের কর্তা আপনি হইতে পারে, বা নিজের জগত বলিয়া জ্ঞান করে । যেহেতু নিজের জীবনের কর্তা নিজেই হইতে পারে না । যেমন এ পৃথিবীতে দিন কয়েকের জন্ম আমিও মশাফের, তেমনি তুমিও ক্ষণিক সময়ের জন্ম এই জগতের মশাফের । এ জগতে সকলেরই ভবের খেলা খেলতে আসা, খেলা সাঙ্গ হইলেই সকলকে নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাইতে হইবে, একটু সময় লইবার চেষ্টা করিলেও সময় পাইবে না । যে সময়ে যে দণ্ডে শমন আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং তোমার প্রাণপাখি লইয়া পলায়ন করিতে ইচ্ছা করিবে, তখনই তাহা লইয়া পলায়ন করিবে, কাহার সাধ্য যে সেই পরমাত্মাকে আবদ্ধ করিয়া রাখে, যেমন পবিত্র

কোরান শরিফের সূরা ইয়ুনসের চার রুকু মধ্যে এ
আয়েত আছে ।

আয়েত ।

এজাজায়া আজালোহোম ফালাইয়াসতা খেরুনা
সায়াতাঁও ওলা ইয়াস তাক্ দেগুনা ।”

অর্থ ।

যখন মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইবে তখন একটু নিঃশ্বাস
ফেলিবার সময় পাইবে না, মহাপ্রাণী বহির্গত হইবে ।

এই পর্য্যন্ত পত্রে লিখিয়া গর্বিত সাধুর নিকট
পাঠাইয়া দিলেন । দরবেশ পত্রটি লইয়া ধীরে ধীরে
পাঠ করিতে লাগিল, পরে যখন শেষের আয়েতটি পাঠ
করিলেন তৎ সঙ্গে সঙ্গেই শমন আসিয়া তাহার প্রাণ
পাখি হবণ করিয়া লইয়া গেল ; সাধের দেহপিঞ্জর
মাটির মধ্যে পড়িয়া রহিল । এমালোল্লাহে ওঁএমা
এলায়হে রাজেউন ।

সর্পরূপে একটা দৈত্য এসলাম ধর্ম
গ্রহণ করে তাহার বিবরণ ।

সোলতানল আজকার নামক গ্রন্থে লিখিত আছে,

একদিন হজরত বড়গীর সাহেব মনছুর নামক জামে মসজিদে রাত্রিকালের উপাসনা করিবার জন্য প্রবেশ করে, পরে নামাজ পাঠকালে ভূমিষ্ঠ হইয়া সেজ্জদা করিতে মস্তক ভূতলে স্থাপন করিলে, হটাৎ একটা ভূজঙ্গ আসিয়া ফণা বিস্তার করিয়া হজরতকে বার বার দংশন করিতে লাগিল ; আর সেখান হইতে কোথায় পলায়ন না করিয়া তথায় লড়া চড়া করিতে লাগিল । হজরত সেজ্জদা হইতে মস্তক উত্তলন করিয়া সর্পটিকে বাম হস্ত দিয়া সরাইয়া দিলেন, পরে দ্বিতীয় সেজ্জদা করিলেন (১) । এইরূপ প্রত্যেক রেকাতেই সর্পটিকে সরাইয়া দিয়া সেজ্জদা গুলি সম্পূর্ণ করিয়া জলসা করিলেন আর্থৎ বসিয়া আত্মাহিয়াত পড়িতে রহিলেন । সেই সময় ফণিবর হজরতের গলা বেঁটন করিয়া জড়াইতে লাগিল এইরূপ প্রকারে সর্প তাঁহাকে ত্যক্ত বিরক্ত করিতেছিল ; যখন তাঁহার উপাসনা সম্পূর্ণ হইয়া গেল, তখন সেই সর্পটী অদৃশ্য হইয়া কোথায় চলিয়া গেল । তাঁহার পরদিন হজরত আবার সেই জামে মসজিদে উপস্থিত হইলে, হটাৎ একটা অপরিচিত লোক আসিয়া সালাম করিয়া

(১) সরিয়তেব নিধি অনুসাবে এক হস্তে সর্প সংহাৰ করা কি কোন বস্ত্ৰ সরাইয়া দেওয়া নীতি বিরুদ্ধ হয় না ।

আদব কানুনের সঙ্গে হজরতের সম্মুখে বসিয়া রহিল । তিনি সেই অপরিচিত লোকটীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে ? কোথা হইতে এখানে আসিয়াছেন, তাহা সত্য করিয়া পরিচয় দিন । তখন তিনি অভিবাদন পূর্বক বলিলেন, হুজুর ! ক্ষমা করিবেন, আমি কল্য সর্পরূপে আপনাকে বড়ই যন্ত্রণা দিয়াছি, তজ্জন্ম আমি আপনার নিকট মহ্ অপরাধে অপরাধি আছি ? হজরত বলিলেন, আমি তোমাকে পূর্বেই ক্ষমা করিয়াছি, নতুবা আমার ভীষণ মুক্‌ত্যাঘাতে তোমাকে প্রাণ হারাইতে হইত, তোমার কোন রকমেব চাতুরি খাটিত না ; এখন সত্য বল কে তুমি এবং কি জন্মই বা ভুজঙ্গরূপে মানবগণকে কষ্ট দিয়া থাক ? তোমার উদ্দেশ্য কি ব্যক্ত কর । তখন সে কহিল, হুজুর । বহু-দিবস হইতে এইরূপ প্রকারে সর্পরূপে আমি সাধুদিগকে পরীক্ষা করিয়া থাকি ? কিন্তু আপনার মত হিংসাশূন্য মহান হৃদয় ধর্মপরায়ণ ও ধৈর্য্য বিশিষ্ট মহাসাধুপুরুষ দ্বিতীয় আর কাহাকেও পাই নাই ; সেই জন্ম আমি ইচ্ছা করিয়াছি, আপনাব নিকট এগ্লাম ধর্মের দীক্ষিত হইয়া অনুসরণ ত্রেতে ত্রেতী হইব কল্য সর্পরূপে আপনাকে পরীক্ষা করিয়া অদৃশ্য হইয়া ছিলাম, তজ্জন্ম আমাকে ক্ষমা করুন । আর আমার বংশের পরিচয়

এই যে আমি আহবানাস বংশের দৈত্য বা জেন কুলে
জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, এক্ষণে আপনার কৃতদাস হইয়া
থাকিবার ইচ্ছা করি । হজরত বড়পীর সাহেব সেই
দৈত্যকে এসলাম ধর্মে ও অনুসরণ ভ্রতে দীক্ষিত করাইয়া
নিজের সেবার জন্ত নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন ।

বড়পীরের আশীর্বাদে একব্যক্তি ইমানবির
পুনর্ব্বার আগমন পর্য্যন্ত জীবিত থাকে ।

তওফাতুল কাদরি নামক গ্রন্থে লাহোর নিবাসি সেখ
সৈয়দ মাওলি (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, ক্রমেই
মনুষ্যসকল পুণ্যহ কার্য ত্যাগ করিয়া পাপকার্যে লিপ্ত
হইবে বলিয়া হজরত কোতবে রুব্বানি মহিউদ্দীন আব্-
দোল কাদের জিলানি রহমাতুল্যা আলায়ছে অগ্রে
হইতেই জ্ঞাত ছিলেন, সেই জন্ত জীবের প্রতি দয়াজে
হৃদয়ে তাঁহাদের নানা উপায় অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন,
কেননা পাপীগণের পাপভারে এ পৃথিবী নিশ্চয় রসাতল
গামী হইতে পারে, তাহাতে তিনি হজরত ইসা আলাছে-
চ্ছালামেব আকাশ হইতে পুনর্ব্বার পৃথিবীতে আগমন
পর্য্যন্ত এ ধরণী স্থির রাখিবার জন্ত কোতব বা রক্ষক কর্তা
আবদাল নিযুক্ত করিয়া গিয়াছেন ; জমালেলাহে পিরান

পীরের আশীর্বাদে আবদাল অর্থাৎ ধরণীর রক্ষক কর্তা হইয়া সর্বদাই বোসতাম সহরের মধ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন । একদিন এক মহাজ্ঞা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বৃদ্ধা ! আপনার বয়েস কত বৎসর হইয়াছে তাহা কি আপনি বলিতে পারেন ? তখন তিনি তাঁহাকে বলিলেন, আপনি আগার বয়েসের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তবে আমি এ পর্য্যন্ত বলিতে পারি আগার এই জীবনের মধ্যে কত শত রাজ্য ও রাজ ও লক্ষ লক্ষ মনুষ্য ধরিত্রীদেবীর গর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে। তবে একটু একটু জুবাকালের কথা মগ্নের স্মরণ মনে পড়ে, একদিন হজরত মহবুবে সোবহানি আমাকে দেখিয়া বলিয়া ছিলেন যে, জমালেলাহু, আশীর্বাদ করি তোমার বয়েস অধিক হইবে এবং তুমি হজরত ইসা আলায়হেছাল্লামের পুনর্বার আকাশ হইতে পৃথিবীতে প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবে, যতদিন পর্য্যন্ত প্রেরিত পুরুষ ইসানবির সহিত তুমি সাক্ষাৎ লাভ না কর ততদিন পর্য্যন্ত মৃত্যু তোমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারিবে না ; কেননা তাঁহার সহচর হইয়া তোমাকে বছরদিবস কাটাইতে হইবে, যেহেতু তিনি জগতে আসিয়া মহাপাপী খারেনজ্জালকে আঁথির পলকে ভস্ম করিয়া দিবে । তুমি যে সময় তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিবে সে সময় সেই পবিত্র মহাপুরুষ রুয়োলকুদ্দুসকে

আমার মালাস জানাইও আবদাল জমালেলাহু সেই মহাত্মাকে এই পর্য্যন্ত বলিয়া, পরে বলিলেন, হজরত ইমার আশাপথ চাহিয়া আছি কতদিনের পরে তাঁহাব সাক্ষাৎ করিয়া এই মায়াবিনী পৃথিবীর মায়া এড়াইয়া নিজগৃহে আগমন করিয়া নিশ্চিন্তভাবে কালযাপন করিব । আর কেন, জগতের কীর্ত্তি কাহিনী সকলই দেখিয়াছি । মায়াবিনী পিশাচী পৃথিবী চক্ষের উপর অনেক খেলা খেলিতেছে, তাহাও দেখিতেছি আরও দেখিতে হইবে, তবে আর সহ্য হয়না, না হইলেও সহ্য করিতে হইবে, এই বলিতে বলিতে অদৃশ্য হইয়া গেল ।

‘হজরত বড়পীরের আশীর্বাদে একজন চোর কোঁতব হইয়া যায় তাহার বিবরণ ।

লাতফ কামরিয়া নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, সেখ আবু মহান্মদগফরে রহমাতুল্যা হইতে বর্ণনা হইয়াছে যে, বোগদাদ নগরে একটী প্রসিদ্ধ চোর ছিল, সে প্রায়ই লোকের বাটীতে চুরি করিয়া আপনার সংসারযাত্রা নির্বাহ করিত । একদিন মনে মনে যুক্তি করিয়া হজরত মহবুবে সোবহানি বড়পীর সাহেবের অন্তর মহল মধ্যে চুরি করিবার জন্য প্রবেশ করিল । যখন চোর চুরি করিবার

ইচ্ছা করিয়া বড়পীর সাহেবের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন তিনি জানিতে পারিয়া সেই চোরকে গৃহ মধ্যেই আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন । চোর অন্দর মহলে প্রবেশ করিবার মাত্রেরেই দুই চক্ষু অন্ধ হইয়া গেল, সকলই অন্ধকার দেখিতে লাগিল ; কি করিবে কোথায় যাইবে, কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া অবশেষে নিরুপায় হইয়া সেই ঘরের কোণে চুপচুপ করিয়া বসে বসে ভাবিতে লাগিল ; হায়, অগ্র পশ্চাত না ভাবিয়া বড়পীরের ঘরে চুরি করিতে আসিয়া আমার এ দুর্দশা হইল, সকালবেলা আমাকে যে দেখিবে সেই বলিবে রে আহান্যক ! বড়পীরের ঘরে চুরি ! এরূপ কাঙ্ক্ষনা গঞ্জনা কতই সহ্য করিতে হইবে, হতভাগ্যের এ পোড়া অদৃষ্টে কত প্রকারের যে শাস্তি আছে তাহাও বলিতে পারি না, হায় হায় কেন এমন দুর্দশা হইল, যে পীরের ঘরে চুরি করিতে আসিলাম । চোর এইরূপ প্রকারে নিজের ভাগ্য নিরক্ষিয়া ভাবিতে ছিল, এমন সময় খোঁজাখাজের আলায়েছে ছালাম বড়পীরের নিকটে আসিয়া কহিলেন, অচ্য একটা আবদাল পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছেন, এখন তাঁহার পরিবর্তে একটা সেই প্রকার উপযুক্ত লোক থাকেত মনুন । তৎ পরিবর্তে তাহাকেই আবদাল করিয়া দেশ রক্ষা করা যায় । তখন হজরত বড়পীর

সাহেব একটি চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার গৃহের মধ্যে একজন দরিদ্র ব্যক্তি বসিয়া আছে তাহাকে আমার নিকটে লইয়া আইস। চাকরটি তখনই তাহাকে সঙ্গে লইয়া বড়পীর সাহেবের নিকটে উপস্থিত করিয়া দিল। হজরত একবার মাত্র তাহার দিকে দৃষ্টি করিয়া, তাহাকে গোপনীয় মহাবিদ্যায় বিদ্যান করিয়া দিলেন। চোর বড়পীরের কৃপাদৃষ্টিতে পতিত হইয়া জগতারাধ্য পূজ্যপদ আবদাল হইয়া গেল। খোণ্ডাজ খাজের (আঃ) তাহাকে সঙ্গে লইয়া আবদালের স্থানে আবদাল পদে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। হজরত খাজের (আঃ) তাহাকে লইয়া অদৃশ্য হইবার পরে, কোন লোক হজরত বড়পীর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হুজুর! আপনার ঘরের কোণে যে লোকটি চুপ করিয়া বসিয়া ছিল সেই লোকটি কে? তখন তিনি বলিলেন, উনি একটি চোর; আমার গৃহে চুরি করিতে আসিয়া ছিল, আমি উহাকে ঘরের কোণে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম; তবে আমার ঘরে চোর চুরি করিতে আসিয়া কিছু না পাইয়া হতাশ অন্তরে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইবে কেন, এজন্য উহাকে গুপ্ত বিদ্যাধন দিয়া ধনবান করিয়া দিলাম। অধীন লেখক বলেন, দাতা লোকের কার্যাই এই দাতব্য না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। পীরের কর্তব্য

কার্য্য এই শিষ্যকে নিজ বস্বে বস্বিন না করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেন না । যেমন কুমরিয়া পোকা জীবিত মক্ষিকাকে নিজের গর্ভে প্রবেশ করাইয়া, তাহাকে পুরনায় নিজের বর্ণ করিয়া ছাড়িয়া দেয় । তদ্রূপ পীরের কার্য্য ।

হজরত বড়পীরের কুকুরে একজন তপস্বীর ব্যাত্ম সংহার করে তাহার বিবরণ ।

তালখিছল কালায়েদ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, সেখ আবুমসউদ আহান্মাদ বর্ণনা করিয়াছেন যে আহান্মাদ জামি নামক একজন মহা তপস্বী ছিলেন ; তিনি সাধনা বলে একটা ব্যাত্মকে বশীভূত করিয়া তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক একটা সর্পকে ছড়ি বানাইয়া, ব্যাত্মকে তাড়না করিয়া থাকিতেন এবং নিজের আশ্চর্য্য কেরামতি যেখানে সেখানে দেখাইয়া ফিরিতেন । লোকে তাঁহার এই আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইত, কেহ বা ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিত, কেহবা ব্যাত্মের খোঁজাকের জন্য গরু আনিয়া যোগাইত, এইরূপ প্রকারে তিনি দেশ দেশান্তরে আপনার গৌরব দেখাইয়া বেড়াইতেন । দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া আপনার ব্যাত্মের আহার্য্য

সংগ্রহ করিয়া লইতেন। একদিন আর একটা রাজ্যে গমন করিয়া একজন সাধুপুরুষের কাছে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেই সাধুব নিকটে ব্যাঘ্রের আহারের জন্য একটা গরু চাহিল। সেই সাধুর গুপ্ত বা মারফৎ বিদ্যায় মহা বিদ্যান ছিলেন, এজন্য তিনি আহম্মদ জামির ভাব দেখিয়া, উহার সমুদয় লোক দেখান ভণ্ডামি বলিয়া বুঝিয়া লইলেন, এবং আরও বুঝিলেন যে, ইহার ছুরা-কাঙ্ক্ষা কেবল পৃথিবীতে লোকের নিকটে যশ লইয়া বেড়াইবেন, কিন্তু পরকাল ও খোদাপ্রাপ্তির সঙ্গে ইহার কোনই সম্বন্ধ নাই; তখন তিনি ভাবিলেন, যাই হোক, ইঁহাকে কিছু শিক্ষা দিবার জন্য বলা আবশ্যিক, যেন জ্ঞান চক্ষু প্রাপ্ত হইয়া পরম বস্তু লাভ করিতে পারে, এ মূঢ় ভ্রমে পড়িয়া কাঁচ লোভে কাঞ্চন হারাইয়া বসিতেছে; ভাল অন্ধকে চক্ষুদান করাই ভাল, পথহারা ধাত্তিকে পথ দেখানই উত্তম; এই ভাবিয়া মহানুহদয় সাধুর আহম্মদ জামিকে বলিলেন, হে বৈরাগ্য ধর্ম অবলম্বনকারী সাধু পুরুষ! তোমার যোগ সাধনার আড়ম্বর আগাকে দেখাইলে, কিছুই ফল হইবে না। অন্ধের কাছে কি বস্ত্রের ব্যাখ্যা করিলে তাহা কি তিনি চিনিতে পারিবেন, লম্পটের কাছে কি ধর্মের কাহিনী গাহিলে জ্ঞান পাইবে, নির্বোধকে কি জ্ঞানদান করিলে

জ্ঞানবান হইবে, করোঞ্জা বৃক্ষে কুঠারাঘাত করিলে কি চন্দনের সুগন্ধ পাইবে, ষালুকাগয় মকভূমিতে জল অন্বেষণ করিলে কি জল পাইবে, সিমুলফুলে মধু আহরণ করিলে কি মধু প্রাপ্ত হইবে, তদ্রূপ আমার কাছে যোগ সাধনার চটক দেখাইলে কি ফল ফলিবে । তবে যদি বোগদাদ যাইয়া হজবত মহবুবে সোবহানির নিকট তোমার মহা যোগ সাধনার আড়ম্বর দেখাইয়া আসিতে পার, তখন আমি তোমাকে প্রত্যহ একটি করিয়া গাভী দান করিব । আহাম্মদ জামি সাধুবরের কাছে আদর না পাইয়া স্তানমুখে অধোবদনে বোগদাদ দিকে গমন করিলেন । পীরদরবারের অনতিদূরে একটি বৃক্ষতলায় বসিয়া আপনার কৃত দাসকে আদেশ করিলেন, যাও তুমি শীঘ্র যাইয়া বড় পীরের দরবাবে আমার সংবাদ দিয়া তাঁহাকে বলিবে যে, আপনার পীর দরবারের নিকটে মহাম্মদ জামি প্রবল পরাক্রম মহা তেজস্বী সাধু পুরুষ ব্যাভ্রো আবোহণ করিয়া আসিয়াছেন, যেন তিনি আমার ক্ষুধার্থ ব্যাভ্রোর জন্ম একটি গাভী পাঠাইয়া দিয়া আমার সম্মান রক্ষা করেন । তৎপরে চাকরটী প্রভুব আদেশ লইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক বড়পীরের দরবারে সমুদয় বিবরণ বর্ণনা করিয়া শুনাইয়াছিল । তাহা শুনিয়া হজবত গওসে সামদানি মহবুবে সোবহানি একবার বৃক্ষমূলের দিকে

কটাক্ষনেত্রে চাহিয়া দেখিলেন যে, আগন্তুক গাভী ভিক্ষা-কারী সাধু পুরুষ বিশাল নয়না মহা বলিষ্ঠ তেজঃপুঞ্জ শরীরে গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া বৈরাগ্য বেশে প্রচণ্ড আকার বিশিষ্ট একটি ব্যাত্মের উপর বসিয়াছেন। হজরতের তাঁহার শরিয়তের নীতি বিরুদ্ধ বেশ দেখিয়া তাঁহার বিগ্ণাবুদ্ধির পরিচয় পাইতে, আর কিছুই বাকী রহিল না। তখন সেই চাকরটিকে বলিয়া দিলেন, যাও তুমি তাঁহাকে একটু অপেক্ষা করিতে বল ; আমি এখনই তাঁহার বাহনের খাদ্যের জন্য একটি গাভী অন্বেষণ করিয়া পাঠাই-তেছি, আজ তিনি আমার অতিথি অবশ্যই আমাদের সেবাশুশ্রূষা করিতে হইবে, আমার দরবারে আসিয়া অতিথি বিমুখ হইয়া গেলে, আমি সেই অন্তর্যামী সৃষ্টিকর্তা খোদাতালার নিকটে কি বলিয়া উত্তর করিব। চাকর বিদায় হইয়া প্রভু সন্নিধানে, বড়পীর সাহেব যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সমুদয় একে একে শুনাইয়া দিল। সাধুবর চাকরের মুখে শ্রবণ করিয়া, আত্ম গরিমায় মত্ত হইয়া কহিতে লাগিল, আমার আশ্চর্য্য কেবামত দেখিয়া, বড়পীর সাহেব নিশ্চয় স্তম্ভিত হইয়াছেন একটু মনে মনে ভয়ও পাইয়াছেন ; তাহ পাইতেই পারেন ! এ ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়া কে না ভীত হয় ; বড়পীর ত একজন মানুষ তবে কেন আমার ব্যাত্ম দেখিয়া ভয় পাইবেন না ;

যদি না তিনি ভয় পাইতেন, তাহা হইলে কখনই তিনি আমার ব্যাঘ্রের জন্য গাভী পাঠাইতে স্বীকার পাইতেন না । পরে হাস্য করিয়া বলিতে লাগিল কি আশ্চর্য্য বড়পীর সাহেবও আমার ভয়ে ভীত হইয়া পড়িলেন, ■■■ তপস্বী অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া এইরূপ কতই কি বলিতে ছিলেন । এখানে তাপসকুলচুড়ামনি পীরশ্রেষ্ঠ মহাবুবে সোবহানি রন্ধন শালার একটি চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি অতিথির ব্যাঘ্রের খোরাকের জন্য একটি মোটা তাজা গাভী লইয়া যাও চাকরটী পীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া একটি ছুটপুট গাভী লইয়া গমন করিল, সেই সময় বড়পীর সাহেবের একটি বৃদ্ধা কুকুর আসিয়া গাভীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ক্রোধভরে চলিতে লাগিল । গাভী লইয়া চাকরটী আহম্মদ জামিকে কহিল ছজুর । আপনার ব্যাঘ্রের আহার জন্য পীর সাহেব এই গাভীটীকে পাঠাইয়া দিয়াছেন । সাধুবর ব্যাঘ্র হইতে নীচে নামিয়া, সেই ব্যাঘ্রটীকে ইসারায় কহিল ঐ তোমার খাদ্য বস্তু উপস্থিত, আর কেন, ভক্ষণ করিয়া উদর পরিপূর্ণ কর । রক্তপিপাসিত মাংসলোমুগী হিংস্রক জন্তু আর কি সহ্য করিতে পারে প্রভুর আদেশ মাত্রেই ভীষণাকারে অঙ্গ খাড়া দিয়া গাভীটীকে যেমন আক্রমণ করিল, তৎ সঙ্গে সঙ্গেই সেই কুকুরটী এক লক্ষ্যেই

ব্যাত্মের ঘাড়ে কামড় দিয়া আছাড় মারিয়া ফেলিয়া দিল, তিন চার কামড়েই পীরের কুকুর সাধুব বাঘকে মারিয়া ফেলিল । আহাম্মদ জামি পীরের কেরামত ও কুকুরের ক্ষমতা দেখিয়া এই বয়েত পড়িয়া বলিতে লাগিল ;—

বয়েত ।

মাগে দরগাহে জ্বিলান শোহু খাওয়াহি কোরেব রুবানি ।
কেবর শেরাও শরফ দারদমাগ দর্গাহে জ্বিলানি ॥

অর্থ ।

এমন সাধুতায় মোর নাহি প্রয়োজন ।
বড়পীরের সেবায় এখন কাটা'ব জীবন ॥
সাধু হৈতে উত্তম গুণ কুকুর পীরের ।
যে হেতু সংহার প্রাণ করিল বাঘের ॥

সাধুব পীরের কুকুরের আশেষ ক্ষমতা দেখিয়া সেই দিন হইতে বড়পীরের দরবারে থাকিয়া, পন্নকাল প্রাপ্তির জন্ত কিঞ্চিৎ গুপ্তধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন ॥ আর কোন কোন গ্রন্থকর্তা বলেন যে, বড়পীরের কুকুর ব্যাত্মকে উদরস্থ করিয়া পুনরায় পীরের আদেশে জীবিতাবস্থায় ব্যাত্মটিকে উদগার করিয়া দিয়াছিল ।

একজন খৃষ্টান দরজী হজরত বড়পীরের নিকটে মুসলমান হয় তাহার বিবরণ ।

আনসল কাদরি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ বাহারল হক কুদ্দুস সরাহু বর্ণনা করিয়াছেন যে, একজন খৃষ্টীয় ধর্মাবলম্বী, সে নিজের জীবিকা নির্বাহ করিবার জন্য, হজরত বড় পীরের কাপড় ও পিরহান সেলাই করিয়া দিনপাত করিত । সদা সর্বদা পীর দরবারে থাকিয়া এসলাম ধর্মের মর্ম অবগত হইত, খোদাতায়ালী একাই যে সমুদয় জগতের অধীশ্বর তাঁহার কেহই যে অংশী নাই এবং তাঁহার পুত্র পরিজন নাই, তিনি কাহা হইতে জন্ম গ্রহণ করেন নাই । সেই লোকটি এ কথা ক্রমে ক্রমে বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল । ইসায়ী পাদরিগণের মতে যিশু অর্থাৎ হজরত ইমা নবি যে খোদাতায়ালীর পুত্র, এ কথা যে সম্পূর্ণ অালক, তাহাও তার বুঝিতে আর বাকী রহিল না । ক্রমে যতই দিন গত হইতে লাগিল, ততই সে এসলামধর্ম সত্য কি না, তাহা বুঝিবার চেষ্টা পাইতে লাগিল এবং নিজেদের ধর্ম সন্দেহও সত্য অসত্যের বিচার করিতে করিতে কয়েক

দিনে অতিবাহিত করিয়া দিল । আবার কয়েকদিন পরে মনে মনে ভাবিল, “মহান্মদ যথার্থ সত্যধর্ম প্রচারক । যাঁহার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী বাইবেলের বা ইঞ্জিলের অনেক স্থানে বর্ত্যমান রহিয়াছে, কিন্তু ছুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের খ্রীষ্টানগণ চাতুরি করিয়া, উহা হজরত ইসার সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া প্রচার করেন । এখন বিষদরূপে বুঝিতে গেলে আমাদের ইঞ্জিল ও তওরাতে হজরত মহান্মদ শেষনবী সম্বন্ধেই ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া যায় । যে হেতু হজরত ইসানবি বলিয়া গিয়াছেন, ‘আমি যে সময় তোমাদের নিকট ছিলাম সে সময় এই সকল কথা বলিয়া গিয়াছি যে, সেই শান্তিময় কর্তা, যে পবিত্র আত্মাকে জগতে প্রেরণ করিবেন, তিনি যাবতীয় বিষয় তোমাদিগকে ভাল করিয়া শিক্ষা দিবেন এবং আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি, সে সকল স্মরণ করাইবেন ।’ এখন আমি তোমাদিগকে সত্য করিয়া বলিতেছি, আমার গমনে তোমাদের উপকার ভিন্ন অপকার হইবে না ; যে হেতু আমি না গেলে শান্তিময় কর্তা তোমাদের নিকটে আসিতে পারিবেন বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু আমি যদি যাই, তবে অবশ্যই তাঁহাকে তোমাদের নিকট পাঠাইয়া দিব ” ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, আমাদের গ্রন্থে পূর্ববামেশ স্মরণ

করাইতে, যত্রি আদেশ গুলি শিক্ষা দিতে, শেষ প্রেরিত পুরুষ হজরত মহান্মদ (সঃ) নবি এবং তিনিই মহা গ্রন্থ ফোরকাণ শরিফ প্রাপ্ত হইয়াছেন, ঐ পবিত্র কোরাণ হইতেই বোঝা যাইতেছে । “আস এসলামো হারুন অল কোফবো বাতেলোন ” অর্থাৎ দিন এসলাম সত্য আর কুফরিধর্ম্য অসত্য হায় হায়, সৎপথে গমন না করিয়া সত্য ধর্মে না চলিয়া অজ্ঞানের মত ভ্রমে পড়িয়া অসৎ কর্ম্মে সমস্ত জীবন কাটাইয়া দিলাম, কখন সুরা পানে, কখন ব্যভিচারে, কখন অখাদ্য বা অবৈধ শুকর মাংস খাইয়া, সয়তানের কুচক্র পড়িয়া বিষয় কার্য্য সকল হারাইতে বসিয়াছি । এখন কোনটী সত্য কোনটী অসত্য তাহাও বাছিয়া লইলাম না । যখন এই নশ্বর জগত ছাড়িয়া পরকালে জগত কর্ত্তা খোদাতায়াণার নিকটে গমন করিতে হইবে এবং পাপ পুণ্যের হিসাব দিতে হইবে, তখন তাঁহাকে কি বলিয়া উত্তর দিব । এখন উপায় করিলে, চেফটা দেখিলে, তবেত পরকালে মুক্ত-লাভ করিতে পারিব । এখনও যদি সূপথ প্রাপ্ত হইবার উপায় দেখি, পরকালে পার হইবার কর্ণধার হজরত বড়পীর সাহেবকে ধরি, তবে নিশ্চয় ভবপারে পার হইব । তাঁহার চরণতলে পড়িলে অশ্রুই তিনি পথহারা ব্যক্তিকে পথ দেখাইবেন, ভবপারে পার করিতে

হইলে এসময় বড়গীর ব্যতীত আর অন্য নাবিক নাই ; উপযুক্ত কর্ণধার তানই, তাঁহারি এসলাম ভারতে আয়োজন করিয়া যদি ভবপারে পার হইতে পারি, তবে এই সময় হইতে তাহার চেষ্টা করি, যিনি ভব-নদী পার করিবার কর্তা তাঁহারি নদীর তীরে বসিয়া থাকি, যথা কেন বক্রি সময় টুকু নষ্ট করিয়া ফেলি । শ্রীকটন দরজি এই ভাবিয়া হজরত মহবুবে সোবিহানি বড়গীর সাহেবের নিকটে যাইয়া এসলাম ধর্মে ও অনুস্মরণ ব্রতে দীক্ষিত হইল । হজরত বড়গীর সাহেব তাহাকে এসলাম ধর্মের রীতি নীতি গুলি ভালরূপ প্রকারে শিক্ষা দিয়া, সকল পথ দেখাইয়া দিলেন । নব দিক্ষিত মুসলমান এসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া, সকল পথের সন্ধান বুঝিয়া আবও ভয়ে ভীত হইয়া ভাবিতে লাগিল । হায় হায় পূর্বে জানিতাম না যে স্বর্গে যাইতে পথে কতকগুলি বিঘ্ন আছে, মনে করিতে গেলে হৃদপিণ্ড সুখাইয়া যায়, সর্ব শরীর রোমাঞ্চিত হয়, কি ভয়ানক পথ ! প্রথমাবস্থায়—মৃত্যু সময় কি কঠিন যন্ত্রণা, দ্বিতীয়—মনকের নকির আসিয়া কঠিন প্রশ্ন করিবে, তাহার প্রাণে প্রতি-উত্তর দিতে না পারিলে ভয়ানক বিপদ ; তৃতীয়—কবর সমাধিস্থ স্থানে এই পৃথিবী কঠিন কঠিন শাস্তি করিবে, গণ্ডিগাছে যেমন ইক্ষুপেয়ণ করে তদ্রূপ মৃত্তিকায় অস্থি

পাঞ্জর ইত্যাদি সর্ব শবীরটীকে পেয়া করিবে, হায় হায়, কবরে কি ভয়ানক শাস্তি নির্দ্ধারিত আছে । তৃতীয়তে হাসর মাঠে সকল কার্যের হিসাব নিকাস দেওয়া কি ভয়ানক ব্যাপার ! এইরূপ প্রকার চিন্তা করিয়া হজরত বড়পীর সাহেবের নিকট কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, হুজুর ! পরম গুরু পতিতপাশন, অধম তারং, অকুলের কুলকাণ্ডারি ভব পারের কর্ণধার ! বলুন—কবরের শাস্তি ও মনকের নকিব ফেরেস্তাদ্বয়ের কঠিন প্রশ্ন হইতে কেমনে রক্ষা পাইব ? তখন দয়ার আধার, পীরগুণধর শিষ্যকে বলিলেন, তুমি নির্ভয় অন্তরে থাক, তজ্জন্য তোমাকে ভয়ে ভীত হইতে হইবে না । যখন তোমার সমাধিস্থলে মনকের ও নকিব স্বর্গীয় দূতদ্বয় ভয়ানক মূর্তিতে আসিয়া দিন ধর্ম ও ইমান বিশ্বাসেব বিষয়ে প্রশ্ন করিবেন, তখন তুমি তাহাদিগকে এই প্রতিউত্তর দিও ? কেবলমাত্র আমার নাম উচ্চারণ করিও, তাহা হইলেই তাহারা তোমাকে অন্য আর কিছু না বলিয়া চলিয়া যাইবেন ; সাধধান আমার নাম ব্যতীত আব কিছু বলিবার চেষ্টা করিও না । কিছুদিন পরে মখ দীক্ষিত মুসলমানটী মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, সকলে তাহার সদগতি করিয়া যে যাহার নিজালয়ে ফিরিয়া আসিলে, ওদিকে কবর মধ্যে মনকের নকিব স্বর্গীয় দূতদ্বয় ঋত ব্যক্তিকে ভীমরবে

জিজ্ঞাসা কারলেন, হে কবরস্থিত ব্যক্তি ! সত্য করিয়া বল তোমার দিন ইমান কি ? তখন তিনি বলিলেন, আমার দিন ও ইমান “মহিউদ্দীন আব্দোল কাদের” ফেরেশতায় এই উত্তর পাইয়া নিরব হইয়া রহিলেন, বহুক্ষণ পরে খোদাতায়ালা নিকটে প্রার্থনা করিলেন ।

“ইয়া রাব্বাল আর্দে ওাসুমায়ে আন্তা
তায়ালামোল জাহেরা ওামা ইয়াথফা ।”

অর্থ ।

হে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা প্রতিপালক, দাতা দয়ালু খোদাতায়ালা অন্তর্যামী ! তুমি গোপন ও প্রকাশের সমুদয় তত্ত্বই অবগত আছ, তোমার অবিদিত জগত মধ্যে কিছুই নাই । আমরা যঁহাকে প্রশ্ন করিমাছি, সেই ব্যক্তি তোমার বন্ধুবর মহবুবে মরওব, মহিউদ্দীন আব্দোল কাদের নাম ব্যতীত আর অন্য কিছুই প্রতিউত্তর দেন নাই । এখন ইঁহার জন্ম যাহা আদেশ হয় আমরা তাহাই করিতে বাধ্য । তখনই দাতা দয়াময় বিশ্বপালকের নিকট হইতে আদেশ হইল, আমার পরম সুল্হদ বন্ধুবরের নামের গুণেই আমি উঁহাকে কৃপা করিয়া কবরের শান্তি হইতে রক্ষা করিয়া এবং কঠিন সেতু পার করাইয়া, হিসাব হইতে নিষ্কৃতি

দিয়া, সর্ব্ব উৎকৃষ্ট স্বর্গমধ্যে স্থান দিব । এখন উহার জন্ম স্বর্গের ছিদ্রে দিয়া স্বর্গস্থে স্থখী করিয়া" এই কবর মধ্যে স্বয়ং রক্ষা করিব প্রভুর আদেশ শিবোধার্য্য করিয়া মনকের নকিরদয় তথা হইতে চলিয়া গেলেন এবং তৎপরেই স্বর্গের সুশীতল সমারনে মৃত্যুর প্রাণ ঠাণ্ডা হইল, দেখিতে দেখিতে স্বর্গের সুগন্ধ আসিয়া তাঁহার সমাধি স্থান আগোদিত করিয়া দিল । অধম লেখক বলেন, যে ব্যক্তি পরম গুরুর আস্থা পালনে বাধ্য হয়, তাঁহার প্রতি তাঁহার পীর অনুগেহ করিয়া পরকালের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন ; ঈশ্বরও তাঁহার প্রতি কৃপা করিয়া শাস্তি বাবি বর্ষণ করেন । কিন্তু ভগ্ন গুরুর ভক্ত হইলেই তাঁহার ইহকাল ও পরকাল সকলই নষ্ট হয় ।

একজন এমনবাসী খৃষ্টান বড়পীরের নিকট মুসলমান হয় তাহার বিবরণ ।

মেরাতুল ফায়েজান নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ আবুমসউদ কাদরি হইতে বর্ণিত আছে যে, একদিন এমনদেশ হইতে একজন খৃষ্টান আসিয়া

হজরত বড়গীরের নিকটে এসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া মুসলমান হইল হজরত তাহাকে আপনার পার্শ্বে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন; আপনি কি বুঝিয়া ইয়াসী ধর্ম ত্যাগ করিয়া এসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন। অব দীক্ষিত মুসলমানটা कहিলেন, হজুর! আমি সদা সর্বদা সত্য ধর্ম প্রাপ্ত হইবার জন্য মনে মনে চিন্তা করিতাম এবং জগত পিতা বিশ্বপালকের নিকটে করপুটে এই বলিয়া প্রার্থনা করিতাম হে জগদীশ্বর! আপনার সত্য ধর্ম এ সময় কোনটী তাহা আমাকে চিনাইয়া দাও, তাহা চিনিতে পারিলেই তবে আমি তোমাকে চিনিতে পারিব, নতুবা আমার দশা কি হইবে। প্রভু! আমি কোন ধর্মে থাকিলে সত্য পথ পাইয়া তোমার অর্চনা ও সাধনা করিতে করিতে বক্রি জীবন টুকু কাটাইয়া দিই? হে খোদাতায়ালা! আমি জগতের সুখ চাইনা, সম্মান চাইনা, সম্পত্তি চাইনা, চাই কেবল তোমাকে; যাহাতে আমি পরকালে নিকৃতি লাভ করিতে পারিব তাহাই চাই। যে দিন আমি সরল মনে সরল পথ প্রাপ্ত হইবার জন্য তন্ময়-চিত্তে দয়াময়ের নিকট প্রার্থনা করি সেই দিন হইতেই আমার মন প্রাণ এসলাম ধর্মের দিকে ধাবমান হইল। এমন কি ঐ কথাটী স্মরণ হইবার

পরেই আমার সর্ব শরীর আনন্দে নৃত্য কবিত্তে লাগিল ।
 আবার ভাবিত্তে লাগিলাম, যদি কোন উপযুক্ত সাধু পুরুষ
 আমার ভাগ্যে ঘটে তাহা হইলে সংসার মায়া ত্যাগ
 করিয়া, হজরত ইসা আলায়হেস্‌সালামেব মত বৈরাগ্য
 বেশে নির্জন স্থানে ঈশ্বর আবাধনায় নিগম হই ।
 এইরূপ চিন্তা করিত্তে করিত্তে একদিন স্বপ্নে হজরত
 ইসা নবি আসিয়া দেখা দিলেন, তৎপরেই আমাকে
 কহিলেন, হে প্রভু ভক্ত সত্য পথ অন্বেষণকারী ! তুমি
 বোংদাদ শরিফ যাইয়া হজরত আব্দোল কাদের মহরুবে
 সোবহানি রহমাতুল্লা আলায়হের নিকটে এসলাম ধর্ম্ম
 গ্রহণ করিয়া, মনের ইচ্ছা তাঁহার কাছে প্রকাশ করিলে,
 তিনি তোমাকে দয়া করিয়া গুপ্ত তত্ত্বেব সন্ধান বলিয়া
 সাধুগণের যে পথ সেই পথ দেখাইয়া দিবেন । এই
 পঞ্চম শতাব্দির মধ্যে হজরত বড় পীর সাহেবের ভুল্য
 জগতে দ্বিতীয় এমন কেহ আব সাধু পুরুষ নাই । যাও
 শীঘ্র তাঁহার নিকটে অনুসরণ ক্রমে দীক্ষিত হইয়া জগতে
 অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন কর, এই বলিয়া তিনি অন্তর্ধ্যান
 হইলেন, তখনই আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইল । প্রাতঃকালে
 স্বপ্নের কথা স্মরণ হইতে এমন দেশ ত্যাগ করিয়া
 বোংদাদ শরিফে আসিয়া আপনার স্মরণাগত হইয়াছি,
 এখন কৃপা করিয়া এ অধমের মনবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া দিন ।

হজরত বড়পীর সাহেব তাঁহাকে গুরুমন্ত্র দানে সাধুদিগের পথ দেখাইয়া গুপ্ত বিদ্যায় শিক্ষিত করিয়া দিলেন ।

অন্বেষণ কর তাঁরে পাইবে নিশ্চয় ।

মনবাঞ্ছা পূর্ণ হবে, বিধির কৃপায় ॥

হজরত বড়পীরের প্রভাব দর্শন করিয়া

চারশত ইহুদী মুসলমান হয়

তাহার বিবরণ ।

মনকাবে আওলিয়া নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, আবুল মালিক (রঃ) বলিয়াছেন যে, একবার হজরত মহবুবে সোবহানি রহমাতুল্লা আলয়ছে কঠিন বিয়োগে পড়িয়া শয্যাগত হইয়াছিলেন, তাঁহার সে অবস্থা দর্শন করিলে, তাহার পাষণ ছদয়, তাহারও প্রাণে আঘাত লাগিয়া বিদীর্ণ হয় । সে অবস্থা দর্শন করিলে বর্ষাকালের ঝরণার ন্যায় অঁধি পল্লব হইতে জল পড়িতে থাকে । পথিকের প্রাণেও ব্যথা লাগে । তাহাতে তাঁহার শিষ্য ও ভক্ত মগলীগণ কি আর থাকিতে পারে? কাতরায়স্থা দর্শন করিয়া ভক্তগণ বলিলেন, হজুর! আপনি বিয়োগে পড়িয়া যে রূপ কষ্টভোগ করিতেছেন, তাহা দেখিয়া

আমাদের প্রাণে বড় ব্যথা হইতেছে, আপনি যদি আশ্রয় করেন তাহা হইলে একজন বিজ্ঞ হাকিম আনাইয়া আপনাকে দেখাই । তখন তিনি বলিলেন, আমার বিয়ারাম আরোগ্য করিবার জন্ত হাকিম আনয়ন করায় আমার বন্ধুর অসন্মান করা হয়, কেন না হাকিমের নিকটে বিয়ারামের পরিচয় দিতে আমার পরম বন্ধু বিপদ বিনাশক অস্তর্য্যামী খোদাতায়ালায় গ্নানি করা হইবে । আমার ব্যাধি আরোগ্যকারী সেই শান্তিময় জগতকর্তা । আমি তাঁহাকে ব্যতীত আর অন্য কাহারও নিকট সাহায্য চাহি না ও কাহাকেও আমার সাহায্যের জন্ত আনয়ন করিব না, যে হেতু সেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কর্তা সকল স্থানেই বর্তমান । যখন তাঁহার পরম বন্ধু এব্রাহিম (আঃ) নমরুদ কর্তৃক অগ্নিতে নিক্ষেপ হইয়াছিলেন তখন ঈশ্বর তাঁহাকে সেই প্রবল জ্বলন্ত হতাশনে রক্ষা করিয়াছিলেন । যখন হজরত মুসাকালিমুল্লা ফেরাউন কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া নীল নদীতে ঝাঁপ দিয়া পড়েন, তখন সেই দাতা দয়ালু তাঁহাকে সলিল মধ্যেই পথ প্রশস্ত করিয়া রক্ষা করেন এবং ঐ নদী গর্ভেই পাপিষ্ঠ ফেরাউনের প্রাণ সংহার করিয়া ভক্তকে আনন্দিত করেন । যখন হজরত ইউনুছ (আঃ) তরনীতে আরোহণ করিয়াছিলেন, সে সময় নাবিকগণ তাঁহাকে পানী বলিয়া স্থণার সহিত সমুদ্রে

ফেলিয়া দেয় । তখন একটা মৎস্য আসিয়া হজরত ইউনুছ নবিকে উদরস্থ করিয়াছিল । যে খোদাতায়ালা ইউনুছ আলায়হেসসালামকে মৎস্যগর্ভে রক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি কি আমার নিকটে নাই ? তবে কেন আমি অন্য চিকিৎসক আনয়ন করিতে আদেশ করিব । ইহাব কিয়ৎকণ পরেই হজরতের প্রস্রাব ত্যাগ করিবার বেগ হওয়াতে খেদমতগার একটা পাত্র আনিয়া সম্মুখে রাখিয়া গেল । হজরত সেই পাত্রে প্রস্রাব করিয়া চাকরটিকে লইয়া যাইতে বলিলেন, খেদমতগার পাত্রটি লইয়া যাইবার সময়ে কহিল, হজরত ! আজ্ঞা করুন ■ কোন হাকিমকে প্রস্রাব দেখাইয়া রোগের পরীক্ষা করাইয়া আসি । হজুর আজ্ঞা করিলে, খেদমতগার পাত্র লইয়া একজন বিখ্যাত ইহুদী হাকিমের কাছে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সম্মুখে সেই পাত্রটি রাখিয়া দিল । সেই ইহুদী হাকিম সাহেব, পাত্রের প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়া, খেদমতগারকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই পাত্রের মধ্যে কাহার প্রস্রাব পরীক্ষা করিতে আনিয়াছ, তাহা সত্য করিয়া বল । ভৃত্য কহিল, তাঁহার নাম হজরত মহবুবে মোবহানি সৈয়দ আব্দোল কাদের জিলানি রহমাতুল্লা আলায়হে । ইহুদী হজরতের নাম শ্রবণ করিবামাত্র উৎফুল্লচিত্তে বলিলেন, “ফাহাজাল

মারজো ইল্লা মারাজো এসুকে এলাহি” অর্থাৎ ঈশ্বর-
 প্রেমের বিয়ারাম ভিন্ন অন্য বিয়ারাম নয় । এই
 বলিয়া তিনি ভক্তিভরে মহা বচন উচ্চারণ করিলেন,
 “লাএলাহা ইল্লাল্লাহু মহাম্মদোর রাসুলোলাহু” ঈশ্বর
 ব্যতীত উপায় নাই, মহাম্মদ তাঁহার ধর্মপ্রচারক রসুল ।
 এই বলিয়া তিনি তখনই মুসলমান হইয়া গেলেন । এই
 সংবাদ শ্রবণ করিয়া ইহুদী পল্লী হইতে অনেক লোক
 আসিয়া উপস্থিত হইল, কেহবা তাঁহার নিকটে যাইয়া
 আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতে লাগিল, দেখে যে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে
 স্নগন্ধের ফোয়ারা ছুটিয়াছে ; তাহা দেখিয়া কেহ কেহ
 জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি বুঝিয়া মুসলমান হইলেন ।
 তখন তিনি পাত্র দেখাইয়া বলিলেন, বলায় আর আবশ্যক
 কি তোমরা উহা দেখিলেই বেশ স্পর্শ বুঝিতে পারিবে ।
 যখন তাহারা পাত্রের কাছে যাইয়া দেখিতে পাইল, সেই
 পাত্রের প্রস্রাব হইতে মেশকো, আতর, আদ্র ও
 গোলাপের স্নগন্ধিতে বিমোহিত করিয়া তুলিয়াছে ।
 তখন তাহারা সকলেই কহিল, পাত্রটি যাঁহার, নিশ্চয়
 তিনি মহান সাধুপুরুষ পরম তাপসিক অলি স—আল্লাহু ;
 এই বলিয়া সকল ইহুদীগণ পবিত্র কলেমা অর্থাৎ মহা
 বচন পাঠ করিয়া মুসলমান হইয়া গেল । এমন কি
 চারি শতের অধিক ইহুদীগণ স্ব পরিবারে খেদমতগারের

সমভিব্যাহারে বড়গীর সাহেবের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল । হজরত বড়গীর সাহেব সেই ভৃত্যের মুখে এই শুভ সংবাদ জ্ঞাত হইয়া তাহাদিগকে আপনার কাছে ডাকিয়া লইলেন । তাহারা যখন একত্রিত হইয়া পিরান গীরের সম্মুখে দাঁড়াইল, হজরত তাহাদের প্রাতি যে কৃপা দৃষ্টিতে চাহিলেন তাহাতেই তাহারা গুণ্ডবিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া মহা তপস্বী সাধু হইয়া গেলেন । তৎপরে সকলেই হজরতের মিকটে গুরুমস্ত্রে দীক্ষিত হইয়া স্থপথে গমন করিয়া স্বর্গগামী হইয়াছিলেন ।

সাধুর সৌভে, মত্ত হয় যবে, জগতের অলিকুল ।
লভিতে সে ধনে, বাঞ্ছা সদা মনে, তাই প্রাণ হয় ব্যাকুল ॥

একজন খৃষ্টান ও একজন মুসলমান
ধর্ম সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করে
তাহার বিবরণ ।

মনজের আওলিয়া নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, একদিন হজরত গওসল আজম রহমাতুল্লা আলায়হে পখিমধ্যে যাইতেছিলেন, দেখিতে পাইলেন যে, দুইটা লোক যাইতে যাইতে ধর্ম সম্বন্ধে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক

করিতেছে । তাহাদেব ছুই জনের মধ্যে একজন এসলাম ধর্মাবলম্বি মুসলমান, দ্বিতীয় ব্যক্তি খৃষ্টীয় ধর্মাবলম্বি ইসায়ী । মুসলমান—আপনার ধর্ম প্রচারক প্রেরিত পুরুষের কথা বলিলেন, হে ইসায়ী ! তুমি জাননা কি জিনি সৃষ্টি না হইলে স্বর্গ, মর্ত্য, আকাশ, পাতাল, নদ, নদী, দেব, দৈত্য কিছুই হইত না । প্রথমেই আলাব প্রেরিত পুরুষের নুর জ্যোতিঃ সৃষ্টি হইয়া সেই জ্যোতি হইতেই সকল বস্তুর সৃজন হয় । সেই শেষ নবির পৃষ্ঠেই মহর নবুওত অঙ্কিত, তাঁহারই পৃষ্ঠদেশে মহা বচন লিখিত আছে “লাএলাহা ইল্লাল্লাহু মহাম্মাদোর রাহুলো-ল্লাহে” তাঁহারই পৃষ্ঠদেশের মহর নবুওতের চিত্রে আকিতে গিয়া খৃষ্ট ধর্মাবলম্বি খ্রিস্টা নিবাসী সোলোমান ফার্সি রাজি আলা আনহো এসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । তাঁহারই প্রতি দয়াময় দয়া করিয়া মহা গ্রন্থ পবিত্রে কোরাণ শরিফ অবতীর্ণ করেন । তাঁহারই সত্য ধর্ম পৃথিবী ব্যাপিয়া প্রচার হইয়া পড়ে, তাঁহারই লকব সাকিয়েল মজনবিন, রহমাতুল্লেল আলামিন, অর্থাৎ সেই পূজ্যপদ নবি তাঁহার উম্মত মঞ্জলীর উপরে তিনি দয়ার সাগর, পরকালে কেয়ামতের দিবসে পাণী মঞ্জলীর সহায় কর্তা, তাঁহার দয়ার ■ ব্যাখ্যার শেষ নাই, সেই নবির উম্মত আন্নি, যিনি মেয়ানাজ রজনীতে স্বর্গ, নরক ও মগু

আকাশ দর্শন করিয়া খোদাতায়ালার সহিত নব্বুই সহস্র কথা কহিয়াছিলেন। যাঁহার কথা অবিশ্বাস করিয়া একজন ইহুদী পুরুষ, স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া সাতটা সন্তান প্রসবের পরে পুনরায় পুরুষ অঙ্গ প্রাপ্ত হয়। তাহা শুনিয়া ইসায়ী আপন প্রেরিত পুরুষ ইসা নব্বিব ব্যাখ্যা বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিল, হে মহান্মদি! যখন আমাদের ইসানবি জন্মগ্রহণ করেন, তখন ইহুদীগণ হজরত মরিয়ম ইসার মাতাকে ব্যভিচারিণী অপবিত্রতা রমণী বলিয়া ঘোষণা করে, তাহাতে তিনি বিরক্ত না হইয়া নিজের অপবাদ দূর করিবার জন্য আপন সন্তানকে সাক্ষ্য করিলেন। ইহুদীগণ মরিয়মের পবিত্রতার বিষয়ে বালককে জিজ্ঞাসা করিলে, তখন হজরত ইসা (আঃ) দুই দিনের শিশু মাত্র এবং মাতার পবিত্রতার বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন, দেখুন, তখন তিনি দুই দিবসের বাল্যাবস্থায় কথা কহিয়াছিলেন। আর তাঁহার বাক-শক্তি এতদূর পর্য্যন্ত ক্ষুর্তি ছিল যখন তিনি যাহাকে যে আশীর্বাদ করিতেন তখনই তাহা তাহার জন্য ফলদায় হইত। কথায় কথায় বিয়ারাগি দিগকে দয়া কবিয়া আবোগ্য করিয়া দিতেন, অন্ধকে চক্ষুদান করিতেন, মৃতাকে জীবিত করাইতেন। এমন কি ইসা মসিহ সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, দেশ দেশান্তরের মৃতদিগকে

“কোমবাজ্জনালাহু” বলিয়া জীবিত কবাইয়া দিতেন । এই বলিয়া তিনি মুসলমানকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এরূপ আশ্চর্য্য ক্ষমতা আমার ইসামসিহের যেমন ছিল, তদ্রূপ তোমার নবি কি মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করিতে পারিতেন, বল দেখি ? তোমার নবি অপেক্ষা ইসা নবির এ ক্ষমতা বেশী ছিল কি না ? মুসলমানটী হজরত মহান্মদ মস্তফা (সঃ) যের মৃতকে জীবিত করা বিষয়ে অস্ত্র থাকায়, আর কিছুই উত্তর করিতে না পারিয়া, আপনাকে পরাভব মনে করিয়া চূপ করিয়া রহিলেন । তাহা দেখিয়া হজরত বড়পীর সাহেব ইসায়ীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, তুমি যাহা কিছু হজরত ইসা আলায়হেস্ সালামের গুণ বর্ণনা করিয়াছ তাহা সকলই সত্য, একটী কথাও অসত্য নয় । তবে কেবল হজরত ইসা মসিহ যে মৃতকে জীবিত করিতেন, আর আমার পয়গম্বর হজরত মহান্মদ (সঃ) কি মৃতকে জীবিত করেন নাই ? তাহা তোমবা উভয়ে কেহই জ্ঞাত নহ, এজন্য বোধ হয় বলিতে পারিলে না, শুন, আমি তাঁহার মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করার বিষয় বর্ণনা করিতেছি ।

যে সময় হজরত মহান্মদ (সঃ) পেরিতুল্লাত করিয়া, এসলাম ধর্ম স্বর্গোরবে প্রচার করেন, সেই সময়ে এমন হইতে একদল খৃষ্টান ইসায়ী হজরতের নিকটে, মুসলমান

হইবার জন্য পবিত্র মক্কামে আসিয়া উপস্থিত হয় । কিন্তু পথিমধ্যে বিধর্মীগণের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তাহার প্রথমেই হজরতের কথা জিজ্ঞাসা করে, তখন আবুজেহেল তাহাদিগকে কহিল, তোমরা মহান্মদের অন্বেষণ কি জন্য করিতেছ ? তাঁহার সঙ্গে তোমাদের আবশ্যিক কি ? তখন এমন বাসীগণ কহিল, তোমাদের মক্কার মধ্যে যিনি ধর্ম প্রচার করিতেছেন, তাঁহার নিকটে আমরা এসলাম ধর্মের নীক্ষিত হইয়া মুসলমান হইবার জন্য আসিয়াছি । আবুজেহেল উপহাসচ্ছলে কহিল, তোমরা যদি মহান্মদকে (সঃ) প্রেরিত পুরুষ তত্ত্ব-বাহক বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাক, তবে তাঁহার নিকট কোন একটা মাজেজা অলৌকিক ঘটনা দেখিয়া লও, তাহা যদি তিনি দেখাইতে পারেন, তবে তাঁহার নিকট মুসলমান হইও এবং তাঁহাকে পয়গম্বর বলিয়া বিশ্বাস করিও, তিনি যদি বহু দিবসের মৃত ব্যক্তিকে কবর হইতে জীবিত করাইতে পারেন, তবে আমরাও তোমাদের সহিত মুসলমান হইব । এমন বাসীগণ তাহাদের কথায় সন্মত হইয়া মক্কার ধর্মদ্রোহীগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া হজরত মহান্মদ (সঃ) এর নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল, হে মহাপুরুষ সত্যধর্ম প্রচারক ! আমরা এমন হইতে আপনার নিকটে আসিয়াছি, আপনি কবরস্থিত

মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করাইয়া যদি দেখাইতে পারেন, তাহা হইলেই একাঞ্চিত্তে সকলেই আমরা মুসলমান হই । হজরত মহান্মদ (সঃ) কহিলেন, ভাল চল এখনই কবরস্থানে গমন করি । এই কথা শুনিয়া সকলেই কবরস্থানে গমন করিল, মক্কার শত সহস্র লোক দেখিবার জন্য আসিয়া একত্রিত হইল । তাহার মধ্যে একজন প্রাচীন বৃদ্ধ তিনি পিতৃপুরুষগণের মুখে ক্রমাশ্রয় শুনিয়া আসিতেছিলেন যে, এখানে বহু শতাব্দি পর্য্যন্ত একটি সমাধি আছে, কিন্তু তাহার কোন চিহ্নই নাই, কেবল শ্রবণ ছিল যে, এইস্থানে কোন লোকের একটি কবর আছে । সেই প্রাচীন বৃদ্ধ হজরত মহান্মদ (সঃ) কে, বলিলেন, আপনি এই কবরস্থিত মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করিয়া দেন । হজরত রসূল করিম (সঃ) সেই কবরদিকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলিবার পরে একটি ভীমকায় মহাবলবস্ত্র পুরুষ দুই হস্তে দুইটি অগ্নিময় মন্দিরা বা করতাল লইয়া, কবর হইতে উত্থিত হইয়া দাড়াইল এবং হজরতকে আপনার সালাম জানাইল । হজরত সালামের উত্তর দিয়া, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোন ধর্ম্মাবলম্বী ? তিনি কহিলেন, আমি মুসায়ী ধর্ম্মাবলম্বী হইতামি । হজরত মুসার ধর্ম্ম প্রচারের পরে আমার যত্নে

হয়, সেই অবধি আমি কবর মধ্যে নানারূপ প্রকারের শাস্তি ভোগ করিতেছি । হজরত কহিলেন, জগতে এমন কি পাপকার্য্য করিয়াছিলে যে, তজ্জন্য এরূপ শাস্তি ভোগ করিতেছ । সে ব্যক্তি কহিল, হজরত ! আমি জগতে গান গাহিয়া মন্দিরা বাজাইয়া জীবিকা নির্বাহ করিতাম তজ্জন্য আমার হস্তে অগ্নিময় মন্দিরা দুইটা, ইহার উত্তাপে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া ছাই ভস্ম হইয়া যায় । পুনরায় হজরত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্য করিয়া বল, আমি রসূল কি না । তখন সে ব্যক্তি কহিল, আপনি শেষ প্রেরিত রসূল, আপনারই সংবাদ তওরাত ও ইঞ্জিল গ্রন্থে আছে আমিও ভক্তিভরে আপনার কলেমা উচ্চারণ করিতেছি, “লাএলাহা ইল্লাহু মহাম্মদ রাসূলোলাহে” ঈশ্বর ব্যতীত উপাস্ত্র দেবতা নাই মহাম্মদ তাঁহার প্রেরিত রসূল । তিনি এই মহাবচন পাঠ করিতেই তাঁহার হস্তস্থিত অগ্নিময় মন্দিরা দুইটা ভুতলে পড়িয়া গেল, তিনিও লোক লোচনের অদৃশ্য হইয়া কবর মধ্যে লীন হইয়া গেলেন । তাহা দেখিয়া এমন বাসীগণ ও অন্যান্য কোরেশগণ পবিত্র কলেমা পড়িয়া মুসলমান হইয়া গেল, কিন্তু হতভাগ্য দুর্মতি আবুজেহেল মস্তক হেট করিয়া পলায়ন করিল । হে ইসায়ী খৃষ্টান ! তোমার ইহাতেও যদি দৃঢ়

বিশ্বাস না হয়, তবে আমি একজন সামান্যলোক হজরত মহান্মদ (সঃ) যের উম্মত । এস, আমার সমভিব্যাহারে এস, মৃতকে জীবিত করিয়া তোমাকে দেখাই । ইহা শুনিয়া নাছরাণী, হজরত গওসে সামদানি আব্দোল কাদের জ্বিলানি বড়পীর সাহেবের সঙ্গে কবরস্থানে চলিয়া গেল । একটা পুরাতন কবরের নিকটস্থ হইয়া বড়পীর সাহেব উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, উঠ, “কোমবাজনাল্লাহ” এই শব্দ বলিবামাত্র কবরস্থিত মৃত জীবিতাবস্থায় উঠিয়া বড়পীর সাহেবকে সালাম জানাইলেন । হজরত পীর-সাহেব তাহার সালামের উত্তর দিয়া, তাহাকে নিজস্থানে গমন করিতে বলিলেন । পরে সেই ইসায়ীকে বলিলেন, আমাদের যখন ঈশ্বর কৃপায় মৃতকে জীবিত করিবার ক্ষমতা আছে, তখন তিনি যে পারিবেন না বা পারেন না এই এ কথা কে আর অশিষ্ট করিবে । যখন আল্লাহু তায়ালা সকল পয়গম্বর হইতে হজরত মহান্মদ (সঃ) কে শ্রেষ্ঠতা দান করিয়াছেন, যখন তিনি অঙ্গুলির ইসারায় চক্রকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, তবে তাহা হইতে ঈশ্বর কৃপায় মৃতকে জীবিত করা কি অতি আশ্চর্য্য বিষয় ? ইসায়ী ব্যক্তি উম্মতে মহান্মদের এ আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়া ভক্তিভরে মহাবচন পাঠ করিয়া তৎক্ষণাৎ বড়পীর সাহেবের নিকট মুসলমান হইয়া,

সেই দিবস হইতে তন্ময়চিত্তে খোদাতায়ালায় উপাসনা ও আরাধনা করিতে লাগিল ।

একজন সদাগরের স্বপ্নযোগে ডাকাতী হইয়া ধনে প্রাণে বাঁচিয়া যায় তাহার বিবরণ ।

তওফাতুল কাদরি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, বোন্দাদের নিকটবর্তী একটি গ্রামে, শেখ হান্সাদ নামক একজন মহাতপস্বী সাধুপুরুষ বাস করিতেন, তাঁহার একটি পরম ভক্ত সদাগর শিষ্য ছিল ; তিনি গুরুর বিনা আদেশে কখনই কোন কার্য করিতেন না, গুরুর যখন যে আজ্ঞা করিতেন, সদাগর তখনই তাহা পালন করিতেন । একদিন বিদেশে বাণিজ্য যাইবার ইচ্ছা করিয়া, আপন গুরুর নিকট অনুমতি চাহিয়া বলিলেন, প্রভু ! আজ্ঞা করুন, বাণিজ্য যাত্রা করিবার মানসে আপনার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি । আশীর্বাদ করিবেন, যেন নির্বিঘ্নে বাণিজ্য করিয়া দ্বিগুণ লাভে ধনে প্রাণে ফিরে আসিয়া আপনার চরণ সেবা করিতে পাই । তখন শেখ হান্সাদ বলিলেন, তোমাকে আমি এসময়ে বাণিজ্যে যাইতে নিষেধ করিতেছি । কেননা

এবারকার বাণিজ্যে তোমার বহু ভয়েব কারণ আছে, যেহেতু তুমি বাণিজ্যে গমন করিলে ধনে প্রাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে, দক্ষ্যগণ তোমার বাণিজ্য আসবাব লুণ্ঠন করিবে, তোমাকেও প্রাণে বধ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবে না, অতএব তুমি এবারকার মত ক্ষান্ত হও, বাণিজ্য করিতে যাইবার জন্য গৃহ হইতে কখনই বাহির হইওনা । তোমাকে বারম্বার নিষেধ করিতেছি, গুরু-বাক্য লঙ্ঘন করিও না ; যখন তোমার এই মন্দ সময় শেষ হইয়া সুসময় উপস্থিত হইবে, কুণ্ঠে-নক্ষত্র লোপ হইয়া সুখ তারা ভাগ্য পটে উদয় হইবে, তখন তুমি আমার অনুমতি লইয়া বাণিজ্যে গেলে লাভবান হইতে পারিবে । সদাগর আপন গুরুদেবের মুখে বাণিজ্যের অমঙ্গল বার্তা শ্রবণ করিয়া বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, কি উপায়ে সংসারযাত্রা নির্বাহ হইবে তাহার স্থির করিতে না পারিয়া হজরত বড়পীর সাহেবের নিকটে আসিয়া, গুরুর নিষেধ বাক্য বাণিজ্যের অমঙ্গল বার্তা বাহা ঘটবার সম্ভব, তাহা ক্ষুণ্ণমনে সমুদয় বৃত্তান্ত শুনাইয়া দিলেন । সদাগর বড় পীরের পরম ভক্ত ছিলেন বলিয়া, তাহার হুঃখে হুঃখিত হইয়া, বড়ই ব্যথিত হইয়া পড়িলেন । সত্য যিনি দয়ার্জ-হৃদয় ভক্ত-বৎসল হয়, তিনি ভক্তের কষ্ট দেখিলে, কখনও নিশ্চিত হইয়া

থাকিতে পারেন না। প্রিয় সদাগরের মনকষ্ট দেখিয়া, বড়পীর সাহেব তাহাকে বলিলেন, বৎস ! আমি তোমার মনের ভাব বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি বাণিজ্যে যাইতে পারিলেই অত্যন্ত সুখি হও ; যাও বাণিজ্যে গমন কর, আর বৃথা চিন্তা করিয়া মনে কষ্ট করিও না, আমি আশীর্ব্বাদ করি, জগদীশ্বর বিশ্বপালক রক্ষাকর্ত্তা তিনিই তোমাকে সকল আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন, সাগর সলিলে, পাহাড় পর্ব্বতে, অরণ্য জঙ্গলে যেখানেই কেন তুমি থাকনা স্বয়ং খোদাতায়ালাই তোমার মঙ্গলময় কর্ত্তা হইয়া, বিস্তর লাভবান করাইয়া দিবেন। যাও, আর কোন ভয় করিও না, তোমাকে দয়াময় খোদাতায়ালাব করে সমাৰ্পণ করিয়া দিলাম এবং নিজের তোমার সমস্ত আপদ বিপদের ভার মস্তকে চাপাইয়া লইলাম। সদাগর বড়পীরের আশীর্ব্বাদে যাবপর নাই সন্তোষ হইয়া আনন্দ-সাগবে ভাসিতে লাগিলেন, পরে বাণিজ্যের দ্রব্যাদি লইয়া বড় পীরের আঞ্জামত বাণিজ্যে যাইতে শুভ যাত্রা করিলেন। কয়েক দিবস পরে একটা সহরে পৌঁছিয়া, একস্থানে তাঁবু ফেলিয়া আপনার মালপত্র বিক্রয় করিতে লাগিলেন। দ্বিগুণ লাভে সমুদয় মালগুলি বিক্রয় করিয়া, পুনরায় সে দেশের অন্ত্র দ্রব্যাদি স্থানে স্থানে ক্রয় করিয়া রাখিতে লাগিলেন। পরে সেস্থান

হইতে ফিরিয়া আসিবার কালে কয়েক স্থানেব বেশী মুদ্রার মাল ঘাহ ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহার ঠিকানা ভুলিয়া গেলেন । সামান্যই মাল পাইয়া সওদাগর মন-কষ্টে একস্থানে রজনী যাপন করিলেন । রাত্রিকালে সয্যায় শয়ন করিয়া স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যে, হটাৎ একদল দস্যু আসিয়া সমস্ত মাল, ধন রত্নাদি লুণ্ঠন করিয়া লইল এবং কয়েক জন দস্যু বাবংবার অজ্ঞাঘাতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিয়া চলিয়া গেল । জাগ্রত হইলে ঐ স্বপ্নের অন্য কোনও চিহ্ন লক্ষিত হইল না, কেবল মাত্র তাঁহার গ্রীবাদেশে একটি ক্ষতের চিহ্ন দৃষ্টি গোচর হইল, তাহাতে ফোঁটা ফোঁটা রক্তপাত হইতেছে

সওদাগর স্বপ্ন দর্শনে অতি আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া, খোদাতায়ালার শত শত ধন্যবাদ কবিয়া, পুনরায় সেই সকল দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন ; খোদাতায়ালার কি অপার মহিমা সওদাগরের হাবাধন পুনরায় একস্থানে দ্বিগুণ লাভে-মূলে প্রাপ্ত হইয়া গেলেন । সেই সফরে সওদাগর খোদাতায়ালার কৃপায় ও বড়পীরের দোস্তায় দ্বিগুণ অর্থ উপার্জন করিয়া নির্বিঘ্নে বোংদাদ সহরে ফিরিয়া আসিলেন । সওদাগর সহরের সীমানায় আসিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, প্রথমে আমি গুরুদেবের নিকটে যাইয়া দেখা কবিব ? না, বড়

পীরের চরণ সেবা করিয়া গৃহে গমন করিব? এইরূপ প্রকার মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়, তাঁহার গুরুদেব শেখ হান্নাদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন । সওদাগর হট্টাৎ আপন গুরুদেবের সাক্ষাত পাইয়া, তাঁহাকে সালাম দিয়া, পূর্বের কথা মনে করিয়া, ফিক করিয়া হাসিয়া উঠিলেন । শেখ হান্নাদ সওদাগরের মনভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, তুমি বাণিজ্যে যাবার কথা বড়পীর সাহেবকে যদি না বলিতে এবং তিনি তোমার জন্য যদি আশীর্বাদ না করিতেন, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই মহা বিপদগ্রস্ত হইতে, তাহাতে বিন্দুমাত্র ভুল ছিলনা ; তুমি বাণিজ্যে গমন করিলে, হজরত বড়পীর সাহেব তোমার ধন প্রাণ রক্ষার জন্য খোদাতায়ালা নিকট সত্তর বার দোয়া চাহিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দয়াময় খোদাতায়ালা বহুর কথা রক্ষা করিয়া তোমার উপরে স্বপ্নযোগে সমস্ত বিপদ দেখাইয়া দিয়াছিলেন । এজন্য তুমি ক্রয় করা দ্রব্যাদি হারা হইয়াছিলে, এবং তুমি স্বপ্ন ভঙ্গে নিজের অঙ্গে রক্ত দেখিতে পাইয়াছিলে । এখন তুমি তোমার রক্ষাকর্তা খোদাতায়ালাব ধন্যবাদ নাও এবং খোদাতায়ালা নামে দীন দুঃখী দারিদ্রদিগকে দান খায়রাত কর । সওদাগর গুরুদেবের কথায় আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন । পরে তাঁহার চরণে চুম্বন দিয়া, হজরত বড়পীরের নিকটে গিয়া

বাণিজ্যেব ঘটনা ও গুরুদেবের বর্ণনা সকল শুনাইয়া দিলেন । হজরত বড়পীর সাহেব তাঁহাকে বলিলেন, এ যাত্রায় আমার দোওয়ায় তোমার রক্ষা হইয়াছে । তোমার গুরুদেবও মহা সাধু, তাঁহার আজ্ঞা প্রাণপণে প্রতিপালন করিও এবং তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে কখনই কুষ্ঠিত হইও না ।

হজরত বড়পীর সাহেব খড়ম ফেকিয়া দস্যু
সংহার করিয়া সওদাগরকে রক্ষণ
করেন তাহার বিবরণ ।

সফিনাতুল আওলিয়া নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, আবু মহাম্মদ আব্দোল হক কুদ্দস সহরানু বর্ণনা করিয়াছেন যে, সফর মাহার তৃতীয় তারিখ সোমবার দিবসে বেলা অপরাহ্নের সময়, হজরত বড়পীর সাহেব বোংদাদের বিশ্ব বিদ্যালয়ে ছাত্র দিগকে শিক্ষা দিতে দিতে হটাৎ উঠিয়া ওজু করিয়া উপাসনা সমাপ্ত করতঃ উচ্চৈঃস্বরে “ইল্লাল্লাহু” বলিয়া একটি শব্দ করিয়া পাছুকা ছুখানি ক্রোধান্বিত হইয়া ফেকিয়া দিলেন ; সেই পাছুকা দুইটি দেখিতে দেখিতে কোথায় যেন আদৃশ্য হইয়া গেল । যে সময় তিনি পাছুকা ছুখানি স্ববলে নিক্ষেপ করিয়া-

ছিলেন, সে সময় তাঁহার চক্ষু দুইটী রক্তবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গ ক্রোধে খব খর করিতেছে, সে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দর্শন করিলে মহা বীর্য্যবন্ত পুরুষকেও ভয়ে ভীত হইতে হয় ; এমন কেহ বলিষ্ঠ পুরুষ নাই যে, সে সময় তাঁহার সঙ্গে একটা কথা কয় । সেই দিবস হইতে, এক মাস পর্য্যন্ত তাঁহার নিকটে গমন কবিত্তে মহান হৃদয় বলিষ্ঠ পুরুষ যিনি তিনিও ভয়ে কাঁপিয়া উঠিতেন । যখন একটা মাস গত হইয়া গেল, তখন একদল বণিক বোগদাদ সহরে আসিয়া পৌঁছিল । সেই বণিকদল হইতে একজন যুবক সওদাগর কয়েকটা স্বর্ণ মোহব, আমরুফি, কয়েকটা কিস্মতি প্রস্তর, এয়াকুত, ভাল ভাল রেসমের থান ও ভাল ভাল মেওয়া ফল ভূত্যের মস্তকে দিয়া পীর সাহেবের দরবারে উপস্থিত হইয়া কহিল, আপনারা পীর সাহেবকে এই সংবাদ দিন, যে আপনার আশ্রিত একজন সওদাগর আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করিতে আসিয়াছে । কেহ গিয়া পীর সাহেবকে সংবাদ দিতে, তিনি তখনই পূর্ণ কুটীর হইতে বাহির হইয়া দরবারে উপস্থিত হইলেন । তখনই সওদাগর সমস্ত দ্রব্য রাখিয়া, খড়ম দুখানি পার্শ্ব ধরিয়া, তাঁহার যুগল চরণ চুম্বন করিল । হজরত তাঁহাকে সমাদরে নিজের কাছে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার এই খড়ম দুখানি তুমি কোথায় পাইলে ? বণিক-তনয় অভিযাদন পূর্ব্বক

আদবের সঙ্গে বলিতে আরম্ভ করিল, হুজুর ! আমি
বাণিজ্য করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করতঃ পথি মধ্যে
আসিতে আসিতে একস্থানে বিশ্রাম করিতেছিলাম ;
সেইদিন সফর মাসের তৃতীয় তারিখ সোমবার দিবস
ছিল । হটাৎ একদল দস্যু আসিয়া আমার লোকজনকে
মারিয়া ধরিয়া, মাল আসবাব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইতে
আরম্ভ করিল । দস্যুর অত্যাচারে তববারীর প্রহারে
রক্তশ্রোতে প্রান্তর লালবর্ণ হইয়া গেল, আহত ব্যক্তির
চীৎকারে আমার প্রাণ শতধার বিদীর্ণ হইল, সেই লোম-
হর্ষণ হত্যাকাণ্ডের কথা মনে হইলে, এখন পর্য্যন্ত সর্ব-
শরীর কাঁপিয়া উঠে, অঙ্গ অবশ হইয়া পড়ে । সেই
ভয়ানক বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত, একমনে,
একধ্যানে ভব-ভয় নিবারণকারী, বিপদ বিনাশকারী সর্বমঙ্গ
কর্ত্তা খোদাতায়ালাকে স্মরণ করিতে লাগিলাম । মধ্যে
মধ্যে একবার, একবার, আপনার সাহায্য প্রার্থনা করিতে
ছিলাম ; এমন সময় দৈব একটা শব্দ শুনিতে পাইলাম,
সেই ভীমরবে সমুদয় প্রান্তর কাঁপিয়া উঠিল, ডুনিকম্পের
ন্যায় যেন সেই মরু প্রান্তর টলমল করিতে রহিল, দস্যুদল
প্রাণ ভয়ে ভীত হইয়া কে কোথায় পলায়ন করিল,
দেখিতে দেখিতে লুণ্ঠিত স্থানে শান্তিবারি বর্ষণ হইয়া
শান্তি মূর্ত্তি ধারণ করিল । দস্যুদল কে কোথায় লুকাইল

যে, তাহা বুধবার বা জানিবার সাধ্যাতীত হইয়া পড়িল । মরু প্রান্তর নীরব, নিঃশব্দ ; এমন সময় আবার বন জঙ্গল দিকে চীৎকার ধ্বনি হইতে লাগিল, “রক্ষা কর, রক্ষা কর” । দেখিতে দেখিতে ক্রমান্বয়ে চীৎকার ধ্বনি নিকটবর্তী হইলে লক্ষ্য করিয়া দেখি যে, কয়েক জন তক্ষর আসিয়া বলিতেছে, সওদাগর সাহেব । রক্ষা করুন !! রক্ষা করুন !!! আপনাব লুণ্ঠিত মাল ফিরিয়া নিন । আমাদিগকে প্রাণে বাঁচান আর কেন যথেষ্ট হইয়াছে দস্যুপতি মারা পড়িয়াছে, ভীষণ পাছুকা প্রহারে আর কাহার নিস্তার নাই, ম’লাম । ম’লাম !! পায়ে ধরি এ বিপদ হইতে রক্ষা করুন, যেমন কর্ম তদ্রূপ ফলই প্রাপ্ত হইয়াছি । তখন আমি ভরসা করিয়া তাহাদের সঙ্গে যাইয়া দেখি যে, দস্যুপতিদ্বয় খড়মাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া নরক-গামী হইয়াছে এবং এই দুইটি খড়ম দৈববলে যে দস্যু-দিগকে আঘাত করিতেছিল তাহা তখনই খামিয়া গেল । আমি আপনার, পাছুকা দুইটি চিনিতে পারিয়া হস্তে করিয়া তুলিয়া লইলাম, নিজের মাল আসবাব সকলই বুঝিয়া পাইলাম এবং সেই সকল দস্যুগণও দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া, আমার সমভিব্যাহারে আপনার কাছে মুরিদ হইতে আসিয়াছে । হজরত বড়গীর সাহেব তখনই তাহাদিগকে ডাকিয়া মুরিদ করিয়া সকলকে বিদায়

করিয়া দিলেন । বড়পীর সাহেবের এই আশ্চর্য্য কেরামতে সকলেই অবাক হইয়া গেল ।

একটি রমণীর সতীত্ব রক্ষা হয় তাহার বিবরণ ।

খোলাসাতল মোফাখারিন নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, উমর বজাজ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, বোগদাদ নগর মধ্যে একটি ষোড়শবর্ষীয়া রমণী পরমাসুন্দরী ছিল, তাহার রূপের ছটায় দশদিক আলো করিয়া থাকে, সেই যুবতী রমণীর সৌন্দর্য্যে প্রস্ফুটিত গোলাপ পুষ্পের মায় কতই লোকের মন চঞ্চল্য ভাব ধারণ করিত । পুরুষের পক্ষে রমণীরত্ব কতই যে রমণীয় বস্তু তাহা লেখকের সাধ্যাতীত । বসন্তকালে উদ্যান মধ্যে একটি বৃক্ষে প্রস্ফুটিত গোলাপফুল হেলা দোলা করিলে যেমন দেখিতে সুন্দর হয় এবং যাহার দৃশ্য সেই গোলাপের উপর পতিত হয়, তাহারই মন চঞ্চল হইয়া গোলাপের সুগন্ধি লইতে ইচ্ছা করে । একটি লম্পাটের চক্ষে সেই সাধবী সতী রমণীর সৌন্দর্য্য তদ্রূপ প্রায় হইয়াছিল । কিন্তু ঐ রমণী হজরত বড়পীরের নিকট মুরিদ হইয়া সর্বদাই ঈশ্বর আরাধনায় নিযুক্ত থাকিত, কখন

কু-অভিপ্রায় অন্তরের মধ্যে স্থান দিত না । কিন্তু একটি লোক তাহার ভুবনমোহন রূপের ফাঁদে পড়িয়া যাতনায় অস্থির হইয়া বেড়াইত । এরূপ ছুই তিন বৎসর রমণীর প্রতি আশক্ত হইয়া তাহার পাশব বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য স্বেযোগ খুঁজিয়া বেড়াইত । একদিন ঐ রূপবতী সতী রমণী কোন কার্য্য বশতঃ একটু অদূরে নির্জন বনের ধার দিয়া কোথায় যাইতেছিল । সেই দুইটা পূর্ব হইতে সন্ধান লইয়া আপনার কু-প্রবৃত্তি পূর্ণ করিবার জন্য ঐ বনের ধারে একটি গর্তে লুকাইত ছিল । নির্জন স্থানে স্ত্রীলোকটিকে একাকী নিকটে পাইয়া, তাহার অমূল্য রত্ন সতীত্বধর্ম্ম নাশের চেষ্টা করিতে লাগিল । লম্পটের হাতে পড়িয়া সতী নারী একবারেই নিরুপায় হইয়া পড়িল । নিকটে লোকজন নাই যে, কাহাকেও চীৎকার করিয়া ডাকে । সেই নির্জন স্থানে চীৎকার করিলে খোদাতায়ালা ব্যতীত কেইবা শুনে । তখন আর কোন অন্য উপায় না দেখিয়া, সতীত্বধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে অন্তর্ধ্যামী দাতা দয়ালু খোদাতায়ালাকে মনে মনে স্মরণ করিতে লাগিল । আর উচ্চৈঃস্বরে মুখে আপন গুরুদেব বড়পীর সাহেবকে ডাকিতে রহিল, হে ধর্ম্মের গুরু ! বড়পীর সাহেব ! আমাকে এই দুর্ন্যতি পাপিষ্ঠ লম্পটের হস্ত হইতে রক্ষা

করুন । সতীত্বধর্ম নাশ পায়, নিরুপায়, অসহায়, অবলা-
বালাকে, নির্জনালায় হইতে উদ্ধার করিয়' লউন । নতুবা
আমার সতীত্বে কলঙ্ক এবং তোমার পীর দস্তগীর নামে
কলঙ্ক হইবে (১) ।

“ইয়া গওসল আজম ! আল্‌গায়াসো, আল্‌
গায়াসো ।” হে গওসল আজম ! তুমি আমাকে
রক্ষা কর ! তুমি আমাকে রক্ষা কর ! যে সময় সতী
রমণী বিপদে পড়িয়া হজরত গওসল আজমকে ডাকিতে
ছিলেন সে সময় তিনি ওজু করিতেছিলেন ; দেখিতে
দেখিতে তাঁহার সেই জ্যোতির্ময় বদন হইতে যেন
অগ্নিশিখা বহির্গত হইতে লাগিল, ভক্তের বিপদ বুঝিয়া
আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বাম পদের একটি জুতা
খুলিয়া স্ববলে বনের দিকে ছুটিয়া সেই লম্পাটের মস্তক
লক্ষ্য করিয়া মারিলেন । পাছুকাটি তীরের স্রায় গিয়া
পাপীঠের মাথার উপর বার বার প্রহার করিতে লাগিল ।
বারবার জুতার ভীষণ আঘাতে দুই লম্পাটের,
মস্তকেব খুলী ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল এবং সেই
দণ্ডেই পাপাত্মার পাপাঙ্ক পূর্ণ করিতে গিয়া, জুতার
আঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়া নবকগামী হইয়া গেল ।

(১) পীরদস্তগীর, অর্থাৎ যে পীরের হস্তগত খোদাতায়ালি স্বয়ং হইয়া
থাকে, তাঁহাকে পীর দস্তগীর বলে

পরে ঐ সতী রমণী দয়াময় খোদাতায়ালাকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিয়া, বড়পীরের কেঁরামত বুঝিয়া, তাঁহার পাছুকাটা হস্তে লইয়া হজরত বড়পীরের নিকটে উপস্থিত হইয়া, সতীত্ব ধর্ম রক্ষার সকল ঘটনাগুলি একে একে খুলিয়া বলিল এবং সেইদিন হইতে সেই সতীনারী পীরের পদে মতি গতি রাখিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিল।

গুরুপদে মতি গতি আছে য়াঁহার।

ইহকালে পরকালে অভাব কি তাঁর ॥

বড়পীর সাহেবের নিকট হইতে দোওয়া
শিখিয়া দৈত্য-পতিকে আনয়ন করিয়া
একটি লম্পট দৈত্যের প্রাণবধ
করিবার বিবরণ।

জোঙ্গাতল আবার নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, আবু সৈয়দ আব্দোল্লা বেন আহাম্মদ বোগদাদি তিনি বলিয়াছেন যে, একদিন রাত্ৰিকালে, আমার একটি পরম সুন্দরী পঞ্চদশ বয়স্ক কন্যা অকস্মাৎ শয্যা হইতে কোথায় যেন অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, তাহা আমরা প্রাতঃকালে উঠিয়া জানিতে পারিলাম। তৎপরে কন্যার অন্বেষণে দিগদিগান্তরে লোক পাঠাইলাম; নিজেও নিকটবর্তী

পল্লীগাম ও প্রতিবাসীগণের বাড়ী ও বাগান, উद्याন, মাঠ, ময়দান, বন জঙ্গল ■■■ তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিলাম । সমস্ত দিন খুঁজিয়া খুঁজিয়া না পাইবার কারণে হতাশ হৃদয়ে, সন্ধ্যার সময়ে হজরত বড়পীর সাহেবের নিকটে গিয়া আদ্য অন্ত সমস্ত বিবরণ বর্ণনা করিয়া শুনাইয়া দিলাম । হজরত বড়পীর সাহেব আমার এই অকস্মাৎ বিপদ বার্তা শ্রবণ করিয়া বড়ই মনস্তাপ করিতে লাগিলেন ; পরে আমাকে এই মন্ত্রটী শিখাইয়া দিলেন । “শেখ আব্দোল কাদের জ্বিলানি শাইয়ান লিল্লাহু” ইহার পরে আমাকে বলিলেন, তুমি উক্ত মন্ত্রটী তিনবার পাঠ করিয়া কনিষ্ঠ অঙ্গুলীতে ফুক দিয়া ঐ অঙ্গুলীর দ্বারায় মৃত্তিকার মধ্যে চতুষ্কোণা একটা রেখা টানিয়া ঘর কাটিবে এবং ঐ রেখার ভিতরে বসিয়া তিন শত ষাট বার উক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে । সামান্য রাত্রির পরেই দলে দলে দৈত্যগণ আসিয়া উপস্থিত হইবে । সেই সকল দৈত্যগণ তোমাকে ভয় দেখাইতে নানারূপ ভয়ঙ্কর মূর্তিতে তোমার চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে থাকিবে, প্রায় সমস্ত রজনী দৈত্যগণ ব্যাঘ্র হিংস্রক জন্তুরূপে, কখন কখন অজাগর সর্পরূপে, ভয় দেখাইয়া তোমাকে তাড়াইবার চেষ্টা করিবে । সাবধান ! তাহাতে তুমি ভয় না করিয়া নির্ভয় অন্তরে এক মনে গুণ্ডির ভিতরে

বসিয়া থাকিবে । রজনীব শেষে স্বয়ং দৈত্যপতি বাদসাহ্ সৈন্য সমভিব্যাহারে আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন তুমি ষোড় হস্তে একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিবে । তোমার প্রতি দৈত্যরাজের দৃষ্টি পড়িলে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবে, রে মানব ! কে তোমাকে এখানে পাঠাইল ? তখন তুমি তাঁহাকে বলিবে হজরত আব্দোল কাদের জিলানি পাঠাইয়াছেন । পুনরায় তোমাকে বলিবে কি চাও ? তখন তুমি নিজের বক্তব্য বলিও । সাবধান এই কার্য্যটি নির্জন স্থানে একাকী একটা প্রান্তর মধ্যে সমাধা করিও । আমি তখনই পীর সাহেবকে সালাম করিয়া বিদায় হইলাম, পরে একটু রাত্র বেণী হইতেই একটা জনশূন্য প্রান্তর মধ্যে আসিয়া, পীর সাহেবের আদেশ মত মস্ত্র পাঠ করিয়া রেখা টানিয়া বসিলাম । তিনশত ষাটবার মস্ত্র পাঠ করিবার পরেই ভয়ঙ্কর মূর্তিতে দলে দলে দৈত্যগণ আসিয়া আমাকে ভয় দেখাইতে লাগিল । সেই ভয়ানক দৃশ্য দর্শন করিয়া পিপাসায় প্রাণ শুষ্ক হইয়া গেল, তথাপি সাহসে নির্ভর কবিয়া গণ্ডির মধ্যে বসিয়া রহিলাম । কিন্তু উপসর্গ ও ছুর্ত্তি-দৈত্য গণের এমন কাহার ক্ষমতা নাই যে আমার গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করে । কিন্তু তাহারা গণ্ডির অদূরে থাকিয়া আমাকে নানা প্রকারের ভয় দেখাইতে কোন প্রকার

ত্রুটি করে নাই। আমি সে সময় কোন দিকে না তাকাইয়া হেট মুণ্ডে বসিয়া রহিলাম। এমন সময় দৈত্যরাজ অশ্বারোহণে সৈন্য সামন্ত সহ আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলে, আমি একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। তখন দৈত্যরাজ আমাকে বলিলেন, কে তোমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন এবং কি জন্তুই বা এখানে আগমন করিয়াছে? আমি কহিলাম হজরত কোতবে-আলম, গওসল আজম, মহবুবে সোবহানি আব্দোল কাঁদের জ্বিলানি তিনিই আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। যে কারণ তিনি আপনার নিকট আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহাও আপনাকে জানাইতেছি। আমার একটা যুবতী সুন্দরী কন্যা রাত্র মধ্য কোথায় যে, অদৃশ্য হইয়াছে, তাহার অনেক স্থানে অন্বেষণ করিয়াছি কিন্তু কোনস্থানেই কন্যার সন্ধান পাইলাম না। আপনি এখন দৈত্য দ্বারা তাহাকে অন্বেষণ করিয়া আনিয়া দিলে, তবে আমি স্নেহের জনয়ার মুখ দেখিয়া তাপিত হৃদয় শ্ৰীতল করি।

দৈত্যপতি হজরত মহবুবে সোবহানি বড়পীর সাহেবের নাম শ্রবণ করিবামাত্র অশ্ব হইতে নিম্নে অবতরণ করিয়া হজরত বড়পীরের সম্মান স্বরূপ তাঁহার নামের অঙ্কিত রেখা-
টিতে বারবার চুম্বন করিতে লাগিলেন। তৎপরে দৈত্যরাজ

দণ্ডায়মান হইয়া আরক্তলোচনে দৈত্য দিগকে আদেশ করিলেন, যাও তোমরা শীঘ্র যাও, দেশ দেশান্তরে সেই দুষ্কের অন্বেষণে গমন কর । যেখানে তাহাকে পাইবে সেই খানেই বন্ধন করিয়া উহার কন্যাসহ লইয়া আসিবে । রাজ আজ্ঞা পাওয়া মাত্রেই দৈত্যগণ দিগদিগান্তরে গমন করিল এবং দণ্ডেক মধ্যেই সেই দুর্ভাগ্যকে বাধিয়া আনিল, তৎসঙ্গে আমার কন্যাও আসিয়া উপস্থিত হইল । একজন দৈত্যদূত যোড় হস্তে বাদসাহকে কহিতে লাগিল, হুজুব ! এই দুর্ভাগ্য দৈত্যাধমের চীন দেশে বাস, সর্বদাই এইরূপ প্রকারে দুষ্কামী করিয়া মানবগণকে কষ্ট দিয়া থাকে । এখন হুজুরের যাহা কর্তব্য হয় তাহাই করুন । তখন দৈত্য-রাজ দুষ্ক জ্বেনের প্রতি তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, রে দৈত্যাধম ! এই ব্যক্তির কন্যাকে কেন অপহরণ করিয়া লইয়াছিলি ? হজরত বড়গীরের ভয় কি তোর একটুও হইল না । দুষ্কমতি জ্বেন কহিল, হুজুর ! ঐ স্ত্রীলোকটির জন্মদিন হইতেই উহার প্রতি আমি আশক্ত আছি ; যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, তখন আর সহ্য করিতে না পারিয়া, উহাকে শয়ন গৃহ হইতে লইয়া গিয়াছিলাম । দৈত্যরাজ আর সময় নষ্ট না করিয়া তখনই দুষ্কের শিরশ্ছেদন করিতে আজ্ঞা দিলেন । দেখিতে দেখিতে দুষ্কের মস্তক ঘাতকের অসিঘাতে ধূলায় লুপ্তিত হইল ।

দৈত্যরাজ আমার কন্যাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া, বিদায় হইবার ইচ্ছা করিলে, সে সময় আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হুজুব ! আপনি দৈত্যপতি হইয়া বড়পীর সাহেবের আজ্ঞা কি জন্যই বা পালন করিয়া থাকেন ? তখন তিনি বলিলেন, তাঁহার আজ্ঞা পালনে কেন বাধ্য না হইবে ? যখন বড়পীর সাহেব মহাযোগ সাধনে বসিয়া ডুমগুলের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করেন, তখন আকাশ, পাতাল, স্বর্গ, মর্ত্য, সমুদয় থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে । বিশ্বপালক খোদাতায়ালা তাঁহাকে এমন ক্ষমতা দান করিয়াছেন যে, দেব, দৈত্য, দানব, মানব, পশু, পক্ষী, রাজা ও প্রজা সকলকেই বড়পীরের আজ্ঞা পালনে বাধ্য হইতে হইবে, নতুবা কিছুতেই তাহার নিস্তার নাই ;

বিশ্বপতির আজ্ঞাবহ হয় যেইজন ।

তাঁর আজ্ঞা সাবধানে করে সে পালন ॥

বড়পীরের আজ্ঞায় কুমরীপাখি কথাকয় আর
পায়রাতে ডিম দেয়, তাহার বিবরণ ।

মনাকব গওসিয়া মামক এছে লিখিত আছে, মনসা-
লেখ বলিয়াছেন যে, একদিন পিব দস্তগীর রোমন জমির

আহম্মদের পুত্র আবুল হোসেনের বাটীতে ভ্রমণ করিতে করিতে উপস্থিত হন । তিনি হজরত বড়পীর সাহেবকে আসন দিয়া অতি যত্নসহকারে বসাইলেন । অনেক কথোপকথনের পরে যখন হজরত উঠিয়া যাইবার জন্য খাড়া হইলেন, সে সময় আবুল হোসেন কর ঘোড়ে বড়পীরের নিকট কহিল, হজুর পীর রোসন জমির । আমি একটা কুমরী পাখি পুষিয়াছি, আর এক জোড়া পায়রা ঘরে রাখিয়াছি, কিন্তু ভাগ্যক্রমে কুমরী পাখিতেও বুলি বলে না এবং পায়রাতেও ডিম পাড়েনা, কেবল আমার কষ্ট করাই রুখা হইতেছে । ইহা শুনিয়া হজরত গওসল আজম, পায়রার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “এলফাগ লে মালেকা” এ, পায়রা । তুমি তোমার প্রতিপালক-কর্তার জন্য কেন ডিম পাড়িয়া উপকার করনাই ? যে হেতু তোমার কর্তা, তোমার বংশাবলি বাচ্ছার দ্বারায় লাভবান হইতে পারিবে । পরে কুমরী পক্ষিটিকে বলিলেন, “সাৰ্বেষ্ণ্ লেখালেকেকা” আর কুমরী । আঞ্জা-পালন কর তুমি, তোমার রবেবর ! বড়পীর সাহেবের আঞ্জায় সেই দিন হইতে পায়রা ডিম পাড়িতে ও কুমারী কথা বলিতে আবস্ত করিল । হজরত বড়পীরের পদার্পণে আবুহোসেনের এই একটা মহা উপকার সাধিত হইয়াছিল ।

বড়পীর সাহেবের ভৃত্য সপর্কপী জেঁন হত্যা করিয়া বন্দি হয় তাহার

বিবরণ ।

লাভায়েফ গরায়েব নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, হজরত খাজামইনদিন রহমাতুল্লা আলায়হে হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদিন আমরা কয়েকজন বন্ধু একত্রিত হইয়া বিদেশে ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইলাম । কতদূর যাইতে যাইতে একটা মনোহর উদ্যান দেখিয়া, আমরা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া উদ্যানের মনোহর দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম । সেই উদ্যানটী অতি মনোহর, নানারূপ ফল ফুলে শোভা করিয়াছে, কোন স্থানে খঞ্জন খঞ্জনি, ময়ূর ময়ূরী আনন্দে নৃত্য করিতেছে, কোন স্থানে ভ্রমরাতে গুঞ্জন স্বরে, গোলাপ, বেল, চামেলি, জুই, চাঁপা, পদ্য ফুলের মধু পান করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে । কখন কখন বসন্তের শ্রুশীতল সমীরণ আসিয়া মন প্রাণ উদাস করিয়া তুলিতেছে, আবার তামালের ডালে বসিয়া কাল কোকিল কুহু কুহু রবে কেমন স্মিষ্ট স্বরে গান করিয়া, মন প্রাণ বিমোহিত করিয়া তুলিতেছে । আমরা সেই উদ্যানে বসিয়া কতই আনন্দ উপভোগ করিতেছিলাম । এমন সময় বড়পীর

সাহেবের প্রিয়ভৃত্য, আমার পরম বন্ধু একটা সর্প দেখিয়া তাড়াতাড়ি যন্ত্রির আঘাতে তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল। সেই কালকূট সর্পটিকে হত্যা করিয়া, আমাদের দিকে তিনি ফিরিয়া আসিবেন কি, অগ্নি দেখিতে দেখিতে সমস্ত উদ্যানটা অন্ধকার ময় হইয়া গেল, এমন কি উদ্যানের একটা বস্তু মাত্রও দৃষ্টি গোচর হইল না, সকলই অন্ধকারময়। অকস্মাৎ ঝড়, তুফান, ঝন্ঝাঝন্ঝা ঝড়িকা বহিয়া ক্ষণেকের মধ্যেই যেন, প্রলয়কাল সংজ্ঞাটন করিয়া দিল। সে সময় কি করিব, কোথায় যাইব, কেমনে রক্ষা পাইব, যে তাহাও কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। কিন্তু বিধির কৃপায় সে দুর্ভোগ অব্যবস্থিত স্থায়ী থাকিল না, দেখিতে দেখিতে উদ্যান মধ্যে শান্তি দেবী আসিয়া দেখা দিল, ঝড়বায়ু, গভীর গর্জন, ঘোর অন্ধকার সকলি চলিয়া গেল। স্পর্শ দেখা যাইতে লাগিল, কিন্তু বড়পীর সাহেবের সেই প্রিয় ভৃত্য আমার পরম বন্ধুকে আর দেখিতে পাইলাম না। হায়! গ্রহ নক্ষত্র দোষে বন্ধু যে, আমার কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, তাহাও আর স্থির করিতে পারিলাম না। আমরাও তাহাকে উদ্যানের চতুর্দিকে অনুেষণ করিলাম, কিন্তু কোথাও তাহার দেখা পাইলাম না। বন্ধু-বিচ্ছেদে মনকণ্ঠে কতই কি চিন্তা করিতে লাগিলাম কিন্তু ভাগ্যদোষে

কিছুই ফলদয় হইল না ; অবশেষে নিরুপায় হইয়া ক্ষুধামনে সেই উদ্যান মধ্যেই বসিয়া রহিলাম । ঘণ্টাছুই পরে বনের দিকে চাহিয়া দেখি যে, বন্ধু আমার বনের দিক হইতে রাজবেশ পরিধান করিয়া, সাহানা টুপি মস্তকে দিয়া, আমাদের কাছে উপস্থিত হইল । সত্য সত্যই বলছি, বন্ধুর আমার সে ভাব, সে পবিচ্ছদ দর্শন করিলে, প্রাণের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হয় । প্রিয় বন্ধু দূর হইতে আমাকে দেখিতে পাইয়া তীরের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া, আমার গলা বেঁটন করিয়া কাঁদিতে লাগিল ।

বিচ্ছেদের পর সন্মিলনের কামা, কত যে মধুর । তাহা কে বুঝিতে পারে, সন্মিলনের কতই যে মাধুর্য্য, তাহা কে জানিতে পারে, যিনি বিচ্ছেদের পর মিলন করিয়াছেন, তিনিই জানিতে পারেন । দুঃখের পর যিনি সুখি হইয়াছেন, তিনিই সুখের আশ্বাদন বুঝিয়া থাকেন । যিনি দারিদ্রতার পর ধনবান হন, তিনিই ধনের গৌরব বুঝিতে সক্ষম হন । পাঠকগণ ! আজ সেইরূপ ভাবে ছুই বন্ধুতে সন্মিলনের কামার ভাব কতকটা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে । অনেক কামার পর, খাজামইনদ্দিন রহমাতুল্লা আলায়হে বন্ধুকে বলিলেন, বন্ধু ! আপনি সর্প সংহার করিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়াছিলেন এবং এই রাজ পরিচ্ছদই বা কোথায় পাইলেন ? তিনি বলিলেন,

ভাই ! আমি যখন সর্প সংহার করিয়াছিলাম, অকস্মাৎ সেই স্থান হইতে ধুম নিগতি হইয়া সমস্ত উদ্যান অন্ধকার হইল, প্রবল ঝড় তুফানে সর্বাস্থ কাঁপিতে লাগিল, এমন সময়ে সেই অন্ধকার মধ্যে একটি ভয়ঙ্কর মূর্তি আসিয়া আমার হস্ত পদ বন্ধন করিয়া ফেলিল। সেই দণ্ডেই আমাকে একটি জটালিকার মধ্যে লইয়া উপস্থিত করিল। আমি সেই বন্ধনাবস্থায় দেখিতে পাইলাম যে, স্বর্ণ খচিত সিংহাসনে একজন দৈত্যরাজ উন্মোচিত তীক্ষ্ণধার তরবারী হস্তে, আবক্তলোচনে বসিয়াছেন, এবং তাঁহার পার্শ্বে একটি মৃতদেহ রক্তাক্ত শরীরে পড়িয়া আছে। সেই দৈত্যরাজ যে সময়ে এক একবার মৃত দেহের দিকে দৃষ্টি পাত করিতেছেন, এমন বোধ হয়, যেন তাঁহার চক্ষুর জলে নদীর স্রোতের ন্যায় ধরাতল ভাসিয়া যাইতেছে। আবার যখন তাঁহার ঐ চক্ষু হইতে ফোটা ফোটা জল পড়িয়া থাকে, তখন এমন বোধ হয় কি ঐ চক্ষুর জলেই বা আজ সমুদয় জগত জ্বলাইয়া ভস্ম করিয়া দেয়। দৈত্যরাজের সে চাহনি দেখিলে পবে বীর পুরুষগণ ও ভয়ে ভীত হইয়া পড়ে। যখন আমাকে হস্ত পদ বন্ধন করিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দিল, তখন তিনি তববারী দেখাইয়া কটাঙ্ক দৃষ্টিপাত করিয়, ক্রোধান্বিত হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। রে মানব তনয় ! বিনা কারণে

বা বিনা অপরাধে আমার এই পুত্রটাকে কেন বাগান মধ্যে হত্যা করিয়াছ ? অকারণ একটি লোককে খুন করিতে তোমার প্রাণে একটু কি দয়া মায়ী হইল না ? তখন আমি কহিলাম, হে দৈত্য-অধিপতি মহাবাজ ! আমি কখনই কাহাকে খুন করি নাই, আমা হইতে এমন নির্ভুর কার্য্য কখনই হয় নাই । আমার কথাব শেষ হইতে না হইতেই দৈত্যরাজ কহিলেন, বে মানবকুল ! নিশ্চয় তুমি আমার সন্তানকে খুন করিয়াছ । ঐ তোমার দণ্ডাঘাতে উহার মস্তক চূর্ণ হইয়া রহিয়াছে । এখনও তোমার হস্তস্থিত যষ্টি রক্তমাখা মৃতের পার্শ্বে পড়িয়া আছে । সাবধান ! মিথ্যা কথা কহিলে তোমার আজ আমার করে কিছুতেই রক্ষা নাই, পুত্র হস্তার প্রতিশোধ এখনই লইব । তখন আমি সাহসে নির্ভর করিয়া কহিলাম, ধর্ম্মঅবতার দৈত্য-পতি ! কখনই আমি মানব কি দানব কে হত্যা করি নাই, তবে একটি কালসর্প হত্যা করিয়াছি, এই মাত্র সঠিক পরিচয় দিলাম । আবার ভীমরবে কহিলেন, রে নামাকুল হিংসাতুর মানব তনয় । বিনা কারণে সর্প সংহার করা এই বা কোন বিধি । তখন আমি তাঁহাকে এই হাদিসটা পাঠ করিয়া শুনাইয়া দিলাম ।

“কাতলোল মুজি কাবলাল ইজা ।”

অর্থাৎ আমাদের পয়গম্বর হজরৎ মহাম্মদ (সঃ) বলিয়াছেন, হিংস্রক জানোয়ার কষ্ট দিবার পূর্বেই তাহাকে সংহার কর। আমাদের শাস্ত্রানুযায়ী সর্পটীকে হত্যা করিয়াছি। ইহার জন্ত হত্যাকারীর কোন শাস্তি হইতে পারে না, আগিত আর আপনার পুত্রকে হত্যা করি নাই, যে তজ্জন্য আমাকে শাস্তি দিবেন। তখন দৈত্যপতি চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিলেন, রে নামাকুল হিংস্রজীবী. কালসর্প রুগী ঐ আমার পুত্র, উদ্যান মধ্যে শীকার কবিতেছিল, তোমাদিগকে দেখিয়া লতার মধ্যে লুকাইত হইবে কি অমনি তুমি আমার স্নেহের পুত্রকে হত্যা কবিয়া বসিলে, আবার বল আমি কোন দোষে দোষী নই; এখনই তোমাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলাইয়া প্রাণে বধ করিব। এই বলিয়া কাজীকে ডাকিয়া কহিলেন, এই মানব-তনয়, অকারণে আমার পুত্রকে খুন করিয়া মারিয়াছে, এখন উহার জন্ত বিচার মত যাহা শাস্তি হয় তাহাই করুন। বিচার পতি কাজী দুই জনের জবানবন্দী লইয়া, হত্যাকারীকে ভালরূপ দেখিয়া, দণ্ডাঘাতের পরীক্ষা পাইয়া, আমাকে হত্যাকারী সাবস্তু করিয়া, অসির প্রহারে প্রাণবধ করিতে বাদসার প্রতি আদেশ করিলেন। বাদসা তখনই ঘাতক জাল্লাদকে ডাকিয়া বধ্য ভূমিতে আমার প্রাণ বধ করিবার জন্ত

আদেশ করিলেন । ঘাতক দৈত্যরাজের আজ্ঞায়, আমাকে হত্যা করিবার জন্য যখন বধ্য ভূমিতে আনিয়া হাজির করিল, সে সময় জীবন রক্ষায় নিরুপায় হইয়া, মনে মনে বড়পীর সাহেবকে ডাকিতে লাগিলাম ।

বধ্য ভূমিতে ঘাতকের হাতে শানিত কৃপাণ দেখিলে, কার না প্রাণে ভয় হয় । আজ যাহাকে বধ করিবার জন্য মশান মধ্যে ঘাতকে লইয়া আসিয়াছে, পাঠক বলুন দেখি তার প্রাণে আজ কত ভয় ? একদিকে ভয়, ত্রাস, মৃত্যু নিদর্শন তরবারীর চাকচিক্য দর্শন ; অন্য দিকে পুত্র পরিজন ও বন্ধুবান্ধবের মায়া, চিন্তা, দুশ্চিন্তা, জ্বালা, যন্ত্রণা, ব্যাথা, শাসন, গীড়ন, উৎগীড়ন, আবার নানা প্রকার ভয়ঙ্কর দৃশ্য, সয়তানের চাতুরী, প্রাণ রক্ষার উপায়, এমন সময় জগতে কে নিশ্চিত্ত বা শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকিতে পারে ? দৈত্যরাজের কঠোর আজ্ঞায়, প্রাণ সংহার সময়, একবারেই কাষ্ঠ পুত্তলীকাবত নির্বাক, নিশ্চল, নিস্তেজ হইয়া একবার মাত্র, সর্বশক্তিমান খোদাতায়ালাকে স্মরণ করিলেন ; পরক্ষণেই বড়পীরের কৃপা, স্নেহ, দয়া, মায়া মনে করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, আবার, বলিলেন, হে বড়পীর গুণধর ! জন্মের মতন বিদায় হই । আর আপনার চরণ সেবা ও আজ্ঞা-পালন করিতে পারিব না, আর ভক্তিভরে স্তূধামাথা গওসল

আজম নাম ডাকিতে পাবনা ; হায় হায় ! বিদেশে
 পড়িয়া জীবন হারাই ! আপনিও আপনার স্মরণাগতের
 মরণ আসিয়া দেখিলেন না, এখন জ্বরাজীর্ণ দুঃখশোক
 সন্তপ্ত হৃদয়ে জন্মের মত জগত হইতে বিদায় হইলাম ।
 এই বলিয়া মূচ্ছিত হইয়া পড়িব কি, ঘাতকেও প্রহাব
 করিতে উদ্যত, এমন সময় বেগে অশ্ব ছোঁটাইয়া একজন
 বীর পুরুষ আসিয়া তববারী ঘাতে ঘাতকের প্রাণ সংহার
 করতঃ একটা শব্দ করিলেন, সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই
 সমস্ত পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল, দৈত্যপুরী যেন, রসাতল
 গাঙ্গী হইল, দৈত্যরাজ সিংহাসন হইতে ডুওলে, পড়িলে
 চতুর্দিকে হায় হায় শব্দ হইতেছিল । এমন সময়
 দৈত্যরাজ আগার পদতলে লুষ্ঠিত হইয়া আমাকে কহিল,
 আপনি কে তাহা সত্য করিয়া বলুন । তখন আমি
 কহিলাম, মহাবুবে সোবহানী আব্দোল কাদের জিলানি
 বড়পীর সাহেবের খেদমতগার দৈত্যরাজ হজরত বড়পীরের
 নাম শুনিয়া, গলে বস্ত্র দিয়া কহিতে লাগিলেন, আমি
 না বুঝিয়া অজ্ঞাত বশতঃ পুত্রশোকে জ্ঞান হারাইয়া
 আপনাকে বধ করিতে আদেশ করিয়াছিলাম ; এখন আমি
 আপনাকে ক্ষমা করিলাম, আপনিও আমাকে অনুগ্রহ
 করিয়া মার্জনা করুন । এই বলিয়া দৈত্যরাজ আমার
 শিরে সাহানাতাজ অর্থাৎ রাজ মুকুট ও রাজ পরিচ্ছদ

পরহীয়া দিলেন । আর যিনি আমাকে এখান হইতে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহাকে আদেশ করিলেন, তুমি উহাঁকে সেই উদ্যান মধ্যে রাখিয়া আইস । আমি আদিবারকালে বাদশাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি দৈত্য-পতি হইয়া কেন মানব-তনয় বড়পীরের নামে ভীত হন এবং তাঁহার সম্মান করিয়া থাকেন ? তখন তিনি আমাকে বলিলেন, যখন হজরত বড়পীর সাহেব ধ্যানে বসিয়া আরশেরদিকে তাকাইয়া দেখেন, তখন জগতের দেব, দানব, মানব ও দৈত্য, ইত্যাদি সকলই উহার জ্যোতির্ময়, তেজে ভয়ে ভীত হইয়া থর, থর কাঁপিতে থাকে, এমন কি আকাশ ও পাতাল পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠে । এই বলিয়া দৈত্যরাজ আমাকে বিদায় করিয়া দিলেন । নতুবা এ জীবনে আর আপনাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইত না ।

দৈব-হস্ত, শয়তানকে প্রহার করে তাহার বিবরণ ।

মাল্লাফুজ গিয়ামি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ আহাম্মদ বেমে সাংলে জ্বিলানি বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদিন হজরত পীরদস্তগীর মহরুবে মোবহানি রাহমাতুল্লা আলায়ছে, মনছুব নামক জামে মসজিদে উপাসনা করিবার

জন্ম যাইতে ছিলেন, অকস্মাৎ পথিমধ্যে একটা খর্বকায় পুরুষ আসিয়া, হজরতেব সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিতে লাগিল । আপনি আমাকে চেনেন না ? আমি পাপ-পুরুষ শয়তান । আপনার ও আপনার শিষ্যগণের পরম শত্রু । আপনি আমাকে ও আমার সহচর দিগকে বড়ই কষ্টে রাখিয়াছেন । এমন কি আমার যে দর্পের সহিত ডঙ্কা চলিতেছিল তাহা আপনি চালাইতে দেন নাই, আমাকে একেবারেই অধঃপতনে দিবার ইচ্ছা কবিয়াছেন, আচ্ছা ! ভাল, দেখা যাক কিরূপে আপনি আমাকে নির্যাতন করিতে পারেন, আমিও আপনার এবং আপনার শিষ্যগণের পশ্চাতে পশ্চাতে ফিরিতে রহিলাম, একটু দাঁও ঘাত পাইলেই ধ্বংস করিয়া ছাড়িব, ঘেমন আদি পুরুষ হজরত আদম (আঃ) কে স্বর্গ ছাড়াইয়া তিন শত বৎসর পথে পথে কাঁদাইয়া ছিলাম ! তদ্রূপ আপনাকেও করিব । তখন বড়পীর সাহেব রাগান্বিত হইয়া কহিলেন, সাবধান ছুরাত্মা ! মুখ সামলে কথা ক, নতুবা শাস্তি দিয়া ছাড়িব, এখন বল্চি সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যা । পাপমতি পাপাশয় শয়তান মদগর্বে গর্ভিত হইয়া, পীর সাহেবের কথা গ্রাহ্য না করিয়া, সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল । এমন সময় অদৃশ্য হইতে একটা দৈব-হস্ত আসিয়া শয়তানের ছুই গণ্ডে প্রহার কবিত্তে লাগিল । শয়তান সেই প্রহারের

জ্বালায় অস্থির হইয়া চাৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিল । আর একদিন বড়পীর সাহেব আহাৰ করিতে বসিয়াছেন, এমন সময় পাপাস্তুর শয়তান বর্ষা হস্তে হজরতকে হত্যা করিবার মানসে আসিয়া উপস্থিত হইল । কিন্তু তখনই অদৃশ্য হইতে একটা বীর পুরুষ তরবারী হস্তে শয়তানেব সম্মুখে আসিয়া, পাপাত্মাকে সেই শাণিত অসি উত্তোলন করিয়া দেখাইল (১) । পাপপুরুষ শয়তান, শাণিত কৃপাণের চাক্চিক্য দেখিয়াই, প্রাণভয়ে ভ্রীত হইয়া তথা হইতে পলায়ন করিয়া জীবন বাঁচাইয়া লইল । তৃতীয় দিনে—হজরত পীর সাহেব পথে যাইতে যাইতে দেখিলেন যে, শয়তান নিজেব মুখে ধূলা ও কালি মাখিয়া বলিতেছে, হে আব্দোল কাদের ! তুমি আমার এমন অবস্থা করিলে যে দুর্দশার শেষ হইল না, আমাকে হীন অবস্থাতেই জীবন যাপন করিতে হইল । তখন বড়পীর সাহেব বলিলেন, রে শয়তান ! তোর আবার মঙ্গল কোথায় ? ইন্শালাহু ! তোকে এই হীন অবস্থাতেই কাটাতে হইবে । হীন আজহার বলেন, পাপীর শাস্তি যদি না হইত, তাহা হইলে এ জগত পাপেই পবিপূর্ণ হইত ।

(১) দৈব-হস্ত, দৈব-পুরুষ, ঐটি বড়পীর সাহেবের পুণ্য ।

বড়পীর সাহেবের দোওয়ার ডুবো তরি—
বরকত্যা যাত্রিসহ জীবিত হয়
তাহার বিবরণ ।

খোলাছাতল কাদরি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, একদিন পীর দস্তগীর ভ্রমণ করিতে করিতে নদীর তীরে যাইয়া দেখিলেন যে, সেখানকার প্রতিবাসী রমণীগণ কলসী করিয়া জল তুলিয়া লইয়া যাইতেছে ; তাহার মধ্যে একটি অর্ধ বয়সী স্ত্রীলোক জলপূর্ণ কলসী রাখিয়া নদীর তীরে বসিয়া, জলের দিকে চাহিয়া চাহিয়া, উচ্চৈঃ-স্বরে হায় হায় করিয়া কাদিতে লাগিলেন । আঁহা ! তাহার সেই করুণ ক্রন্দন শুনিয়া, নদীর মৎস্য পর্য্যন্ত তাহার শোকে শোকাতুব হইয়া কাদিতে আরম্ভ করিল । তাহার সেই করুণ স্বরে, বনের পশু পক্ষীগণও রোদন করিয়া থাকে এবং বৃক্ষের পল্লব পর্য্যন্ত স্থলিত হইতে লাগিল । পুত্র শোকাতুরা বৃদ্ধার ক্রন্দনে নদীর তরঙ্গ কল্ কল্ শব্দে তাহার কাণের কাছে আসিয়া যেন, তাহার কান্নার সঙ্গে যোগ দিল, সে সময় বৃদ্ধার শোকের-নদী একবারেই উথলিয়া উঠিল । বাৎসল্য স্নেহ-ভোর সংযোগে যেন, তাহার মরমে মরমে, শিরায় শিরায়,

আকর্ষণ করিতে লাগিল । হায় রে, পুত্রশ্নেহ ! তোমার
 কি মধুরতাময় আকর্ষণী শক্তি ! শত সহস্র যোজন
 দূরে থাকিলেও তোমার আকর্ষণী শক্তি প্রভাবে প্রতি
 মুহূর্ত্তে পুত্রশোক শোকাভুর হইয়া হৃদয় দগ্ধে দগ্ধ হইতে
 থাকে ; যেমন চিনের দেশলাই টানিলেই আগুন জ্বলিয়া
 উঠে, তদ্রূপ প্রায় মৃত পুত্রের কথা মনে পড়িলেই হৃদয়ের
 অনল প্রবল বেগে জ্বলিয়া উঠে । বৃদ্ধার করুণ রোদন
 শ্রবণ করিলে পাষণ হৃদয় যার, তাহারও প্রাণ বিগলিত
 হয় ; বড়পীর সাহেব কি আর সে রোদন শ্রবণ করিয়া
 নিশ্চিত মনে থাকিতে পারেন । একেত তিনি দয়ার
 সাগর, গুণের আধার, বুড়ী বৃন্দন হিল্লোলে একবারেই
 অধীরা হইয়া পড়িলেন । আর থাকিতে না পারিয়া একটা
 লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন ; বলিতে পার ঐ বুড়ীর
 কি হইয়াছে, এবং কেনই বা এমন করিয়া নদীর ঘাটে
 রোদন করিতেছে ? সেই লোকটা কহিল, ছজুর ! ঐ
 বুড়ীর দশা হজরত এয়াকুব আলায়হেছাল্লামের চেয়েও
 অধিক চিন্তা, শোক, তাপ, দুঃখ । তিনি যেমন ইউসুফ
 আলায়হেছাল্লামকে হারা হইয়া হা ইউসুফ ! হা
 ইউসুফ ! করিয়া দিবা রাত্র পুত্রশোকে কাতর হইয়া
 বেড়াইতেন ; এই বৃদ্ধাটা তেমনি পুত্রশোকে কাতর
 হইয়া দিন রাত্র কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছেন । ইহার

দুঃখের কথা শুনিলে, পাষণ-হৃদয় লোকের প্রাণ শতধায়
 বিদীর্ণ হইয়া যায়। ঐ বুড়ীর একটি সন্তান ছিল, তাহার
 বিবাহের সম্বন্ধ নদী ব পারে হয়। তাহাতে বুড়ী দু পয়সা
 ব্যয় করিয়া ছেলের বিবাহ দিতে বরযাত্রিসহ পারে
 পাঠাইয়া দেন। বর যাত্রীরা বরের বিবাহ দিয়া কন্যাসহ
 সমস্ত বরযাত্রি নৌকায় উঠিয়া হাসিতে খেলিতে মহা
 আনন্দে নদীতে আসিতেছিল। নাবিকগণ তাহারাও
 উল্লাসিত হইয়া তরি বাহিয়া আসিতে আসিতে যখন
 ঘাটের নিকটবর্তী হইল, তখন সকলের মনই উল্লাসিত।
 তখন বৃদ্ধাও তীরে আসিয়া বেটা বোকে দেখিবার জন্য
 আনন্দে অধীরা হইল। কিন্তু দৈব বিড়ম্বনা কি কঠিন!
 হায়! সে কথা বলিতে গেলে বুক ফাটিয়া যায়, অকস্মাৎ
 আকাশে একটি কাল মেঘ বসাইয়া প্রবল ঝটিকা বাহির
 করিল। হায়, সেই কাল ঝটিকা আসিয়া, কণে বরযাত্রি
 সহ তরী ডুবাওয়া দিল। দেখিতে দেখিতে চক্ষের
 পলক মধ্যেই নদীগর্ভে সকলই লীন হইল, দাঁড়ি মাজি
 বলিতে একটি প্রাণী ■ রক্ষা পাইল না। দিনে দিনে দিন
 চলিয়া যাইতেছে, আজ দ্বাদশ বৎসর অতীত হইয়া গেল,
 তথাপি ঐ বৃদ্ধা আজ পর্যন্ত পুত্র বধুর শোক ভুলিতে
 পারে নাই, যখনই নদী ঘাটে জলের তরে আসেন তখনই
 একবার করিয়া কানিতে থাকেন। হুম্মর । কথায় বলে—

মায়ের অস্থি যতদিন মাটিতে পৌঁতা ।

তথাপি বলে মোর বাছা কোথা ॥

এই বৃদ্ধার দশাও তাই, এমন কেহই আত্মীয় নাই
যে, উহাঁকে সান্তনা করে ।

বৃদ্ধার এই ছুঃখের কথা শ্রবণ করিয়া, বড়পীর সাহেবেব
দয়ার-সমুদ্রে উথলিয়া উঠিল, চক্ষে জল পড়িল ; বৃদ্ধার
ভাণ্ড্য পীরের কৃপাদৃষ্টি হইল । তখন তিনি একটি লোক
পাঠাইয়া বৃদ্ধাকে বলিলেন, তুমি ক্ষান্ত হও, আর কোন
চিন্তা করিও না, এখনই তোমার ছুঃখের অবসান হইবে,
কোলের ছেলে কোলে পাইবে ; পুত্রবধুর মুখ দেখিয়া
তাপিত প্রাণ শীতল করিবে । এই কথায় বৃদ্ধার মনে
একটুও প্রত্যয় হইল না, স্তুরাং সেই ভাবেই মনের
ছুঃখে কাঁদিতে রহিলেন । হজরত পীর দস্তগীর পুনর্বার
খেদ্দমতগারকে পাঠাইয়া তাঁহাকে প্রবোধ বাক্যে সান্তনা
করিতে বলিলেন । বৃদ্ধা কিছুতেই বোধ মানিছেননা,
খেদ্দমতগার কহিল, আরে বড়ী মা । তোমার ভাগ্য ভাল
যে, বড়পীর সাহেব তোমার প্রতি মুখতুলে চাহিয়াছেন ।
এখনি তাঁহার দোয়ার বরকতে তোমার পুত্র বধু সকলই
বাঁচিয়া যাইবে । ইহাতে বৃদ্ধা একটু স্থস্থির হইলেন ।
ওদিকে হজরত বড়পীর সাহেব, সেই সর্ব শক্তিমান দাতা
দয়ালু খোদাতায়ালায় নিকটে হাত তুলিয়া প্রার্থনা করিতে

লাগিলেন, হে অন্তর্যামী সর্বময়ের কর্তা, সৃষ্টিস্থিতি লয়-প্রলয়-কারী বিশ্ব প্রালক ! তুমি সকল ভাবই জ্ঞাত আছ। কৃপা করিয়া এ দীন হীনের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া দিউন। অনাথা বৃদ্ধার পুত্র, বধু, বরযাত্রি, তরঙ্গী, সমুদ্র, হইতে স্বজীব উঠাইয়া তাহার মন আশা পূর্ণ করুন। হজরত বড়পীর সাহেব এইরূপ প্রকারে অনেকক্ষণ প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু কোন ভাব বুঝিতে না পারিয়া, অনেক বিলম্ব দেখিয়া মস্তকের উফিষ খুলিয়া আবার হস্ত উঠাইয়া বলিলেন, হে জগত পতি ! দাতা দয়াময় নাম ধরিয়া, অনাথার প্রতি দয়া করিতে এত বিলম্ব কেন ? অমনি দৈববাণী হইল, হে বন্ধুবর ! একি মুখের কথা যে 'বলা' মাত্রই অর্ঘটন ঘটন সম্পূর্ণ হইবে ? আজ বার বৎসর অতীত হইয়া গেল, বর যাত্রি তারি সহ সমুদ্র গর্ভে কোথায় লীন হইয়া গিয়েছে, তবে তাহা কেমন করিয়া স্বজীব হইবে। আবার তিনি বলিলেন, হে জগত পতি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কর্তা ! বন্ধুর কাছে এত চাতুরি কেন ? যিনি "কুন" শব্দে সমুদয় জগত সৃষ্টি করেন, তাঁহার আবার অসাধ্য কি ? যিনি পলকে প্রলয় করেন, সমুদ্রকে পর্বতে পরিণত করেন ; মরুভূমিকে উর্বরা করেন জনশূন্য নিখীড় অরণ্যকে নগর করিয়া লোকালয়ে পূর্ণ করেন, তাঁহার আবার মৃতকে জীবিত করিতে কতক্ষণ

সময় যায় । পুনরায় দৈববাণী হইল, হে বন্ধুবর !
 ভাবিয়া দেখুন, যাহাদের অস্থি, মাংস, মজ্জা ইত্যাদি
 সমুদ্রের হাঙ্গব, কুম্ভীর উদরস্থ করিয়াছে, একটু চিহ্নও
 পাওয়া যাইবে না, তাহাদিগকে কেমন করিয়া জীবিত
 করিয়া দিতে বলেন, ভাবিয়া দেখুন ! এমন অসম্ভব
 কথা বলিয়া বন্ধুকে লজ্জিত করা একি বন্ধুর কার্য্য ।
 হে দয়াময় বিশ্ব জগতের অধীশ্বর ! এ আবার কেমন
 কথা ? যে সময় প্রলয় কাল হইয়া আকাশ, পাতাল,
 সাগর, পর্বত, দেব, দৈত্য, মানব, দানব, পশু, পক্ষী
 কোন প্রাণী মাত্রেই থাকিবে না ; সকল নীরব নিস্তন্ধ
 হইবে, কেবল মাত্র আপনি বর্তমান থাকিয়া পুনর্ব্বার
 সকল প্রাণীর প্রাণদান করিবেন, সেইদিন তবে কেমন
 করিয়া সকল জীবের পুনঃ উদ্ধার হইবে । পুনর্ব্বার
 দৈববাণী হইল, বন্ধু ধ্যান ভঙ্গ কর, চাহিয়া দেখ এবং
 জগতকে দেখাও, বন্ধু বন্ধুব জন্য কি কার্য্য না করিতে
 পারে । হজরত পীরদস্তগীর, নয়ন মেলিয়া চাহিয়া
 দেখিলেন যে, নদীর ঘাটে স্তম্ভজিত বর কনে, বরঘাত্রিতে
 তরঙ্গী পরিপূর্ণ । কেহ হাসিতেছে, কেহ গাহিতেছে,
 দাঁড়ি মাঝিগণও দাঁড় বাহিতেছে, সেই মহান দৃশ্য দর্শন
 করিলে পথের পথিক্ যাহারা, তাহারাও একবার চাহিয়া
 বর-কনের যুগল মিলন, যুগল ভাব দর্শন করিয়া স্তম্ভী হয় ।

যে যেমন পরিচ্ছদ পরিয়া ডুবিয়াছিল, তাহার তেমনই পরিচ্ছদ পরিধান করা আছে । কাহার জামা ধপধপে বাসীকরা, কাহার জামায় বিবাহ-বাটীব চিহ্নিত রঙ্গের ছিটা, কাহার ময়লা কাপড় পরা, কেবল বর-কনে নবসাজে নবভাবে পাঙ্কীর ভিতর বসিয়া আছে । পাঠক ! সেভাবে দর্শন করিলে, মনে করিবেন আজি যেন বর বিবাহ করিয়া কনে লইয়া ফিরিয়া আসিল । হে দাতা দয়ালু দয়াময় ! ধন্য তোমার কারিগুরি, ধন্য তোমার দয়াময় নাম । দেখুক, জগত দেখুক । কীর্ত্তি দেখিয়া তাঁহারা শত শত ধন্যবাদ করুক । তরুণী যখন ঘাটে বাঁধিল বরষাত্রি ও ববকনে ডীরে নাখিল, নগরবাসীগণ সংবাদ পাইয়া ছুটে আসিল, যে যাহার ভাই বন্ধুকে দেখিয়া উল্লাসিত হইয়া ধরে চলিল । বৃদ্ধা, পুত্র ও বধু লইয়া বহুদিবসের শোকতাপ শান্ত করিয়া আনন্দে অধীরা হইয়া, বড়গীরের চরণে পড়িয়া অনেকটা কাঁদা কাটা করিয়া বলিল, ছজুর । আপনার কৃপায় মৃত পুত্র ও বধুর মুখ দেখিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিলাম, পীর সাহেবও তাহাকে দোওয়া করিয়া সেখান হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন ।

হজরত বড়পীর সাহেব, যুতু্যপতি যমের নিকট
 হইতে যুত প্রাণীর পরমাত্মা কাড়িয়া
 লইয়া, অনেকগুলি প্রাণীর জীবন
 দান করিয়াছিলেন তাহার
 বিবরণ ।

তহফাতুল কাদরি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ
 আবুল হোসেন রফাই বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদিন
 একটা বৃদ্ধ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিত, হজরত বড়পীরের
 নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল । তাঁহার করুণ রোদনে
 হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, তাঁহার চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া
 যাইতেছে, আহা ! তাঁহাব সে অবস্থা দর্শন করিলে
 কঠিন হৃদয়েও দয়ার সঞ্চার হয় । কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি
 হজরত বড়পীরের চরণতলে পতিত হইয়া বলিতে লাগি-
 লেন, হজুর ! আজ আমার একটা স্নেহের পুত্র, হৃদয়ের
 মাণিক, অক্ষের যষ্টি, স্নেহের নিধি, আমাকে জন্মের মত
 শোক-সাগরে ভাসাইয়া, একাকী রাখিয়া ইহ জগত
 হইতে চলিয়া গিয়াছে । আর বাছার আমার চাঁদ মুখ
 দেখিতে পাইব না, আর তার সেই চাঁদ মুখেব স্খামাখা
 কথা শুনিয়া তাপিত হৃদয় শীতল করিতে পাইব না ।

বাছাত আমার চলিয়া গিয়াছে, তবে আপনি যদি কৃপা করিয়া আমার মৃত পুত্রের মঙ্গলের জন্য খোদাতায়ালার নিকটে কিঞ্চিৎ দোওয়া করেন এবং একবার অনুগ্রহ পূর্বক আমার বাটীতে আসিয়া মৃত পুত্রের দুর্দশা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া যান, তাহা হইলে এ সময়ে আমি কিঞ্চিৎ সুস্থ হই । আহা ! দয়ার-সাগর, গুণের আধার বড়পীর সাহেব, বৃদ্ধের এরূপ কাতর বচনে বড়ই ব্যথিত হইয়া পড়িলেন । পুত্র শোকাতুর বৃদ্ধের দুর্দশা দেখিয়া আর নিশ্চিন্তভাবে থাকিতে পারিলেন না ; তখনই বৃদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন । হজরত বড়পীর সাহেব, বৃদ্ধের বাটী গিয়া, তাহার মৃত পুত্রের রূপলাবণ্য দেখিয়া হজরতের দয়াবাণি উথলিয়া উঠিল, আর সহ্য করিয়া থাকিতে পারিলেন না । তখনই ধ্যান (মোরাকিবায়) বসিলেন, হজরত মোরাকিবায় বসিয়া ধ্যানবোগে মালেকোল মওত সমনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহাকে বলিলেন, হে মৃত্যুপতি কৃতান্ত ! শীঘ্র এই বৃদ্ধের পুত্রের মহাপ্রাণি-পরমাত্মা আমাকে ফিরাইয়া দিন আমি এ পুরবাসীদেব আর ক্রন্দনধরনি সহ্য করিতে পারিতেছি না এখনই বালকের প্রাণদান করিয়া উহার মাতা পিতা আত্মীয় স্বজনকে শোক-সাগর হইতে উদ্ধার করিষ লইব । মৃত্যুপতি যম কহিলেন, কি আশ্চর্য্য কথা ! যাহা কখন শুনি নাই

এবং কেহই বলিতে সাহস পায় নাই, আপনি আমাকে তাহাই বলিতেছেন । কি আশ্চর্য্য ! আপনার মত মহৎ ব্যক্তির মুখে একথা জানা কি সম্ভব ? লোকেব প্রাণ বাহির হইলে কি সে প্রাণ আবার ফেরৎ পাইয়া থাকে ? যাহা বলিবার কথা নয়, আপনি আমাকে তাহাই বলিতেছেন । আমি বুদ্ধের পুত্রের প্রাণ হরণ করিয়াছি, তাহা আপনার কি ? আমার কার্য্য আমি করিতেছি, আপনার যে কার্য্য, তাহা আপনি সমাধা করুন ; আমার কার্য্যের সঙ্গে আপনার কোনও সংশ্রব নাই । কালের কুটিল বাক্যে, বড়পীর সাহেব রুষ্ট হইয়া কহিলেন, রে নিষ্ঠুর ঘম ! তোমার হৃদয় নির্মম, নির্দয়, কঠিন, পাষণ্ড নিৰ্ম্মিত । তাই তুমি কঠিন হৃদয়ে কাহাকেও বন্ধু হারা, কাহাকেও জ্ঞাতি হারা কবাইয়া, কোন স্ত্রীর পতি হারা করাইয়া, কোন পিতার পুত্র হারা করাইয়া, হা পুত্র, হা পুত্র রবে কাঁদাইতে কাঁদাইতে তাঁহাকে গভীর শোক-সাগরে ডুবাইতেছ । কাহাকেও অবিরত অশ্রুজলে ভাসাইতেছ, আবার কাহার হৃদয়ে জ্বলন্ত হত্যাশন জ্বলাইতেছ । কাহারও পূর্ণ সংসার হাত বাড়াইয়া স্বগূলে নিৰ্ম্মূল করিতেছ যে তরুণেরেব আশ্রয় লইয়া শত শত পক্ষী স্তখে বিবাজ করিতেছে, তাহাকেও সগূলে উৎপাটন করিয়া, পক্ষীর শাবক, ডিম পর্য্যন্ত অকালে নষ্ট করিয়া

দিতেছ । যে সুন্দর লোকরঞ্জন কুসুম সুবাসে চতুর্দিক
আমোদিত করিয়া জগৎ মুগ্ধ করিত, হে নির্দয় কাল !
তাহাকেও তুমি নষ্ট করিয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাক ।
বুঝিলাম তুমি জগতের সুখ দেখিয়া অত্যন্ত যাতনা ভোগ
কর । তাই তুমি একরূপ কঠিন কার্য করিতেই ভালবাস ।
রে নির্দয় কাল ! কঠিন কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছ
যদিও কি তোমাব হৃদয় এত কঠিন ! তখন কৃতান্ত
কহিলেন, হে তাপস প্রবর ! আমি যে কার্যের ভার
গ্রহণ করিয়াছি, ইহা নিজের ইচ্ছায় নয় । ইহাও সেই
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-প্রলয়কাণ্ডী কর্তার আদেশে । আমি তাঁহার
অনুমতি ব্যতীত কখন কাহার মহাপ্রাণী হরণ করি নাই
এবং তাঁহার আদেশ ব্যতীত পরমাত্মা কাহাকেও দিতে
পারি না । দয়াময় বিশ্ব পালকের অনিচ্ছায় আমার
যদি জীবের জীবন সংহার করিবার ক্ষমতা থাকিত, তাহা
হইলে এতক্ষণ আপনিও আমার করে প্রাণ হারাইয়া
যসিতেন । এতগুলি কথা কহিবাব আর অবকাশ পাই-
তেন না । হজরত মৃত্যুপতি যমের কথায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ
হইয়া লক্ষ্য দিয়া উঠিলেন, এবং এক লক্ষ্মেই তাঁহার হস্ত-
স্থিত জাঁশ্বিল কাড়িয়া লইলেন (১) । যমরাজ (মালৈ-

(১) জাঁশ্বিল একপ্রকার খনি । জীবন প্রাপ্ত হওয়া পূর্বের লিখন ।

কল মওত) সেইদিন তিনি যত জীবের প্রাণহরণ করিয়া-
 ছিলেন, তৎক্ষণাত্ৰ ঐ জাঁম্বিল মধ্যে রাখিয়াছিলেন হজরত
 বড়পীর সাহেব তখনই জাঁম্বিল (থলেব) মুখ খুলিয়া বাড়া
 মারিয়া বলিলেন, হে আত্মা সকল ! তোমাদের স্বজন
 কর্তা প্রতিপালকের শপথ এখন তোমরা স্ব স্ব দেহে
 প্রবেশ করিয়া পুনর্জীবন প্রাপ্ত হও । আহা, দয়াময়ের
 কি আশ্চর্য্য লীলা, বড়পীরের কি বাক্যের সত্যতা, সকল
 আত্মা গুলিই নিজ নিজ দেহে প্রবেশ করিয়া জীবন লাভ
 করিল । তন্মধ্যে কত শত পশু পক্ষীরও প্রাণ ছিল ।
 সে সকল পশু পক্ষীরও জীবন দান পাইয়া যে যার স্থানে
 বাসা লইল । মনুষ্যগণও জীবন প্রাপ্ত হইয়া, যে যাহার
 সমাধি স্থান হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিল । বৃদ্ধের
 পুত্র পুনর্জীবন লাভ করিলে, তাহার মাতা পিতা আত্মীয়
 স্বজনবর্গ সকলেই আনন্দে অধীর হইল, কান্না মুখে হাসি
 আসিল, সকলেই পীর সাহেবকে লক্ষ লক্ষ সালাম
 জানাইল । এ দিকে মৃত্যুপতি যম, মৃতজীবের আত্মা
 হারাইয়া মহা ভাবনায় পতিত হইলেন, খোদাতায়ালা
 জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিয়া যে উত্তর করিবে তাহার
 উপায় না পাইয়া নিরুপায় অন্তরে হেট মুণ্ডে কতই কি
 চিন্তা করিতে লাগিলেন । এমন সময় দৈববাণী হইল,
 হে মালেকল মওত ! আমার বন্ধুর সম্মান রাখিয়া,

কেবল যদি স্বন্ধের পুত্রের একটি প্রাণ ছাড়িয়া দিতে, তাহা হইলে আজ তোমার হরণ কবা এতগুলি প্রাণ হাত ছাড়া হইত না এবং অদ্যকার জীব জন্তু সকলই পুনর্জীবন লাভ করিত না। আজ তুমি আমার বন্ধুর সঙ্গে অসৎ ব্যবহার করিয়া বড়ই অন্যায় কার্য্য করিয়াছ। কিন্তু তজ্জন্য তুমি আমার নিকট সম্পূর্ণ দায়ী। মৃত্যুপতি বিশ্বপালক খোদতায়ালার নিকট হইতে এরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া, ভয় বিহ্বল চিত্তে প্রার্থনা করিলেন, হে করুণাময় জগতপালক অনাদি অনন্তময়! তোমার মহিমা বুঝা ভার, কাহাকে কেমন ভাবে চালনা কব, তাহা কাব সাধ্য যে হৃদয়ঙ্গম করে আমি একজন ক্ষুদ্র দূত মাত্র, সাধ্য কি যে তোমার লীলা খেলা বুঝিতে পারি, তবে যাহা দোষ করিয়াছি, তাহা কৃপা করিয়া আপনার বন্ধুধর আব্দোল কাদের জ্বিলানীর মহৎ গুণের দ্বারায় আমাকে ক্ষমা করুন। পুনবায় আদেশ হইল, হে মৃত্যুপতি! আমি তোমাকে কখনই ক্ষমা করিতাম না, কেবল আমার মহবুবের সাহায্যে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলে বলিয়া তোমাকে ক্ষমা ক'রিয়া দিলাম।

হজরত বড়পীর সাহেবের নামের গুণে
পঞ্চদশ বর্ষিয় রোগী রোগমুক্ত হয়
তাহার বিবরণ ।

আনসেল কাদরি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ আবুল হোসেন হইতে বর্ণিত হইয়াছে, আবুল আহাম্মদের পুত্র জাফর আহাম্মদ একদিন হজরত বড়পীর সাহেবের নিকটে আসিয়া করুণস্ববে বলিলেন, হুজুব ! আমাব একটা পুত্র সন্তান পঞ্চদশ বৎসব প্রায় অতীত হইয়া-
গেল কঠিন রোগে শর্য্যাগত হইয়া পড়িয়া আছে, দিন দিন অত্যন্ত দুর্বল হওয়াতে মৃত্যু মুখে পতিত হইবার সম্ভব । কেননা ক্রমেই হাড় মাস তস্থি পাঞ্জর একসঙ্গে জড়িভূত হইয়া আসিতেছে । আর তাহার হাঁটু দুইটা শুক হইয়া কেবল অস্থিসার হইয়াছে । আপনি ইহার একটু তদ্বির করিয়া দিন, যাহাতে বালকটা আবোগ্যলাভ করে । হজরত কহিলেন, যাও, তাহার কর্ণে মুখ দিয়া “উম মলোদম শেখ আব্দোল কাদেরকা হুকুম হেয়” এই মন্ত্রটা বলিয়া ফুক দিয়া, পুনরায় বলিবে, এই বালকটাকে ত্যাগ করিয়া হোল্লাহাব (*) দিকে শীঘ্র শীঘ্র

(*) হোল্লাহা একটা দূরবর্তী গ্রামের নাম ।

চলিয়া যা ; এইরূপ বলামাত্রই তোমার সমস্তান কঠিন রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিবে । বড়পীরের বচনটী শিক্ষা করিয়া জাফর আহাম্মদ সেইরূপ প্রকারে কর্ণে মন্ত্রপুত করিয়া ফুক দিতেই বালকটী আরোগ্যলাভ করিল । আব কখনই তাহাকে জ্বর জ্বালা স্পর্শ করিতে পারে নাই । বড়পীরের নামের গুণে সকল বিপদই বিনাশ হয় ।



বড়পীর সাহেবের দোয়ায় বোংগদাদ সহরের কলেরা (কলেরা) বিনাশ পায় তাহার বিবরণ ।

গোলজার মানি নামক গ্রন্থে শেখ আলি বোংগদাদি হইতে বর্ণিত আছে যে এক বৎসর বোংগদাদ সহর মধ্যে এমন কলেরা রোগের আবির্ভাব হয়, তাহাতে সহরের প্রত্যহ শত শত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতে থাকে । প্রত্যেক ঘরে ঘরে কলেরার ভয়ঙ্কর মূর্তি দর্শন করিয়া তাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে লাগিল । প্রত্যহ সমাধিস্থান কবরে পূর্ণ হইতে লাগিল অবশেষে নগরবাসীগণ নিরুপায় হইয়া বড়পীরের পায়ে পড়ে নিবেদন করিল, হজুব । আব ৩ তিষ্ঠিতে পারিলা ; প্রত্যহ সহরের

মধ্যে শত সহস্র লোক কলেরার করালগ্রাসে মৃত্যুগুথে পতিত হইয়া পরলোকে গমন করিতেছে । তখন তিন তাহাদের সেই কাতর বচনে সদয় হইয়া বলিলেন, আমার মাদ্রাসার সম্মুখ হইতে তৃণগুলি লইয়া জলের সহিত পিসিয়া পান করিলেই করাল বদন কলেরা রোগের হস্তে রক্ষা পাইবে, আর একটি প্রাণি মাত্রও মরিবে না । হজরত মহবুবে সোবহানি (রঃ) মুখে শ্রবণ করিয়া মাদ্রাসার নিকটবর্ত্তি স্থান হইতে দুর্কীঘাস লইয়া সকল লোকই রোগীদিগকে সেবন করাইয়া ছুরন্তু কলেরার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে লাগিল, এমন কি সেখানকার ঘাস ফুরাইয়া গেলে তৃণ মূল পর্য্যন্ত তুলিয়া লইয়া গেল । সেই সহরের লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী লোক অকালে কালের কবল হইতে রক্ষা পাইয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ ও বড়পীরের প্রশংসা করিতে লাগিল । হজরত বড়পীর সাংহেব যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত বোংদাদ নগরে ছুরন্তু কলেরা প্রবেশ করিতে পারে নাই । বড়পীরের নামের শুনে শমন পর্য্যন্ত পলাইতে পথ পায় না ।

একটি স্ত্রীলোকের বড়পীরের আশীর্বাদে
সাতটি সন্তান হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত
হইয়া পুনর্জীবন প্রাপ্ত হয়
তাহার বিবরণ ।

মেরাতল জামির নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, আব্দুল্লাহ মহান্মদ বেন কায়েদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদিন হজবৎ বড়পীর গাহেব, সাধারণজনকে ওয়াজ বা উপদেশ দান করিয়া, নিশ্চিন্ত মনে নিজের কক্ষমধ্যে পরম পিতা জগদীশ্বরের অর্চনা করিতে ছিলেন । পরে তিনি অর্চনা উপাসনা সমাপ্ত করিয়া দেখিলেন যে, দ্বারদেশে একটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে । তাহাকে দেখিয়া হজবৎ বড়পীর গাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়াংগা বাছা ! তুমি কি মনে করিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছ ? রমণীটি অমনি সালাম করিয়া বলিল, হজুর ! জোনাব পীর দস্তগীর । এ অধম অনাথিনীর একটি প্রার্থনা আছে, আমি ঈশ্বর কৃপায়, আপনার দোওয়ায় কোন বিষয়েই চিন্তা করি নাই, কেবল পুত্র ধনবিনে মনকন্ঠে রাত্রদিন যাপন করিতেছি । আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া অধম বাঁদীর জন্ম গোদাতাযালার নিকটে প্রার্থনা করিয়া, একটি

সন্তান বাঁচাইয়া দেন, তাহা হইলে আমি পুত্র মুখ দেখিয়া
 বড়ই সুখি হই । তখন তিনি বলিলেন, হে মন্দ ভাগ্য-
 বতী ! আমি তোমার লক্ষণ দেখিয়া মুঝিতে পারিয়াছি ।
 তোমার অদৃষ্টে পুত্র নাই, তবে, মিছে কেন পুত্রের
 আশা করিতেছ । যাও, তোমার মনস্কামনা কিছুতেই
 পূর্ণ হইবার নয় । ইহা শুনিয়া স্ত্রীলোকটি মাথায় হাত
 দিয়া বসিয়া পড়িল, দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কঁাদ কঁাদ মুখে
 কহিল, ছজুর ! সত্য, আমি মন্দ ভাগ্যবতী নারী,
 তবে এখন আমি ভাগ্যবান মহাপুরুষের আশ্রয়ে আসিয়া
 স্থান লইয়াছি । পথিক পথ চলিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেই
 স্থস্থ হইবার জন্য বটরূক্ষের আশ্রয় লইয়া থাকে, বটরূক্ষও
 পথিককে ছায়া দিয়া ও নিজের পল্লব হিল্লোলে বায়ুদান
 করিয়া, আশ্রিত পথিককে স্থস্থ বা সুখি করিয়া থাকে ।
 তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি যখন পিপাসায় কাতর হইয়া, জল জল
 করিয়া সরোবরে উপস্থিত হয়, সেই সরোবর তাহাকে
 স্থনীতল বারি দান করিয়া তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির তৃষ্ণা নিবারণ
 করে । অনাহারী ক্ষুধার্ত্ত দরিদ্র ব্যক্তি যখন, অন্নের জন্য
 লালায়িত হইয়া গৃহস্থের দ্বারে দণ্ডায়মান হয়, তখন
 গৃহকর্ত্তা তাহাকে কিঞ্চিৎ দান না করিয়া বিদায় করে
 না । তবে আমি অনাধিনী ভিখারিণী পুত্রধন-কাঙ্গালিনী
 যে আপনার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি, তাহা আপনি দাতা

হইয়া, দান না করিয়া, কিরূপ প্রকারে ভিখারিণীকে ভিক্ষা না দিয়া বৈমুখ করিয়া ফিরাইয়া দিবেন। শুনিয়াছি, আপনি দাতার শ্রেষ্ঠ, দাতব্যের অগ্রদানি; আপনার কাছে কেহ কখন কোন বিষয়ে নিরাশা হইয়া ফিরিয়া যায় নাই। যে যাহা জাচিঙ্গা করে আপনি তখনই তাহাকে তাহা দান করিয়া মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। এমন কি চোর পর্যন্ত আপনার গৃহে ছুরি করিতে আসিয়া নিরাশা বা হতাশ অন্তরে ফিরিয়া যায় না। তবে আমি কেন নিরাশা হইয়া ফিরিয়া যাইব। রমণীর বিনয় বচনে, হজরত পীর দস্তগীর আর থাকিতে পারিলেন না; সেই স্ত্রীলোকটির জন্য হস্ত উঠাইয়া খোদাতায়ালার নিকটে প্রার্থনা করিলেন, হে দাতা দয়ালু দয়াময় বিশ্ব পালক সৃষ্টিকর্তা! এই অনাথিনী পুত্র-কাম্বালিনীকে দয়া করিয়া পুত্ররত্ন দান করিয়া স্মৃতি করুন। তখনি আরাণ-বাড়ি হইতে দৈববাণী হইল যে,

কাদ জাফ্ফালু কালাম বেমা ছয়া ফি এলমেলাহে।

অর্থাৎ এ স্ত্রীলোকটির অদৃষ্টে একরূপ লিখিত হইয়াছে যে, ভাগ্যদোষে নিঃসন্তান হইয়া থাকিবে। পুনরায় তিনি প্রার্থনা করিলেন, হে কৃপাময় কৃপা করিয়া নিঃসন্তানকে সন্তান দান করুন। তখনও একরূপ আদেশ হইল। ষষ্ঠ বারের পবে হজরত পীর দস্তগীর উত্তর

করিলেন, হে দয়াময় ! যঁহার লিপি তিনি কি খণ্ডন করিতে পারেন না, অবশ্যই পারেন ; আপনি আমার বিনিময়ে ঐ স্ত্রীলোকটীকে পুত্রদান করিয়া স্থিতি করেন । এবার দয়াময়ের নিকট হইতে দৈববাণী হইল যে হে বন্ধুবব ! তোমার সম্মান রক্ষার জন্ত ঐ স্ত্রীলোকটীকে সাতটা পুত্র দান করিয়া স্থিতি করিলাম । আর প্রার্থনা কবিবেন না সপ্তমবার প্রার্থনা করিয়া ছিলেন বলিয়া, তজ্জন্ত সাতটা পুত্র দান করিলাম ; নতুবা উহাকে নিঃসন্তান হইয়া থাকিতে হইত । হজরত বড়পীর সাহেব শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, আপনার চরণতলেব কিঞ্চিৎ ধূলা লইয়া, মনে মনে একটা মন্ত্র পাঠ করিয়া, সেই ধূলাগুলি স্ত্রীলোকটির হস্তে দিয়া বলিলেন, যাও ! তুমি সাতটা পুত্র সন্তান প্রসব করিবে । কিন্তু সাবধান । ধূলাগুলি অতি যত্নের সহিত রৌপ্য নির্মিত কবচ করিয়া দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া রাখিবে । হজরতের চরণধূলা অতি যত্নের সহিত গ্রহণ করিয়া স্ত্রীলোকটী গৃহে ফিঙ্গিল, কিছু দিন পরে ঈশ্বর কৃপায় একে একে সাতটা পুত্র প্রসব করিয়া ছেলের মা হইল । তখন তাহার আর আনন্দের সীমা রহিল না, মহাস্বখে কালযাপন করিতে লাগিল । একদিন মন্দভাগিনী স্ত্রীলোকটী কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল, বড় পীরের পায়ের ধূলার

ওগেই কি আমার সাতটি পুত্র হইল, না, না, তাঁহার
পায়ের ধুলার এমন কি গুণ আছে যে, উহার দ্বারায়
আমি সাতটি সন্তান প্রসব করিলাম । যাই হোক আর
কেন পায়ের ধূলা অঙ্গে ধাবণ করিয়া রাখিব । এই
বলিয়া অবিশ্বাসী কুলক্ষণা নারী কবচ হইতে ধূলাগুলি
ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল ।

হায়, অবিশ্বাসী রমণীর আবার বিশ্বাস কি । মন্দ-
ভাগিনীর সৌভাগ্য কত দিনের জন্য, দুশ্চিন্তাই সকল
অনর্থের মূল । কুভদ্রা রমণী যেমনি কবচ হইতে ধূলা-
গুলি নিক্ষেপ করিল, অমনি সাতটি ছেলে দেখিতে
দেখিতে দম্ভুটে মরিয়া গেল । হতভাগিনী মাতা
অকস্মাৎ ধুলার কারণে ছেলের মরণে হতজ্ঞান হইয়া
পড়িল । ভাগ্য নিরক্ষিয়া শিরে করাঘাত করিয়া কাঁদিতে
লাগিল । হায় কি হইল সাতটি ছেলে কোথায় গেল
বলিয়া, আছাড় কাছাড় খাইয়া অবশেষে বড় পীরের চরণ
তলে গিয়া মূর্ছিতা হইয়া পড়িল । কতক্ষণ পরে তাহার
মূর্ছা ভঙ্গ হইলে, হজরত তাহাকে বলিলেন, রে অবি-
শ্বাসী কুলক্ষণা রমণী । তোমাব নিজের দোষেই তোমাব
ছেলেগুলির মৃত্যু সজ্জাটন হইয়াছে ; এখন আর পায়ে
পড়িলে কি হইবে । যখন আমি তোমাকে চরণ ধূলি
দিয়াছিলাম । তখন আমি মনে মনে বলিয়াছিলাম যে,

আমার চরণ ধূলা ত্যাগ করিলে হে মহাপ্রাণী সাতটা
তোমরাও স্ব স্ব দেহ ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ ছাড়িয়া
যাইবে । কেননা ঐ ধূলায় সঞ্চে তোমার ছেলের দেহ
সংলগ্ন ছিল, তৎক্ষণ্যই তোমার ধূলা ত্যাগ করাতে, ছেলে
কয়টা জীবন ত্যাগ করিয়াছে । যাক, আর কেঁদনা, যা
ছইবার তাহা হইয়াছে, যাহা ঘটিবাব তাহা ঘটিয়াছে ।
পুনরায় তুমি আমার পদধূলি লইয়া যাও, এখনই সাতটা
ছেলে পুনর্জীবন লাভ করবে । স্রীলোকটি গৃহে আসিয়া
দেখিল যে, সাতটা ছেলেই জীবন লাভ করিয়া খেলা
কবিতোছে । সেই দিন হইতে সেই রমণী বড়পীরের
কেরামতে দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়াছিল ।

এস পীর দস্তগীর কৃপা কর মোরে ।
দাও তব পদধূলি রাখি লয়ে শিরে ॥

হুজরত বড়পীর সাহেব একটা মোরগ
খাইয়া জীবিত করেন তাহার
বিসরণ ।

মেরাতল ফায়েজান নামক গ্রন্থে এগাম আফি ব্রহমা-
তুল্যা আলায়হে বড় পীরের আহাির ব্যবহারের সম্বন্ধে

নানা বিষয় লিখিয়াছেন যে, একটী বৃদ্ধা সদা সর্বদা পীরের কাছে আসা যাওয়া করিত এবং পীরের নিকটে আপনার একটী ছেলেকে বাখিবার জন্য ইচ্ছা করিল। একদিন ছেলেকে সঙ্গে লইয়া বড় পীবেব দরবারে উপস্থিত হইল। তৎপরে বৃদ্ধা কহিল, হুজুব! আমার এই পুত্রটিকে আপনার করে সমর্পণ করিলাম; আপনি তাহাকে গুণ ও প্রকাশ্য বিদ্যায় বিদ্যান করিয়া দিবেন। যাহাতে সে করুণাময় খোদাতায়ালাকে চিনিয়া, ইহকাল ও পবকালের উন্নতি লাভ করিতে পারে। যেন আপনার চরণ সেবা করিয়া সাধুত্ব লাভ করিয়া সকলেব নিকট পূজনীয় হয়। এই বলিয়া বৃদ্ধা বড় পীরের হস্তে পুত্রকে সমর্পণ করিয়া আপন গৃহে চলিয়া গেল। পীর সাহেবও বৃদ্ধার কথাযত তাঁহার পুত্রকে গুণতত্ত্ব বা যোগ সাধনা শিক্ষা দিতে লাগিলেন, প্রথম ইন্দ্రిয় দমন, ধৈর্য্য, সহ্যশক্তি, রাত্র জাগরণ, উপাসনায় মন নিবেসন, ক্ষুধায় ধৈর্য্যধারণ কবিতেন, কঠিন আহার করিয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎস্য্য বড়পুকে বশ করিব'ব জন্য তাহাকে শুষ্ক রুটী খণ্ড, বা কখন কখন চানা খাইতে দিতেন। একদিন বৃদ্ধা ছেলেকে দেখিবার জন্য পীর দরবারে আসিয়া প্রথম দেখিল যে, ছেলেটী জীর্ণশীর্ণ হইয়া অত্যন্ত দুর্বল হইয়া গিয়াছে, একটী কক্ষ মধ্যে বসিয়া চানা চিবাইতেছে।

বৃদ্ধা ছেলের এরূপ কঠিন অবস্থা দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইয়া পড়িল । আহা, মায়ের প্রাণ ; ছেলেব খাওয়া পড়ার কষ্ট দেখিলে কি সহ্য করিতে পারে । সহজেই হৃদয় ব্যথিত হইয়া, আকুল হইয়া পড়ে । বৃদ্ধা ছেলের অবস্থার কথা মনে করিয়া, বড় পীরের কক্ষে উপস্থিত হইয়া, দেখিলেন যে, তিনি মোরোগের মাংস দিয়া আহার করিতেছেন । তাহা দেখিয়া বুড়ির প্রাণে সহ্য হইল না, তখনই অধৈর্য্য হইয়া বলিয়া ফেলিল, হুজুর ! আপনি মোরোগেব মাংস দিয়া আহার করিতেছেন, আব আমার ছেলে শুক চানা চিবাইতেছে ? আহা, বাছার আমার না খাওয়ায় অস্তি চর্মা সাব হইয়াছে পীর সাহেব বৃদ্ধার কথা শুনিয়া, একটু হাস্য কবিয়া বলিলেন, হে বৃদ্ধা ! ছেলের অবস্থা দেখিয়া মনে কষ্ট করিতেছ ? যদি সুখ-ভোগ করিয়া তোমার ছেলে কু-প্রযুক্তির বশীভূত হইয়া পড়ে, তবে কেমন করিয়া গুণপথ প্রাপ্ত হইবে । সাধু হওয়া বড়ই কঠিন । ও পথ বড়ই ভয়ঙ্কর ! কষ্ট না করিলে কেহ কখন সাধু হইতে পারে না । দুঃখফেন সুকোমল শয্যায়া শয়ন করিয়া কেহ যদি সাধু হইতে পারিত তাহা হইলে, প্রভু হজরত মহান্মাদ (সঃ) সাম বা সুরিয়ার ও আববোব রাজাধিরাজ হইয়া, সুকোমল শয্যায়া শয়ন না কবিয়া, ধর্জ্জুর পাতাব শয্যায়া শয়ন করিতেন,

অনাহারে থাকিয়া ক্ষুধার লাভের জন্য উদরে খণ্ড প্রান্তর বান্ধিয়া রাখিতেন, তালি দেওয়া ছেঁড়া বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করিতেন । তাঁহাবই জামতা বা মহচর আমার পিতৃপুরুষ দাদা সাহেব সাধু শ্রেষ্ঠ গুণ্ড-তত্ত্বের প্রধান গুরু আলি করমুল্যা অজহু, কুফার রাজসিংহাসনে বসিয়া পাঁচ দেবহেমের বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করিতেন, বৃক্ষমূলে শয়ন করিতেন, নিজেব হস্তে উষ্ট্র বান্ধিতেন, সময়ে সময়ে ঘরে খাবার আহার না থাকিলে সন্ধ্যা ও ভোরে জলপান করিয়া খোদাতায়ালাব নাগে রোজা বা উপবাস থাকিতেন ।

বৃদ্ধা মহাপুরুষদের জীবনি শুনিয়া একটু ধতমত খাইয়া বলিলেন, হজরত পীর সাহেব ! আমি মেয়ে মানুষ, অত বুঝি কি ? না অত জানি । হজরত বলিলেন, বৃদ্ধা মা ! সাধু হওয়া মুখের কথা নয়, সাধনা করাও সামান্যে হয় না, শুনিয়া থাকিবে ; ঐ পদপ্রাপ্ত হইবার জন্য বলথের অধিপতি সম্রাট এব্রাহিম আদহাম রাজসিংহাসন—রাজ্যত্যাগ করিয়া অনাহারে কত কঠিন ভ্রত উদযাপন করিয়াছিলেন, এমনকি প্রাণেব পুন্ড্র ক্রোড়ে থাকিয়া জীবন ত্যাগ করিল, তথাপি তাহার দিকে ফিরেও তাকাইলেন না, তখনই মৃত শব দূরে রাখিয়া খোদাপ্রেমে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন । দেখুন তাঁহাদের সহ্য মহিবুগুণ । হাঁ, তবে বলিতে পার আপনি যে মোগল সাম্রাজ্য

দিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া আহার করিলেন । ইহাও বুঝিয়া বা দেখিয়া নাও । এই বলিয়া গুণময় পীর সাহেব সমুদয় মোরোগের হাড় একত্র করিয়া তাহাতে পবিত্র হস্ত রাখিয়া বলিলেন, “কোমী বেজনেলাহে ল্লাজি” অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার কুপায় জীবিত হও । আহা তাঁহার বাক্যের মহিমা-শক্তিগুণে তখনই মোরগটি জীবিত হইয়া গেল । তখন বড়পীর সাহেব বুড়িকে বলিলেন, হে বৃদ্ধা তোমার ছেলেটিও যখন এইরূপ সাধুত্ব লাভ করিয়া প্রভুত ক্ষমতামালী হইবে, তখন সে যাহা ইচ্ছা তাহাই খাইয়া ফুটপুট হইবে । বৃদ্ধা বড় পীরের কেরামত দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া তখনই গৃহে ফিরিয়া গেল ।

শেখ আলি নামক একজন আরবী বড়পীরের
পৃষ্ঠে পিঠ ঘর্ষণ করিয়া একটা পুত্র
লাভ করে তাহার বিবরণ ।

আখবারুল আওলিয়া নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ আলী বেন মহাম্মদ আরবী নামক একজন সম্পত্তি-শালী ধনবান লোক ছিলেন, তাঁহার অর্থে অনেক দিন দুঃখী প্রতিপালন হইত । তিনি দরিদ্র দিগকে দান না

করিয়া কখন কোন দ্রব্য খাইতেন না । তাঁহার ঐশ্বর্যেরও অভাব ছিল না, তিনি সেই দেশের মধ্যে ধনে, মানে, রূপে, গুণে, বীরত্বেও অশেষ ক্ষমতা শালী বীর পুরুষ ছিলেন । তাঁহার কোন বিষয়েরই অভাব ছিল না, কিন্তু নিঃসন্তান হইয়া, পুত্র বিহনে মনকষ্টে দিনযাপন করিতেন । তিনি এতদূর পুত্রের জন্য লালায়িত ছিলেন যে, যদি কাহার মুখে কোন সাধু বা তপস্বীর কথা শুনিতেন, তখনই তাঁহার চরণ সেবা করিয়া পুত্রের কামনা করিতেন । কিন্তু কেহই তাঁহাকে পুত্রলাভ করিবে বলিয়া এই শুভ সংবাদ দানে স্তুতি করিতে পারেন নাই । একদিন শুনিলেন যে, দেশের নিকটবর্তী স্থানে একজন মহা তপস্বী সাধু পুরুষ আসিয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়া শেখ আলী আর কালবিলম্ব না করিয়া, সেই সাধু পুরুষের চরণ দর্শন করিতে গেলেন । তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া, অতি বিনয় বচনে কহিলেন, হুজুর ! আমি নিঃসন্তান, যাহাতে আমি সন্তান লাভ করিয়া পুত্রের মুখ দেখিতে পাই ; আপনি তজ্জন্য খোদাতায়ালার কাছে আমাব জন্য একটু দোয়া করিবেন । সেই মহান হৃদয় সাধু পুরুষ শেখ আলির দিকে কটাক্ষ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, হে ভক্ত ! আমি তোমাব সমস্ত লক্ষণ দেখিয়াই বুঝিতে বা জানিতে পারিয়াছি । তোমার অদৃষ্টে পুত্র কি কন্যা কিছুই নাই

তজ্জন্য কোন সাধু পুরুষের দোয়াও তোমার কোন ফলদায় হয় না, আব হইবেও না তবে বৃথা কেন খোদাতায়া-
লার নিকটে তোমার জন্য প্রার্থনা করিব । তখন তিনি
নিরাশা হইয়া হতাশ মনে আপন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন ।
সেইদিন হইতে আর কোথাও গমনাগমন না করিয়া,
কেবল মাত্র খোদাতায়ালায় দয়ার উপর নির্ভর করিয়া
রহিলেন । গৃহে যতই ধন রত্ন ঐশ্বর্য্য থাকুক না কেন,
সে সকল বিষয় পুত্রধন বিনে বিযধর ভুজঙ্গের দংশন
বলিয়া বোধ হইতে থাকে । রত্ন খচিত হীরা মানিকের
উজ্জ্বল আভা, এক পুত্রের জ্যোতিঃ অভাবে সকল রত্নের
উজ্জ্বলতাই নষ্ট করে । শেখ আলী পুত্রের জ্যোতিঃ
হীন ঘরে আব তিষ্ঠিতে না পারিয়া, দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ
করিতে করিতে পবিত্র বোংদাদ সহরে আসিয়া, বড়
পীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করিল । পীর সাহেবও তাঁহাকে
অতি যত্ন করিয়া আপন দরবার মধ্যে রাখিয়া দিলেন ।
শেখ আলি পীরসাহেবের যত্ন, স্নেহ ও আদব পাইয়া
কিছুদিন রহিয়া গেল একদিন নির্জনে বসিয়া ছুইজনে
কথোপকথন হইতেছে এমন সময়, শেখ আলি পীরের
সরল মন দেখিয়া সাধুদিগের কথিত আপনার অদৃষ্টের
ফলাফল বর্ণনা করিয়া, পুত্র কামনা নিষ্ফল ভাবিয়া পীরের
চরণে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল । হজরত পীর দস্তগীর

তাহার ক্রন্দন দেখিয়া, দয়াজ্ঞ হৃদয়ে বলিলেন, আলী ! তুমি উঠ, আর তোমার ক্রন্দন আমার সহ্য হয় না, তোমাকে আর পুত্রের জন্ম আক্ষেপ করিতে হইবে না, অবশ্যই পুত্র মুখ দেখিয়া স্থিতি হইবে । তখন শেখ আলী কহিল, হজুর ! আমার নিতান্ত অভাগা কপাল ! অদৃষ্টে যখন পুত্র নাই, আর কাহারও দোয়ায় সফল নাই ; তখন কেমন করিয়া পুত্রের মুখ দেখিয়া স্থিতি হইব । তখন তিনি কহিলেন, আলী ! আমি তোমার করুণ ক্রন্দনে অধির হইয়া, পুত্রের বর দিয়াছি ; তখন তোমার অদৃষ্টে পুত্র না থাকিলেও দোয়া আমার ফলোদয় না হইলেও আমার নিজের ঔরসজাত একটি ছেলে জন্ম হইতে যে বাকী আছে আমি তাহা তোমাকে দান করিলাম ; ঐ ছেলে তোমার ঔরস হইতে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিবে । তখন তুমি ঐ বালকটির আমার নামের সঙ্গে মিলাইয়া উহার নাম শেখ মহিউদ্দিন রাখিবে । আমার আশীর্ব্বাদে এই বালকটি একজন মহা পরাক্রমশালী সাধু পুরুষ হইবে । হজরত বড়পীর এই বলিয়া, শেখ আলীর পৃষ্ঠে নিজের পৃষ্ঠদেশ ঘর্ষণ করিয়া দিলেন, দয়াময়ের কৃপায় পীরের আশ্চর্য্য কেরামতে তখনই সে কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়া গেল । আলী সন্তোষ হৃদয়ে গৃহে আসিয়া সেই রজনীতে স্ত্রীসহবাস করিতে,

তাহার পত্নী গর্ভবতী হইল, দশমাস পরে একটী পুত্রে সম্ভান প্রসব করিল । সাত দিবস পরে শেখ আলী আরবী শিশু পুত্রটী কোলে লইয়া হজরত পীরের কাছে আসিয়া ধরিল । তিনি বালককে কোলে লইয়া নানা প্রকারের শত শত আশীর্বাদ করিয়া শেখ আলীকে দিলেন । শেখ মহাম্মদ বোরহান পুরী বলিয়াছেন যে, ঐ বালকটী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সরিয়ত, তরিকত, হকিকত, গারফত সর্বপ্রকার বিদ্যায় বিদ্যান হইয়া, মহা সাধু পুরুষ হইয়াছিলেন । তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, প্রথম কোতব হজরত বড়পীর দ্বিতীয় কোতব শেখ মহিউদ্দিন আরবী ইনি আরব্য ভাষায় তস্লেফের নানাবিধ গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন ।

হজরত সাহাবদ্দিনের জীবন বৃত্তান্ত ।

বেদায়াতুল আহুওয়াল নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, এবনে তিয়াল হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদিন মহাম্মদ আব্দোল্যা সহরদ্দিন পত্নী হজরত বড় পীরের নিকটে আসিয়া, বিনয় বচনে নিবেদন করিলেন । হে পীর দস্তগীর মহবুবে সোবহানি ! আপনার আশীর্বাদের গুণে

আল্লাহুতায়ালা আমাকে বিষয় সম্পত্তি দিয়া জগত মধ্যে বড়ই সুখেব সঙ্গে রাখিয়াছেন। কোন বিষয়েরই চিন্তা কবি নাই, কিন্তু পুত্রধন বিহনে সকলই অসার। ~~কিন্তু~~ যদি আপনি দয়া করিয়া এ অভাগিনীর জন্ম খোদাতায়ালাকে কাছে দোয়া করেন, তাহা হইলে পুত্রের মুখ দেখিয়া সুখি হইতে পারি। নতুবা দুঃখ-সাগরে পড়িয়া চির-জীবনেব মত কষ্ট পাইতে হয়। এখন আপনার কৃপা ব্যতীত, আমার এ দুর্দশা মোচন হইবাব আর অন্য কোন উপায় নাই, হজরৎ বড়পীর সাংহেব স্ত্রীলোকটির বিনয় বচনে সন্তুষ্ট হইয়া, দয়াময় বিশ্বপালক ধরণীর অধীশ্বর খোদাতায়ালাকে নিকট হস্ত তুলিয়া বলিলেন ; হে দাতা দয়ালু দয়াময় ! আপনি সকলই অবগত আছেন, ত্রিজগতের মধ্যে আপনার অবিদিত কোন বস্তু নাই এবং আপনার ভাগ্যে সব বিসয়েই পরিপূর্ণ। আজ একটা অবলা সরলা নারী আপনার দয়ার প্রার্থী, তাঁহাকে দয়াকরিয়া একটা পুত্রদান করিয়া তাহার মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া দিউন। তখনই দৈববাণী হইল, হে প্রিয়বন্ধু আব্দোল কাদের ! উহার আশাপূর্ণ হওয়া দুস্কর ; যাহার ভাগ্যে সন্তান নাই, সে কেমন করিয়া পুত্র সন্তান লাভ করিবে। হজরত পীবদস্তগীর দর্গাবাবী হইতে এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, পুনবায় বলিলেন, হে করুণাময় বিশ্বজগতের

অধীশ্বব ! দাসীর সঙ্গে প্রতারণা করিতেছেন কেন ? আপনার ভাগ্যে অভাব কি ? এই রমণীকে বৃথা কেন আপনার দয়াবারি হইতে বঞ্চিত করিবেন । এবারেও সেইরূপ আদেশ হইল ; ইহা শুনিয়া হজরত বড়পীর সাহেব বিষন্ন বদনে ছিন্ন ভিন্ন বেশে মস্তকের উফণীব খুলিয়া বলিলেন, হে দয়াময় ! তাজ আপনার দয়াময় নামের পরিচয় ভাল কবিয়া বুঝিয়া লইব, আপনি যদি জীবের প্রতি দয়া না করিবেন, তবে কেন দয়াময় নাম ধারণ করিয়াছেন ? দেখি এই ভিখারিণীর প্রতি দয়া করেন কি না কবেন ? আমিও প্রতিজ্ঞা করিলাম, যতক্ষণ না সুসংবাদ দান করেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি জল আহার কিছুই পান করিব না । যথার্থ আমি যদি হজরত মহান্মদ (সঃ) কে আরশে যাইবার কালে তাঁহার চরণ স্পর্শে ধারণ করিয়া থাকি, যথার্থ যদি তোমার প্রেরিত সিংহ হজরত আলি কবগুল্যা অজহুর বংশে বা সৈয়দ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি ; তাহা হইলে ঐ স্ত্রীলোকের প্রতি তোমার দয়াবারি নিশ্চয় বর্ষণ করাইয়া লইব । তাঁহা এ ভীষণ প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া আকাশ, ভূমণ্ডল, স্বর্গীয় দূত পর্য্যন্ত থরথর করিতে লাগিলেন । হজরত মহান্মদ মস্তফা (সঃ) আর থাকিতে পারিলেন না, স্বয়ং জ্যোতির্ময় মূর্তিতে বড় পীরের সম্মুখে আসিয়া কহিলেন, হে হৃদয় আরাধ্য

দেবতা ! শান্ত হও, শান্ত হও, খাম, খাম, ধ্যান ভঙ্গ কর, মস্তকে উষ্ণ ধারণ কর ; তোমারি প্রার্থনা পূর্ণ হইল । এই ভাগ্যবতী রমণী গর্ভবতী হইবে, তুমি উহাকে সুসংবাদ জ্ঞাত করিয়া দাও, এই বলিয়া মহাপুরুষ নুরনবী তখনই অন্তরধ্যান হইলেন । হজরত বড়পীর সাহেব পাগুড়ী তুলিয়া মস্তকে বান্ধিলেন, পরে সেই রমণীকে শুভ সংবাদ জ্ঞাত করাইলেন । রমণী শুভ সংবাদ জ্ঞাত হইয়া, আনন্দিত মনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন । সেই রজনীতেই পতি সন্মিলনে গর্ভ ধারণ করিয়া খোদাতায়ালাকে (শোকর) শত সহস্র ধন্যবাদ দিতে লাগিল । বিধির কৃপায় কিছুদিন পবে একটা কন্যা প্রসব করিল । রমণী কন্যা প্রসব করিয়া আনন্দিত হইল বটে, কিন্তু ততধিক সুখি হইল না । আশায় ছিল পুত্র প্রসব করিয়া বেটার মা হইব । তাহাত ঘটিল না কাজেই একটু মনমরা হইয়া থাকিতে হইল । দুই তিন বৎসর অতীত হইবার পরে একদিন কন্যাটিকে সঙ্গে লইয়া গীর দরবারে উপস্থিত হইয়া কহিল, হুজুর ! এ অভাগিনী বড়ই আশা করিয়াছিল যে, পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া সুখি হইবে । কিন্তু ভাগ্যদোষে এই মেয়ে ছেলেটী প্রসব করিয়াছি । কি করিব মনের দুঃখ মনেই রহিল ; হুজুরের কাছেও আমি পুত্রের কামনা করিয়াছিলাম, তাহাত সফল হইল না,

তৎক্ষণ্য আমি মেয়েছেলেটিকে সঙ্গে লয়ে হুজুরের নিকটে আসিয়াছি । এই মেয়েছেলেটি আমার, হুজুরের সম্মুখে আদবের সহিত স্থিরভাবে দাঁড়াইয়াছে । হজরত বড়পীর স্ত্রীলোকের কথায় মস্তুষ্ট হইয়া মেয়েছেলের পা হইতে নাভী পর্য্যন্ত চাহিয়া দেখিলেন । ঠাঁহার সেই 'চাহনি গুণেই মেয়েছেলেটির পা হইতে নাভী পর্য্যন্ত পুরুষ অঙ্গ হইল এবং ছাতি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত স্ত্রী অঙ্গের আকৃতি রহিয়া গেল । পরে স্ত্রীলোকটিকে লক্ষ করিয়া বলিলেন, এবার ত তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে । স্ত্রীলোকটি কহিল, হাঁ, আপনার চাহনি গুণেই আমার কন্যাটি পুরুষ অঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছে, আমি শত শত ধন্যবাদ করি সেই অনাদি অনন্তময় বিশ্বশ্রষ্টার কোশলকে, যাঁহার কোশলে স্ত্রীঅঙ্গ পুরুষ অঙ্গে পরিণত হয় । হজরত বড়পীর ঠাঁহার কৃতজ্ঞতা দেখিয়া কহিলেন, হে গুণবতী রমণী ! তোমার পুণ্যহুণেই স্ত্রীঅঙ্গ পুরুষ অঙ্গে পরিণত হইয়াছে, এখন আশীর্বাদ করি এই ষালক কালে সাধু পুরুষ হইয়া জগতের লোককে সৎপথে চালাইয়া পুণ্যবান করিবে এবং ইহার সেখল শেখ সাহাবুদ্দিন ■ নাম রাখিলাম, যেন দীর্ঘ জীবন লাভ করে অবশেষে স্ত্রীলোকটি পীর সাহেবকে সালাগ করিয়া ছেলেটিকে

■ সাহাবুদ্দিন, একদিনালা ছুগ্ন লইয়া লক্ষ লক্ষ লোককে পান করাইয়া ছিলেন ।

সঙ্গে লইয়া আপনার বাড়ি ফিরে আইল। মেয়েছেলে লইয়া গিয়া বেটাছেলে সঙ্গে আনিল, তাহা দেখিয়া তাহার স্বামী মহাম্মদ আব্দোল্যা সহরদ্দি অতি আশ্চর্য হইয়া পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিল, এই মেয়েছেলেটা বেটাছেলে হইল কি প্রকার। তখন তাঁহাব গুণবতী রমণী স্বামীকে বড় পীরের আশ্চর্য বা অলৌকিক ঘটনা সমুদয় শুনইয়া দিলেন।

কথিত আছে হজরত শেখ সাহাবদ্দিন সহরদ্দি রহমাতুল্যার বয়সকালে শুন দুইটা বৃহৎ লম্বা হইয়া ঝুলিয়া পড়িল তজ্জন্য তিনি দুই দিকের দুইটা স্কে শুন ঝুলাইয়া দিতেন এবং মস্তকের লম্বা কেশে তাহা ঢাকিয়া রাখিত। কালে ইনি এমন বিদ্যান হইয়াছিলেন যে, মুখে মুখে আরবী ও পারসী ভাষায় বহুতা রচনা করিতেন। অনেক গুলি গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন এবং তাঁহার গুণ-তত্ত্ব বা সাধুতা দেখিয়া শত শত বিদ্যান মণ্ডলী পণ্ডিতগণ আসিয়া তাঁহার কাছে অনুসরণ ভ্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এখানে তাঁহার কয়েক জন বিদ্যান তপস্বী শিষ্যের নাম প্রচার করিলাম। শেখ বাহাউদ্দিন, জাকরিয়া মুলতানি, কাজি হামিদদ্দিন, নাগুরি, মমলেহদ্দিন, শেখ সাদি সেরাজি যিনি পাবশ্র ভাষায় গোলেশ্বান নামক গ্রন্থ প্রণীত করিয়াছেন, ইনিও সাহাবদ্দিন রহমাতুল্যার শিষ্য ছিলেন।

এই সাধু পুরুষের বংশ মহামহা তাপসিক ঋষিগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই মহাপুরুষের জীবন বৃত্তান্ত পাঠক ইচ্ছা করিলে অন্যসময়ে শুনাইতে পারি ।

বড়পীরের কুপায় বিংশতি জন স্ত্রীলোক পুরুষ ভঙ্গ প্রাপ্ত হয় তাহার বিবরণ ।

রেনসালত আওলিয়া নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বোংগদাদ নগরে একটা লোকের স্ত্রী ক্রমে ক্রমে কুড়িটা কন্যা প্রসব করিল । পত্নীকে কেবল মেয়েছেলে প্রসব করিতে দেখিয়া তাহার স্বামী অত্যন্ত অসন্তোষ হইয়া কোন ছেলেরি বিবাহ দিলেন না, সকল মেয়ে গুলি ঘরে রাখিয়া গেল এবং পত্নীর কেবল মেয়েছেলে হওয়াতে বিরক্ত হইয়া, মনে মনে ধারণা করিলেন যে, এমন মেয়ে প্রসব করা স্ত্রী রাখিলে আমার হাড়েও লক্ষ্মী জুটিবে না আব বেটারও মুখ দেখিতে পাইবন, বৃদ্ধ হইলে উপার্জন বিহনে দুর্দশার একশেষ হইবে, বরং উহাকে (তালুক) ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে, হয়ত তাহার গর্ভে পুত্রও হইতে পারে । তাঁহাব এইরূপ ইচ্ছা করাতে, চতুরা রমণী পতিব মনগত ভাব বুঝিতে পারিয়া, বড়ই

দুঃখিত হইল যে, হায় ! বৃদ্ধ বয়সে স্বামী আমাকে
 ত্যাগ করিবেন, লোকেইবা বলিবে কি ? স্বামীওত
 নিতান্ত নির্বোধের প্রায়, বরাত ভাবিল না, আমার প্রতি
 কৃষ্ণ । এখন করি কি ; এইরূপ নামা প্রকার চিন্তা
 করিয়া অবশেষে বড়পীরের নিকটে যাইয়া মনদুঃখ প্রকাশ
 করিয়া বলিল, হুজুর দাসীর মনের কষ্ট একটু মন দিয়া
 শ্রবণ করুন । বড়পীর কহিলেন, কি বাছা ! তোমার
 হইয়াছে কি ? মনের কষ্টই বা কি জন্ম ; আচ্ছা বল
 উপায় থাকে উপকারের চেষ্টা পাইব । তখন স্ত্রীলোকটি
 কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে আরম্ভ করিল, গুণময় হুজুর
 পীরসাহেব ! আমার গর্ভে কুড়িটা মেয়েছেলে হওয়াতে
 আমার স্বামী, আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া, আমাকে
 বিনাদোষে (তালুক) দিবার জন্ম ইচ্ছা করিয়াছেন ।
 ভাবিয়া দেখুন তাহা হইলে আমার এই বৃদ্ধ বয়সে
 উপায় কি হইবে । অতএব আপনি যদি দাসীর প্রতি
 মদয় হইয়া, খোদাতায়ালা নিকটে দোঁড়া করেন, বাহাতে
 আমার একটা পুত্র সন্তান হয় । তাহা হইলে আমার
 স্বামী আমাকে ত্যাগ না করিয়া সরল মনে আমাকে লয়ে
 সহবাস করেন এবং জায়েম নির্মূর স্বামীর কোপ দৃষ্টি
 হইতে রক্ষা পাই । তাঁহার কামাকাটা দেখিয়া গুণময়
 পীর দস্তগীর বলিলেন, বাও, আর চিন্তা করিতে হইবেনা,

নিশ্চিত্ত মনে ঘরে ফিরিয়া যাও, তোমার পুত্র হইবে, তোমার স্বামীও তোমাকে আর কখনও ত্যাগ করিবে না। স্ত্রীলোকেরা স্বাভাবিক অজ্ঞ, সহজেই সকল কথায় প্রত্যয় করে না এ জন্ম বড়গীরের কথা শুনিয়া মনের মধ্যে দ্বিধা করিতে লাগিল, মনে মনে ও এ কথা বলিতে লাগিল, হায়রে কপাল ! পীর সাহেবত খোদাতায়ালায় নিকট আমার জন্ম কিছুই দোঁড়া করিলেন না, একটা কবজ লিখিয়াও দিলেন না, তবে কেমন করিয়া বলিলেন তোমার পুত্র হইবে, বোধ হয় এ কেবল মন বাখা কথা বলিয়া বিদায় করিতেছেন। আদর্শ হজরত বড়গীর সাহেব স্ত্রীলোকটির মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, হে পুত্র কাঞ্চালিনী ! বৃথা চিন্তা করিতেছ কেন ? এখনই গৃহে গিয়া দেখিতে পাইবে যে, তোমার বিংশতিটি কন্যা পুত্ররূপে পরিণত হইয়াছে। ইহা শুনিয়া আর কাল-বিলম্ব না করিয়া তখনই বাড়ীর দিকে ছুটিয়া চলিল। বিধির কি অপূর্ব মহিমা, স্ত্রীলোকটি বাটীতে আশিয়া দেখিল যে, সত্য সত্যই সমস্ত কন্যা পুত্ররূপে পরিবর্তিত হইয়া কত কি চিন্তা করিতেছে। তখন সেই ব্রহ্মণীটি পতি ও পুত্রদিগকে বড়গীরের কেরামতের বিষয় একে একে অবগত করাইলেন, অবশেষে পতি পত্নী পুত্রসহ দয়াময় বিশ্বপালক খোদাতায়ালায় ধন্যবাদ করিয়া, আনন্দ মনে

উভয়ে মিলে বড়পীরের গুণকীর্তনে নিযুক্ত হইল, নিম্নে
তাঁহা অনুবাদ কবিরাম

তুমি পীর দস্তগীর দয়ার আঁধার ।

নিরুপায় রক্ষা পায় নামেতে তোমাব ॥

ছিলাম দুঃখী হলাম সুখী তব গুণে ।

কর ত্রাণ দিয়ে স্থান ও রাসা চরণে ।

বড়পীর সাহেব একটী লোককে সাধুত্ব
দান করেন তাহার বিবরণ ।

খোলাছাতল মোফাখারিন গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ
আবুল হোসেন বেন আহাম্মদ রহমাতুল্যা আলায়ছে
হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, যে সময় হজরত শেখ আব্দু
দৌর রহমান বোগদাদী (রঃ) শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছি-
লেন, তাঁহার সেই মুমূর্ষুকালে পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন,
হে প্রিয় পুত্র ! আমার অন্তিম কালের পরে, তুমি
হজরত বড়পীরের স্মরণাগত হইও এবং তাঁহার নিকটে
শিক্ষা পাইতে চেষ্টা করিবে । কেননা তাঁহাব শিক্ষাগুণে
তুমি সাধুত্ব লাভ করিয়া পরকালে সদগতি লাভ করিতে
পারিবে । অতএব আব্দৌর রহমানের পদলোক গমনের

পরে, তাঁহার পুত্র পিতৃ আজ্ঞা পালন করিতে হজরত মহবুবে সোবহান্নির আশ্রমে আসিয়া আশ্রয় লইল । তিনিও তাঁহাকে আদর করিয়া সাহানা পরিচ্ছদ পরাইয়া, রত্ন খচিত মনোহর কক্ষে স্থান দিয়া জতি যত্নে রাখিলেন । একদিন পরলোক গত আব্দোর রহমানের পুত্র সেই সাহানা পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া মাদরাসায় পড়া দিয়া বসিয়া ছিলেন, এমন সময় একজন মজ্জুব সাধু পুরুষ আসিয়া তাঁহার সাহানা পরিচ্ছদে হস্ত দিয়া বলিলেন, বাপুহে ! তোমার এই পরিচ্ছদটা বাদসা, উজির ও ধনবান আগির লোকের যোগ্য, ইহা তোমাব অঙ্গে শোভা পায় না, তোমার এই পরিচ্ছদে জগতের লোক ভুলিবে বটে, কিন্তু জগত পতি খোদাতায়ালা ভুলিবেন না । আর একটা কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি, তোমার পিতৃদেব মৃত্যু সময় বড়গীরের স্মরণাগত কেন হইতে বলিয়া গিয়াছিলেন ; সাধুফলাভ করিয়া খোদা প্রাপ্তি হইবে বলিয়া নয় ! এখন তোমার খোদা প্রাপ্তির সংকল্পই বা কোথা, আর সাধুর পরিচ্ছদই বা কোথা ? এই কি সাধুর বেশ ভূষা না তপস্বীগণের রীতি নীতি ? হে মূঢ়নর ! দিন কয়েক মধ্যেই মহা মায়ার প্রলোভনে পড়িয়া সকল ভুলিয়া গেলে ; ধিক, শতধিক ! এমন ছার মানব জীবনে ধিক । এই বলিয়া মজ্জুব ফকির

লোক লোচনের অগোচর হইয়া গেল । ফকিরের তীব্র উপদেশে যুবক সাহানা পপিচ্ছদ অঙ্গ হইতে খুলিয়া দূরে মিক্ষেপ করিয়া ইল্লাল্লা বলিয়া একটা শব্দ করিয়া বন জঙ্গল দিকে ছুটিয়া গেল । যুবকের এরূপ হঠাৎ ভাব দেখিয়া অনেক লোকেই ভাবা চিন্তা করিতে লাগিল এবং কেহ কেহ তাঁহার অবেষণে বাহির হইল, মাঠ, ময়দান, বন, জঙ্গল, নিবিড় অরণ্য তন্ন তন্ন করিয়া খুজিয়া দেখিল, কোথাও তাঁহার দেখা পাইল না । অবশেষে হতাশ অন্তরে ফিরিয়া আসিয়া বড়গীরের নিকটে সমুদয় বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল । তিনি অগ্রে হইতেই (কস্ফে) ধ্যান-যোগে জানিতে পারিয়া ছিলেন ; পরে গ্রামবাসী লোকদের মুখে শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, সেই যুবকটি খোদাপ্রোমে মত্ত হইয়া নিবিড় অরণ্যে বাস করিতেছে অষ্টাবিংশতি দিবস মধ্যেই তিনি ফিরিয়া আসিবেন । তোমরা ঐ দিবসে নিবিড় বনের অদূরে আইয়াদান নদীর তীরে দাঁড়াইলেই দেখিতে পাইবে । কেনন। তিনি প্রত্যহ সেইখানে অবগাহন ও অঞ্জু করিতে আসিয়া থাকেন, যখন তোমাদের সহিত তাঁহার দেখা হইবে তখন তিনি আর কোথাও না পলায়ন করিয়া, অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিবেন । গ্রামবাসীগণ সেইদিন হইতে দিন গণনা করিয়া আসিতে

লাগিল, দেখিতে দেখিতে শাতাস দিবস গত হইয়া গেল, বড়গীরের আদেশ মত তাহারা ঐ দিনের দিন নিবিড় বনে গিয়া দেখিল যে, সেই যুবকটী জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় চর্ম্ম-পরিচ্ছদে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া, ইল্লালা ধ্বনিতে বন জঙ্গল কাঁপাইয়া তুলিতেছেন। তাঁহার সেই পবিত্র ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে, বিহঙ্গম ও পশুগণে চীৎকার করিতেছে। সে সময় কি মনোহর দৃশ্য বিভূ প্রেমে মত্ত হইয়া হিংস্রক জন্তুগণ হিংসা ত্যাগ করিয়া বন্ধুত্ব ভাবে একত্রিত হইয়া সেই যুবক যোগীবরের চতুর্পার্শে আনন্দে নৃত্য করিতেছে; তিনিও ইল্লালা শব্দে বনভূমি কাঁপাইতে কাঁপাইতে নদীর দিকে চলিয়া যাইতেছেন। এমনি এক্ষে এলাহীতে উন্মত্ত হইয়াছিলেন যে, ইল্লালা বলিতে বলিতে প্রসাস্ত্রুগীর ঞ্চায় এককালে নদী পার হইয়া আশুস্তক দিগের নিকটবর্তী হইয়া পড়িল (*)। যখন

(*) ঈশরোত্তম বাহ্যিক নদীতো সহজেই পাব হইতেই পারে। যে ব্যক্তি স্বদয় রাম্যোর এই কমটী নদী পার হইবার উপায় করিয়া মাখে তাহার আবাব অসংখ্য কি? যথা;—আশক্তি নদী, বিঘাদ নদী, গোস্ত নদী, ওদাসিন নদী, বিচ্ছেদ নদী, বিপদ নদী ইত্যাদি সমুদয় নদীগুলি পাবাপার হইতে তরী ঘাটে রাখিয়াছেন, তাঁহার সকল নদী হইতে উত্তীর্ণ হওয়া অতি সহজ। ইহাই প্রকৃত মারফতের পার ঘাট, যথা;—যিনি নির্ভরের নৌকায় আরোহণ করেন তিনি আশক্তি নদী পার হইয়া বিঘম

আগন্তকের গ্রামবাসীদের উপর দৃষ্টি পড়িল অহানি ইল্লাল্লা শব্দ কোথায় লীন হইয়া গেল ; পরক্ষণেই বলিলেন, তোমরা আমাকে লইয়া যাইবার জন্য আগমন করিয়াছ ? বুঝিয়াছি আমার আশ্রয়দাতা বড়পীর সাহেব তোমা-দিগকে পাঠাইয়াছেন, চল এখনই তোমাদের সঙ্গে পীর-দব্বারে যাইতে প্রস্তুত আছি । তখনই গ্রামবাসীদের সমভিব্যাহারে আসিয়া, হজরত বড়পীরের চরণে বারবার চুম্বন করিতে লাগিলেন । হজরত বড়পীর সাহেব তখন তাঁহাকে স্খুর উপযুক্ত মনে করিয়া চর্ম পরিচ্ছদ উন্মোচন করতঃ পীর পরিচ্ছদ আপন হস্তে পরাইয়া দিলেন এবং গুপ্ত-তত্ত্ব অবগত করাইয়া তাঁহাকে গৃহে পাঠাইয়া দিলেন ।

মুক্তির তীরে উত্তীর্ণ হন । দ্বিতীয় যে ব্যক্তি সন্তোষ তরণীতে আরোহণ করেন, তিনি বিখাদ নদী পার হইয়া শান্তি তটে সমাগত হইয়া থাকেন । তৃতীয় যে জন নৈর্যাপোতে আকৃষ্ট হন তিনি লোভ সাগর পার হইয়া নৈরাগ্য কূলে উপস্থিত হন । চতুর্থ যিনি নৈবাগ্য তরীতে আরোহণ করেন, তিনি ঐদাসিচ্ছ সরিৎ পাব হইয়া তরঙ্গানের তটে সমুত্তীর্ণ হইয়া থাকেন । পঞ্চম যিনি একধরবাদের নোকায় সমাকৃষ্ট হন, তিনি ভিন্নতার স্রোতস্বতী অতিক্রম করিয়া যোগের ভূমিতে আসিয়া পৌছেন ষষ্ঠ যে লোক সহিষ্ণুতাব, তরণীতে আবোহণ করবেন, তিনি সকল বিপদ সাগর পারাপার হইয়া এবং বন্দুব সঙ্গে মিলিত হইয়া নিষ্কটক ভূমিতে বাস করিয় যোগ সাধনার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হন ।

একজন ঈশ্বরশক্ত প্রেমোন্মত্ত সাধু পুরুষের বিবরণ ।

মোনাকাব গোওসি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ মহাম্মদ আব্দোল্যা আনসারি রহমাতুল্যা আলায়ছে হইতে বর্ণিত আছে যে, ৬কদিন হজবত আব্দোল কাদের জ্বিলানী বড়পীর সাহেব সৈয়দ আহাম্মাদ নামক একজন ঈশ্বর প্রেমিক সাধু পুরুষকে পরীক্ষা করিবার জন্য, এক টুকরা কাগজে এই বচনটি লিখিয়া পাঠাইলেন, “আল এসকো” ইহা কি প্রকার বস্তু । ভৃত্য সেই কাগজ টুকরাটি লইয়া চলিয়া গেল, নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইল যে, একজন অনাহারী কান্ত দীন হীন প্রেমোন্মত্ত সাধু পুরুষ রক্ততলে বসিয়া (তসূবি) মালা জপ করিতেছেন । ভৃত্য অভিবাদন পূর্বক তাঁহার হস্তে লিপিবদ্ধ কাগজটি দান করিল । মহর্ষি সৈয়দ আহাম্মাদ সাহেব বড়পীরের হস্তলিপিতে বার বার চুম্বন করিয়া পাঠ সমাপন পূর্বক বলিলেন, “আল এসকে নাবোন ইয়াহু রোকো মাসাবিল্লাহে” অর্থাৎ আমক অগ্নির সমতুল্য অন্য অগ্নি নাই এবং ঐ অগ্নিতে আল্লা ব্যতীত সমুদয় বস্তু জ্বলিয়া পুড়িয়া ভস্ম করিয়া দেয় । যখন তিনি বড়পীরের পবিত্র বচনের অর্থ করিলেন, তখনি এসম আজমের

অগ্নিময় তেজে বৃক্ষটী পুড়িয়া আবার মহর্ষি সৈয়দ সাহেব দেখিতে দেখিতে আঁখির পলকে ভস্ম হইয়া গেলেন, তাঁহার পবিত্র আত্মার ছাই ভস্ম ক্রমাগত জলে জলময় হইয়া পুনরায় বরফের স্থায় জমিয়া রহিল । ভৃত্যটী এ ভয়ঙ্কর দৃশ্য দর্শন করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বড়পীরের নিকটে ছুটিয়া গেল । পরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে সৈয়দ আহম্মদ সাহেবের অকস্মাৎ যে যে ঘটনা ঘটয়াছে তাহা সমুদয় শুনাইয়া দিল । ইহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া সেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া, বরফের উপর হস্ত রাখিয়া একটা মন্ত্র পাঠ করিয়া বলিলেন, “আলমসে ছুরাত জেসমানি” অর্থাৎ নিজগুর্তি ধারণ কর । ইহা বলামাত্র সৈয়দ সাহেব মহাবচন (কলেমা) পাঠ করিতে করিতে যেন নিদ্রা হইতে উঠিয়া বলিলেন এবং সেই সময়ে তাঁহাকে গুণবিদ্যায় দীক্ষিত করিলেন ।

বড়পীর আবুবকর হামামির কাওালী গাওয়া
বন্ধ করিয়া তাহার ফকিরি কাড়িয়া লয়
তাহার বিবরণ ।

গোলজার মানি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ আবুল হোসেন বেন আবুল কাসেম বর্ণনা করিয়াছেন যে,

শেখ আবু বকর হামামি গুপ্ত বিদ্যায় মহা পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু সদা সর্বদা সামা কাওয়ালী গাহিয়া বেড়াইতেন । তাহার সামা কাওয়ালীর প্রতি এতদূর সখ অনুরাগ ছিল যে, প্রায় লোক দেখিলেই কাওয়ালী গাহিত । তাহার এ রকম মন্দ স্বভাব দেখিয়া, হজরত বড়পীর সাহেব প্রায় তাহাকে সামা গাহিতে নিষেধ করিতেন । কিন্তু আবুবকর হামামি সে কথায় কর্ণপাত করিত না, কু-প্রবৃত্তির প্রলোভনে পড়িয়া, বড়পীরের কথা অমান্য করিয়া নিজের অভিষ্ট সিদ্ধ করিবার জন্য গুরুজনের কথায় ক্রক্ষেপও করিল না । কেবল সামা কাওয়ালী গাহিয়া আমোদ প্রমোদে দিন কাটাইতে লাগিল । একদিন হজরত বড়পীর সাহেব জামে মসজিদের মধ্যে আবুবকর হামামিকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, হে আবুবকর ! তুমি সামা গাহিয়া মহাম্মদি সরিয়তের উপর দাগ চড়াইতেছ ? হজরত মহাম্মদ (সঃ) যাহা নিষেধ করিয়াছেন, তাহা করিয়া কেন বৃথা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছ ; এখনও বলিচি উহা ত্যাগ কর, নতুবা তোমার ফকিরি নষ্ট করিয়া দিব । লোকের যখন মতিচ্ছন্ন কুমতি ধরে, তখন সাধুগণের সদ উপদেশ ত্যাগ করিয়া অমূল্য ধন হারাইয়া বসে । বড়পীরের কথা যখন একবারেই অগ্রাহ্য করিল, তখন তিনি তাহার গুপ্ত-বিদ্যা অমূল্যধন ফকিরি কারিয়া নিলেন । তাহার

ফকিরি গৌরব, আশ্পর্কি ও অভিমান সকলই চূর্ণ হইয়া গেল । হীনাবস্থায় বোগ্দাদ ছাড়িয়া ফাজাফ দেশান্তি-মুখে গমন করিয়া প্রাণ বাঁচাইয়া রক্ষা পাইল । কিন্তু সে সহর মধ্যে যাইয়াও সামা ত্যাগ করিল না, একদিন একস্থানে বহু লোকের ভিড় দেখিয়া সামা-কাওয়ালী গাহিবার জন্য যেমন সুর ধরিল, অমনি বড়গীরের অভিসা-পাত্তরে মুচ্ছা হইয়া ভূতলে পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল, বাকরোধ হইয়া গেল, তখন নিজের কৃত কার্যের প্রতিফল মনে করিয়া, সামা কাওয়ালী গাওয়া ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিল অর্থাৎ তওবা করিয়া পবিত্র হইল । সেই রাত্রেই হজরত মহাম্মদ (সঃ) হজরত বড়গীর সাহেবকে স্বপ্নে আসিয়া বলিলেন, হে প্রিয়পুত্র আব্দোল কাদের জ্বিলানী ! আবুবকর যেমন আমার সরিয়তের নীতি বিরুদ্ধ কার্য করিয়াছিল, তেমনি তাহার উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে । এখন তিনি সরল মনে সে কার্য (তওবা) ত্যাগ করিয়াছে, সে জন্য আমি তাহাকে ক্ষমা করিলাম এবং তুমিও তাহাকে ক্ষমা করিয়া পুনরায় তাহার ফকিরি (সাধুত্ব) ফিরাইয়া দাও । হজরত বড়গীর রজনী-যোগে স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছিলেন, প্রাতঃকালে তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ দরবারের দ্বাবে আবুবকারকে দেখিতে পাইলেন । আবুবকর অমনি গীরের চরণতলে পড়িয়া ক্ষমা

ভিক্ষা চাহিল । বড়পীর তাহার অপরাধ মার্জনা করিয়া পুনরায় তাহাকে দ্বিগুণ বিদ্যায় বিদ্যান করিয়া কামেল ফকির করিয়া দিলেন । অতএব হে পাঠকগণ ! ভাবিয়া দেখুন সামা কাওয়ালী গীত বাদ্য কতদূর সৃণিত কার্য্য, যাহার জন্ম মহাসাধক পুরুষেব এরূপ কঠিন শাস্তি পাইতে হইল, তবে কি বুঝিয়া আজকালের ভণ্ড ফকিরেরা গীত বাদ্যে, সামা কাওয়ালীতে আনন্দ কবিয়া থাকে । যাহারা বাহ্যিক আনন্দে নিমগ্ন তাহারা কেমন করিয়া সাধুত্ব লাভ করিতে পারিবে । যিনি সাধকদিগের পরম গুরু হজরত বড়পীর তাহারও সামা কাওয়ালীর প্রতি বিদ্বেষ । তবে যাহারা ফকিরী পথ অবলম্বন কবিয়াছে সম্বরেই যেন ইহা ত্যাগ করে ।

খাজা মইনদ্দিন চিস্তি ও বক্ত্রিয়ার কাকির সামার বিবরণ ।

লাতায়ে ও গরায়েব এবং অন্যান্য গ্রন্থে লিখিত আছে, যখন খাজা কোতোবদ্দিন বক্ত্রিয়ার কাকি (রঃ) বয়স ত্রয়োদশ বৎসর তখন তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া হজরত খাজা মইনদ্দিন চিস্তি আজমেরী বোগ্দাদ শরিফে যাইয়া বড়পীর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন । বড়পীর সাহেব খাজা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভ্রাতঃ ! তোমার

সঙ্গে এ বালকটী কে ? তিনি कहিলেন, ইহার নাম কোতোবদ্দিন ; ইনি বাল্যকালেই আমার হস্তে গুরিদ হইয়াছে এবং আমিও ইহাকে অধিক ভাল বাসিয়া থাকি । তখন তিনি বালকের গন্তুকে হাত বুলাইয়া বলিলেন, আশীর্বাদ করি প্রধান সাধুত্ব লাভ করিও, পরে খাজা সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমাব এই শিষ্যটী ভবিষ্যতে মহা সাধুপুরুষ হইয়া দিল্লীর মধ্যে বাস করিবে । ফলে বড়পীর সাহেবেব আশীর্বাদে কোতোবদ্দিন এমন সাধুত্ব লাভ করিয়াছিলেন যে, কুদরতী কঁাক হইতে লক্ষ লক্ষ লোককে ভোজন কবাইয়া পবিত্ৰ করাইতেন । একদিন খাজা সাহেব চঞ্চল মনে ইতস্ততঃ করিতেছেন, তাহা দেখিয়া বড়পীর সাহেব বলিলেন, ভ্রাতা ! আজ কেন তোমার এত চঞ্চলা স্বভাব ? তখন তিনি বলিলেন, আপনিত আমাব স্বভাব জানেন, সামার সভা না করিলে নিশ্চিন্ত হইয়া একস্থানে বেশী দিন কাল কাটাইতে পারি না । তখন তিনি বলিলেন, ভ্রাতা খাজা মইনদ্দিন ! আমি সামা শুনিতে তত ভাল বাসিনা, তবে কেবলমাত্র তোমারি জন্য সামা গাহিতে আদেশ দিলাম । রাত্তিকালে সাধু ও বন্ধু বান্ধবগণে সভা করিয়া বসিলেন, সম্পূর্ণ মজলিসে খাজা মইনদ্দিন চিন্তি আরব্য ভাষায় সামা অর্থাৎ এই পদ্যটী পাঠ করিতে লাগিল ।

আন রসুলোল্লাহু আদরুনি ।

ওলায়াফু এন্দা বসুলোল্লাহু মাযুলে ॥

নিশ্চয় রসুলোল্লা পুরুষ পবিত্র ।

ক্ষমাকারী গুন তাঁর এই একমাত্র ।

খাজা সাহেব যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই সামা পাঠ করিয়া-
ছিলেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বড়পীর সহেব ধরাতলে যষ্টিদ্বারায়
ঠেক দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন ■ যতক্ষণ পর্য্যন্ত পৃথিবীকে
দাবিয়া রাখিয়াছিলেন, ততক্ষণ তাহার সর্ব্বাঙ্গ ধর ফর
করিতেছিল এবং ঘর্মে সর্ব্বশরীর ভিজিয়া গিয়াছিল ।
পরে যখন সভা ভঙ্গ হয়, কেহ পীরসাহেবকে জিজ্ঞাসা
করিয়াছিলেন, হুজুর! যখন খাজা সাহেব সামা পাঠ
করিলেন, তখন আপনি যুক্তিকায় আমাব ঠেক দিয়া
দাবিয়া ধরিয়াছিলেন কেন । 'তখন তিনি বলিলেন, এই
আসাবাড়ীতে পৃথিবী দাবিয়া না ধরিলে নিশ্চয় খাজা
সাহেবের সামার মহিনী শক্তিতে ধরিত্রী বিদীর্ণ হইয়া
যাইত । পাঠকগণ! বুঝিয়া দেখুন, সামা কাহাকে বলে ।
আজকাল অনেক ভুণ্ডলে ফকির বলিয়া থাকে, 'চিন্তিয়া
তরিকাতে সামা, কাওয়ালী, গীত বাণের প্রথা আছে ।
ইহা বলা তাহাদের অলীক; সম্পূর্ণ মিথ্যা, সামা কাওয়ালী
গীত বাদ্য ইহা সকলই হাবাম ।

যেমন সায়েরল আওলিয়া নামক গ্রন্থে লিখিত আছে,

সোলতানল মসামেথ নেজামদিন চিশ্তি রহমাতুল্যা আলায়হে বলিয়াছেন যে (১) ; সামা চার প্রকার যথা, হারাম, মকরু, মোবাহু, হালাল ? হারাম ঐ লোকের জন্ম যাহারা সামার সুরে মগ হইয়া স্ত্রীলোকের প্রতি আশক্ত হয়, মকরু ঐ লোকের জন্ম যাহারা কখন কখন খোদাকে স্মরণ করে, মোবাহু উহার জন্ম যাহারা বাহ্যিক আয়োদ প্রিয় নয় এবং সুদা সর্বদা খোদাপ্রেমে আশক্ত, হালাল ঐ সাধুপুরুষদিগের জন্ম, যাহারা একে এলাহিতে ডুবিয়া আছেন এবং যাহারা প্রতি নিশ্বাসে নিশ্বাসে খোদাতায়ালার নাম স্মরণ করিতে থাকেন, এবং ছয়টি লতিফা হইতে আল্লা আল্লা শব্দ উচ্চারণ হয়, একদমের জন্মও খোদার নাম হইতে বিস্মরণ হয় না। এরূপপ্রকার চিশ্তিয়া তরিকের ঈশ্বর প্রেমোন্মত্ত সাধু লোকের জন্ম কেবল মাত্র সামা কাওয়ালী করা শুদ্ধ আছে, কিন্তু অন্য কোন তরিকার মধ্যে কোন লোকের জন্ম শুদ্ধ নাই। তবে যাহারা কেবল সামায় নিমগ্ন হইয়া আয়োদ প্রিয় হয়, গীতবাদ্য করে এক সভায় স্ত্রীপুরুষে আয়োদ প্রমোদে মত্ত থাকে, খোদাপ্রেমে তত আশক্ত নয়, রোজা নামাজ ত্যাগ কবিয়া, সমস্ত রজনী সামা কাওয়ালী গাহিয়া বাহ্যিক

(১) এই সাধুপুরুষের সমাধি (কবর) জিরাবত করিলে একটা হজের পুণ্যাহ পাওয়া যায়।

সাধুতার আড়ম্বর দেখাইয়া মুর্খলোকদিগকে কুপথগামী করাইয়া ফিরে । আর মুখে বলে আমরা চিশ্‌তিয়া, সামা কাওয়ালী করিয়া বেড়াইব আমাদের নামাজ বোজায় আবশ্যিক নাই, ইহা এক প্রকার ভিন্ন পথ তাহারা সামরা-নিয়াদল কিন্তু চিশ্‌তি তরিকার প্রধান গীর গুরু খাজা কোতোবদ্দিন বক্তিয়ার কাকি চিশ্‌তি রহমাতুল্যা আলা-য়হে সামা পাঠ করিতেন ও নামাজ পড়িয়া সরিয়তের আঞ্জা পালন করিতেন ।

ফাওাদল সালেকিন নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, একদিন খাজা বক্তিয়ার কাকি (রঃ) খোদাপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া (সামা) এই পদ্যটি পাঠ করিয়াছিলেন ;—

বয়েত ।

সরুদ চেস্ত কে চন্দে ফস্ব আশক দোরস্ত্ ।

সরুদ মহরম আশক এস্ত্ ও আশকে মহরামাস্ত্ ॥

তিনি এই সামা বয়েতটি পাঠ করিয়া অনাহারে সপ্ত-দিন পর্য্যন্ত অচেতনাবস্থায় পড়িয়াছিলেন, কিন্তু উপা-সনার সময় কালিন চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া নামাজ পড়িয়া লইতেন । সপ্তদিন খোদাপ্রেমে বা এলাহী এক্ষে নিমগ্ন হইয়া, অচেতনাবস্থায় পড়িয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পঞ্চমীত সময়ের নামাজ উপাসনা ত্যাগ করেন নাই । কেননা

বন্ধুর আদেশ পালন বন্ধুতেই করিয়া থাকে, তজ্জন্য পঞ্চম ওক্তের নামাজ সহস্র বিপদে পড়িয়াও তাহা কোন দিনের জন্যও ত্যাগ করেন নাই ।

জামেওল কলম নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, একদিন খাজা কোতবদ্দিন, শেখ ফরিউদ্দিন, কাজীহামিদদ্দিন নাগরী, শেখ হানিফ তবরেজী, এরূপপ্রকার সাধু ও বিদ্যান মণ্ডলীগণ প্রায় সহস্র লোক ছিল । সেই সভায় খাজা কোতবদ্দিন কাকি সাহেব নাচিতে নাচিতে সামা পাঠ করিলেন । সে সময় সকল লোক, অজ্ঞান হইয়া কাকি সাহেরের পদতলে লুষ্ঠিত হইয়া পড়িল । ইহাতে তিনি অসন্তোষ হইয়া ইসারায় ফরিউদ্দিন গঞ্জেসকরকে বলিলেন, ইহাদের শিরশ্ছেদন কর ? তখন ফরিউদ্দিন সকলকে ভীমনাদে কহিলেন, হে ধূলায় লুষ্ঠিত ব্যক্তিগণ ! তোমরা শীঘ্র শীঘ্র উঠিয়া পড়, নতুবা তোমাদের এখনই গর্দান যাইবে । তখন পিরের চরণতল হইতে সকলেই উঠিয়া পড়িল । খাজা কাকি সাহেব সামা পাঠ করিয়া খোদাপ্রেমে নিমগ্ন হইয়া দ্বাদশবার ভূমিষ্ঠ হইয়া সৃষ্টি-কর্তা দয়াময়কে মেজ্জা করিয়াছিলেন । সালেকিন গ্রন্থে লিখিত আছে, চিশ্‌তিয়া তরিকাতে সামায় দুইটী নিয়ম আছে ; প্রথম নিয়ম নামাজ সমাধা করা, দ্বিতীয় নিয়ম নামাজ পড়িবার সময় জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া, আবশ্যিক । আর

শ্রোতাৰ জন্ম নিজের কু-ইচ্ছাকে ত্যাগ করা, কেবল
খোদাপ্রেমে একে এলাহীতে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া
রাখে । অতএব যে যাহা কবিয়া থাকে তাহা যেন বিশ্ব-
পালকের সন্তোষের জন্ম হয় তাহাতে নিজের কু-
অভিপ্রায় চরিতার্থ করিবার জন্ম এমন কোনরূপ ভণ্ডামি
তিলাক্ষ না প্রকাশ পায় ।

বড়পীর সাহেব বোংগদাদের বাদশাহকে
স্বর্গীয় সেব ফল ভক্ষণ করিতে
দেন তাহার বিবরণ ।

গোলজারগানি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, আবুল
মোফাখার হোসুনি বোংগদাদি হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে,
একদিন বোংগদাদ অধিপতি সম্রাট বাদশাহ জাহাপনা মনে
মনে বড়পীর সম্বন্ধে কত কি আলোচনা করিতে লাগিলেন ।
ভাবিলেন, ইনি যদি আমাকে কোন কেৰামত আশ্চর্য্য
বিষয় দেখাইতে পারেন তাহা হইলে পীরসাহেবেব কাছে
শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সেবা শুশ্রুষায় নিযুক্ত হইব । মনে
মনে এইরূপ যুক্তি করিয়া যখন পীর দরবারে উপস্থিত
হইলেন ; তখন পীরগুণধরেব তাহার মনোভাব অবগত
হইতে আর বাকী বহিল না । সম্রাটকে দেখিবারাত্র

জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বোগদাদাধিপতি ! আপনি কি কোন বিষয়ের কেরামত দেখিবাব ইচ্ছা করেন । তখন সম্রাট একটু অপদস্থ হইয়া নম্রতাভাবে কহিলেন, মহাত্মন ! এসময় কোথায়ও সেব ফল পাওয়া যায়না, আপনি একজোড়া স্বর্গীয় টাটকা সেব আমাকে স্বর্গ হইতে আনিয়া দিউন । বড়পীর সাহেব সম্রাটের মনো আশা পূর্ণ করিতে ধ্যানযোগে স্বর্গের দিকে চাহিয়া দেখিলেন একজোড়া টাটকা সেব একস্থানে ধরা আছে । হজরত সেই ফল জোড়া প্রার্থনা করিতেই স্বর্গীয় দূতের দ্বারায় অদৃশ্য ভাবে আসিয়া পৌঁছিল । আপনি একটী লইয়া অপরটী বাদশাহর হস্তে প্রদান করিলেন । হজরত আপনি যে ফলটী রাখিয়াছিলেন তাহা ছেদন করিয়া আপনি ভক্ষণ করিলেন, আর সহচর দিগকেও খাইতে দিলেন ; তাহার সৌগন্ধে দরবার মগ্ন হইয়া গেল, ফলের আশ্বাদনে সকলেই আনন্দিত হইয়াছিল । বাদশাহু যে ফলটীকে লইয়াছিলেন তাহা নিজের হস্তে তখনই কর্তন করিলেন, তাহাব ভিতরে পচা দুর্গন্ধ বাহির হইল, ইহা দেখিয় সম্রাট তাজ্জব হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হুজুর ! আমার এই ফলটী এরূপ দুর্গন্ধ হইল কেন ? তখন তিনি বলিলেন, হে বাদশাহ নামদাব ! এ স্বর্গীয় সেব উত্তম, তবে তোমার মনের কোশলে কু প্রবৃত্তিরদোষে ও

অপবিত্র হস্তের স্পর্শে উহা নষ্ট হইয়া দুর্গন্ধে পরিণত হইয়াছে । তুমি একজন সম্রাজ্যশালী বোগদাদ সহরের সম্রাট ! আপনি যদি সত্য বিচার ও প্রজার প্রতি দয়া, কি তাহাদেব প্রতি দান খায়বাত করিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই আপনি স্বর্গীয় ফল ভক্ষণ করিতে পাইতেন । সংকার্য্য না করিয়া, তবে আপনি কেমন করিয়া স্বর্গীয় ফল খাইতে পাইবেন । জগতে যাঁহাৰা সংকর্ম্ম কবিয়া পুণ্যবান ধার্ম্মিক হইবেন তাঁহাবাই পরকালে স্বর্গীয় সুখাদ্য ফল খাইতে পাইবেন, উহাতে পাণীৰ কোন অধিকার নাই । বড়পীর সাহেবের এই মর্শ্বভেদী বাক্য-বাণে জর্জরিভূত হইয়া বিষন্ন বদনে সম্রাট সেখান হইতে তখনই উঠিয়া গেলেন পাঠক যুঝিয়া দেখুন, কি ধনি কি আমির কি গরিব কি নিৰ্বেোধ কি জ্ঞানবান কি বিদ্যান কি মূর্খ কি রাজা কি প্রজা কি সাধু কি অসাধু সংকর্ম্ম ব্যতীত কেহই কখন স্বর্গীয় সুখ ভোগ করিতে পারিবে না, এইটী বিধির বিধান, কর্ম্মের মত ফল ।

বড়পীরের হস্ত স্পর্শে স্বর্ণ মোহর
রক্তময় হয় ।

খোলাসাতল কাদরি নামক গ্রন্থে মনসালেথ হইতে বর্ণিত আছে, অপর এক সময় মনস্বেবের পুত্র ইউসুফ

বোগদাদাধিপতি একতোড়া (আমরাফ) স্বর্ণ মোহর হজরত মহবুবে মোবহানি আব্দোল কাদের জিলানি বড়গীর সাহেবকে নজরানা উপহাব পাঠাইয়া দিলেন । তিনি বাদশা প্রদত্ত স্বর্ণ মোহর লইতে স্বীকৃত হইলেন না, তবে রাজ মন্ত্রির অনুবোধে তোড়াটি হাতে লইয়া, দুই হস্তে মর্দন করিলেন । বর্ধন হজবত মোহর গুলি হস্তের দ্বারায় মর্দন কবিত্তে আরম্ভ করিলেন, তখনই মোহর হইতে টাটকা রক্ত পড়িতে লাগিল, কেবলমাত্র কয়েকটি স্বর্ণ মোহর হইতে রক্ত বাহির হইল না এবং তাহা ভিন্ন সকল মোহর গুলিই রক্তময় হইয়া গেল । তাহা দেখিয়া সভাসদ ও রাজমন্ত্রী আশ্চর্য্য হইয়া তখনই সভ্যদের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন । বাদশা সংবাদ পাঠাইয়া তখনই পীর দব্বারে আসিয়া হাজির হইলেন এবং প্রদত্ত স্বর্ণ মোহর গুলি রক্তময় দেখিয়া, ক্ষুণ্ণ মনে পীর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাজন ! স্বর্ণ মোহর হইতে রক্ত নির্গত হইল ইহার কারণ কি ? যাহা কর্ণেও শুনিব, চক্ষেও দেখিব, এরূপ অসম্ভব আশ্চর্য্য ঘটনা কখনই ত ঘটেনা । তখন তিনি বলিলেন, আপনি নিরাশ্রয় অসহায় পিতৃহীন এতিম বালক ও দীন দুঃখি প্রজাব প্রতি উৎপীড়ন অভ্যাচার কবিয়া এই অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেজন্য তাহাদের আর্তনাদ হা

হুতাশ মনস্তাপ প্রত্যেক লোমাবালি শিরায় শিরায় অভিসম্পাতের রক্ত ঐ স্বর্ণ মোহবে স্থান পাইয়াছে এবং উহা অবৈধ হারামে পরিণত হইয়াছিল । এখন আমার পবিত্র করম্পর্শে যাহা নিরাস্রয় লোকেব অভিসম্পাতের রক্ত, তাহা বহির্গত হইয়া আসলে পরিণত হইল । নিশ্চয় আমার এই বাক্যাবলি বিশ্বাস করিয়া গইবেন, এই বলিয়া তিনি আরবী হাদিসটী উচ্চারণ করিলেন ।

“কোল্ল সায়য়েন ইয়ার জেয়ো এলা আছলেহি ।”

অর্থাৎ জগতে যাহা কিছু বস্তু আছে সকলেই যে যাহার আসলে পরিণত হইবে । বাদশা ও মন্ত্রী বড়পীরের মুখে আরবী হাদিসটী শ্রবণ করিয়া, সেই দিন হইতে সতর্ক হইয়া, লোকের প্রতি উৎপীড়ন অত্যাচার না করিয়া সকল প্রজার প্রতি সমান ভাবে দয়া ও দান খায়রাত করিতে লাগিলেন ।

বড়পীরের দান করা বস্তু পঞ্চবিংশতি
বৎসর এক রকম থাকে তাহার
বিবরণ ।

তহফাতুল কাদরি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, হজরত বড়পীর সাহেবের শেখ আবুল আব্বাস নামক একজন আশু পালক, তিনি বড়পীর সাহেবের বড়ই প্রিয়ভক্ত

ছিলেন । হুজুর যখন যাহা, তাহাকে আদেশ করিতেন অশ্ব পালক তখনি তাহা প্রাণপণ চেষ্টায় সম্পূর্ণ করিয়া দিত । এজন্য পীরসাহেব তাহাকে বড়ই ভাল বাসিতেন ; এমন কি তাহার বাটীর খাওয়া পড়ার প্রত্যহ সংবাদ লইতেন । এক বৎসর বোগদাদ সহরে এমন দুর্ভিক্ষ দেখা দিল যে, সেই দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পতিত হইয়া শত শত অনাহারী ভিক্ষুক দরিদ্র কাঙ্গাল প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল । আবুল আব্বাস বলিয়াছেন, আমি সেই দুর্ভিক্ষের হস্তে পড়িয়া বড়ই কষ্ট পাইতে লাগিলাম, কখন কখন একসন্ধ্যা খাইয়াও প্রাণ বাঁচাইতে হইয়াছিল । আর কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া পীরদরবারে যাইয়া হাজির হইলাম ; তিনি আমার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া, একটা থলেতে করিয়া একমন গেছ আমাকে দান করিলেন । পরে আমাকে বলিয়াছিলেন আব্বাস ! তুমি এই থলের মুখ কখনই খুলিওনা, কেবল মাত্র একটা ছিদ্র রাখিও যখন যেমন যাহা আবশ্যিক হইবে, তখন ঐ ছিদ্র দিয়া গেছ বাহির করিয়া লইও, তাহা হইলে উহা কখনই কম হইবে না । আমি পীরসাহেবের কথায় স্বীকৃত হইয়া তদনুযায়ী কার্য করিতে বাধ্য হইলাম এবং সেই দিন হইতে দয়াময়ের কৃপায় ও পীরের দাতব্য বস্তুর গুণে দুর্ভিক্ষ আর আমার

কিছুই করিতে পারিলনা । আমি থলের ছিদ্রে দিয়া গেছ বাহির করিয়া রুটী প্রস্তুত করি, আবার সময়ে সময়ে বাজারে বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্যে হাট বাজার ভরণ পোষণ সকলি করিয়া থাকি । কিন্তু কখনই তাহা হইতে একটু কম বলিয়াও বোধ হইল না, পীরের দাতব্য জিনিষের কি কেরামত পঁচিশ বৎসর অতীত হইয়া গেল প্রায় একরূপেই কাল কাটিয়া যাইতে লাগিল । সেই বিশ্বপালক খোদাতায়ালার মপথ করিয়া বলিতেছি পঁচিশ বৎসর মধ্যে এক মুষ্টি গেছ কম বলিয়াও বোধ হইল না । পঁচিশ বৎসর পরে একদিন আমার পত্নী ভুল ক্রমে থলেটির মুখ খুলিয়া গেছ ঢালিয়া লইয়াছিল, সেইদিন হইতেই সকল গেছ ফুবাইয়া গেল ।

বড়পীরের নিকটে সয়তানের চাতুরি ।

মনাজ্জেল আওলিয়া নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ আবুল কাসেম বোগদাদী হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একদিন হজরত মহবুবে সোবহানি আব্দোল কাদের জ্বিলানী বড়পীর সাহেব রোমজান মাসে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, অগ্নিকার উপবাসের সন্ধ্যার আহার স্বর্গীয় আহাৰ্য্য ব্যতীত কখনই এফতার করিবনা । দেখিতে দেখিতে ভানুদেব সূর্য্য সমস্তদিনের পরে ক্রান্ত হইয়া,

লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়া পাটে বসিলেন। তখন হজরত বড়পীর সাহেব নিজের কুঠির মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিশ্চিত্ত মনে বসিয়া রহিলেন। এমন সময় দেখিতে পাইলেন শূন্য হইতে একটা লোক সজ্জিতবেশে হস্তে স্বর্ণ থালে করিয়া নানা প্রকারের মিষ্টান্ন ও উত্তম উত্তম মেওয়া ফল, ফলমালা আচ্ছাদন করিয়া হস্তে লয়ে সম্মুখে আসিয়া রাখিয়া দিলেন। আগন্তুক ব্যক্তি মেওয়া পূর্ণ স্বর্ণথাল সম্মুখে রাখিয়া কহিল, হজুর! এ স্বর্গীয় আহার্য আপনাব (রোজা এফতার) উপবাস ভোজন করিবাব জন্য স্বর্গ হইতে অনিয়মিত। খোদাতায়লা আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছেন, এখন আপনি স্বচ্ছন্দে এফতার করুন। স্বর্ণথাল দেখিয়া হজরত বড়পীরের মনে একটু সন্দেহ হইবার কারণে, কসূফে ধ্যানে বসিয়া সময়তানের চাতুরি বলিয়া আর বুঝিতে বাকি রহিল না। তখন তিনি তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া কৰ্কশ স্ববে কহিলেন, ছরহ্! সময়তান এবলিস! আমার সঙ্গেও চাতুরি! আমার হজরত মহান্নাদ মস্তফা (সঃ) মের সরিয়তের আদেশানুযায়ী রোপ্য ও স্বর্ণের থালে আহার করা ও স্বর্ণ রোপ্যের অলঙ্কার পুরুষকে পরিধান করা অবৈধ হারাম। পাপাত্মা! এতদূর আশ্পর্কী আমার সঙ্গে ছল চাতুরি; মনে করেছ কি? একি আদি পুণ্ড্র আদম (আঃ)

কে পাইয়াছে যে, ছলে, কলে, কৌশলে স্বর্গচ্যুত করাইব ? ছরাত্মা সেই দিনের দুর্দশার কথা কি মনেও নাই, যে দিন দৈবহস্তেব মার খাইতে খাইতে পলায়ন করিয়াছিল। মহাপাপী শয়তান দেখিল যে, আমাকে চিনিয়া লইয়াছে, আর চাতুর্ঘী খাটিবেনা, অমনি চক্ষুব পলক মারিতে না মারিতে অদৃশ্য হইয়া গেল। এদিকে এফ্তাব করিবার সময় হইলে অকস্মাৎ স্বর্গীয় দূত, স্বর্গীয় আহাৰ্য্য লইয়া বড় পীরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে মহবুবে সোবহানি আব্দোল কাদেব জ্বিলানী ! সেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডেব অধিপতি খোদাতায়ালা তোমাব প্রতিজ্ঞা-পূর্ণ করিয়াছেন, এখন উঠ স্বর্গীয় আহাৰ করিয়া রোজা এফ্তার কর। হজরত বড়পীর সাহেব আর সময় নষ্ট না করিয়া এফ্তার করিলেন, স্বর্গীয় আহাৰ্য্য আহাৰ করিবার পরে একটি দোয়া পড়িয়া তাঁহার ধন্যবাদ শোকর আদায় কবিত্তে লাগিলেন।

বড়পীর সাহেব একদিনে সত্তর স্থানে
রোজা এফ্তার করেন।

মক্কা মেফায়ে জনিদ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ আব্দোল কাদের শামি হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, এক

সময় রমজান শরিফের মাসে, এক একজনের অসাফাতে বড়পীর সাহেবকে, একে একে সত্তর জন লোক নিমন্ত্রণ করিলেন । তিনি সকলেরি মন রাখিবার জন্য নিমন্ত্রণ ও আহ্বান স্বীকার করিয়া এবং নিজের আশ্চর্য্য কেরামত গুণে এক মুহূর্ত্তেই সকলের বাটীতে গিয়া রোজা এফতার অর্থাৎ উপবাস ভোজন করতঃ সকলের মনঃভূষ্টি করিয়া, আবার নিজের বাটীতেও শিষ্যগণের সঙ্গে বসিয়া রোজা এফতার করিলেন । পরদিন সে সকল লোক পরস্পর বলাকহা করিতে লাগিল যে, আজ হজরত বড়পীর সাহেব আমাব বাটী এফতার করিয়াছেন । এইরূপ ক্রমাগত সত্তর জন বলাকহা করাতে, পীরের আশ্চর্য্য কেরামত প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং শিষ্যগণ বা অন্য অন্য লোক সকলেই বিশ্বাস করিল । কিন্তু একটি ভৃত্যের মনে এ কথা প্রত্যয় হইল না ; অবিশ্বাসী ভৃত্য কহিল, আচ্ছা ভাই ! পীর সাহেবের শরীর হইল একটি । আর সে কেমন করিয়া সত্তর স্থানে এফতার করিয়াছিলেন । আমিও ত বাটীর মধ্যে পীর সাহেবের সঙ্গে এফতাব করিয়াছি ? তবে কেমন করিয়া তিনি সকলের গৃহে এফতার করিয়াছিলেন । অবিশ্বাসী ভৃত্যের কথা পীরসাহেব অবগত হইয়া, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যাকালে একটি বৃক্ষমূলে বসিয়া তস্বী হস্তে জপ করিতে লাগিলেন ।

কতক্ষণ পরে ভৃত্যকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ওরে ভৃত্য ! তোর মনে আমার সত্তর স্থানে এফতার করাতে সন্দেহ হইয়াছে নয় ? তা তো হইতেই পারে ? একবার উর্ক্কে দৃষ্টি করিয়া এই বৃক্ষটির শাখা প্রশাখার দিকে লক্ষ করিয়া দেখ দেখি । সে যেই মাত্র চক্ষু তুলিয়া উর্ক্কে দৃষ্টি করিল, অগনি দেখিতে পাইল যে, বড়পীর সাহেব বৃক্ষের শাখা, প্রশাখায়, প্রত্যেক পাতায় পাতায়, পৃথক্ পৃথক্ এক একটি বড়পীর বসিয়া তস্বী জপ করিতেছেন এবং বৃক্ষের নিম্নে দৃষ্টি করিতে দেখিতে পাইল যে, স্বাভাবিক ভাবে যেমন বসিয়াছিল সেইরূপ বসিয়া তস্বী জপনা করিতেছে । তখন চাকরটির মনের সন্দেহ দূরে গেল, পীরের চরণ তলে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া লইল । অধম লেখক বলেন, প্রায়ই অজ্ঞ মুর্থ-লোকের মনে আওয়ালিয়ার কেরামত বিষয়ে সন্দেহ কবিয়া থাকে ।

বড়পীরের উপাসনাগুণে শুষ্কবৃক্ষ ফল ধরে ।

এগারুই মজ্লেস নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ আলি মহুতি বলিয়াছেন যে, একদিন হজরত আব্দোল কাদের জ্বিলানী বড়পীর সাহেব কোথায় গমন করিয়া-

ছিলেন, পথিমধ্যে আসিতে আসিতে উপাসনার সময় উপস্থিত দেখিয়া, আমার বাঁটীতে পদার্পণ করিলেন । আমি উপাসনা কালীন হজরতকে দেখিলামাত্র তাড়াতাড়ি করিয়া, ওজুর জল আনিয়া যোগাইলাম ? হুজুব আমার একটা শুষ্ক খোঁবমা—বৃক্ষমূলে ওজু করিয়া, অন্য একটা নিষ্ফলা খর্জুর বৃক্ষমূলে নামাজ পড়িয়া সন্ধ্যা আত্মিক সমাপ্ত করিলেন । সেইদিন হইতেই আমার খোরমা ও খর্জুর বৃক্ষে সম্পূর্ণ ফল ফলিতে লাগিল । এমন কি সেই বৃক্ষ দুইটী হইতে একদিনের তরেও খর্জুর ও খোরমা শেষ পায় না, বাবমাসই বৃক্ষ দুইটীতে ফল দিয়া, আমার উন্নতি করিতে লাগিল । আমিও পীরের পুণ্যহু ফল স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলাম ।

হজরত বড়পীর সাহেবের তপস্যা ও প্রতিজ্ঞা পূর্ণ ।

আবুল হোসেন কোতবদ্দিন আপন গ্রন্থে লিখিয়াছেন, এক সময়ে হজরত বড়পীর সাহেব নির্জন স্থানে একটা পর্বত মধ্যে তপস্যায় মননিবেশ করিলেন ; সে তপস্যা ভয়ঙ্কর কঠিন । এককালে দণ্ডায়মান হইয়া পঞ্চদশ বৎসর সাধনা করিতে নিযুক্ত হন । কখন কঠিন ত্রত উদঘাপন করিতে একদিন হইতে তিনদিন উপবাস থাকি-

তেন, কখন চল্লিশ দিবস পর্য্যন্ত উপবাস থাকিয়া সৃষ্টিকর্তা জগদীশ্বরের আরাধনা অর্চনা করিতেন । তথাপি ক্ষুধার জ্বালায় একটুও বিচলিত ভাব হইতেন না । তাঁহার সেই কঠোর ব্রত উদ্যাপন ও তপস্যা দেখিয়া বনের পশু পর্য্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িত তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, আমি এক সময়ে সেই পর্ব্বত মধ্যে তপস্যা করিতে করিতে, দাতাদয়াময় খোদাতায়ালার নিকটে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, আমাকে কেহ মুখে তুলে আহার না করাইলে, আহার করিব না ; এবং কেহ জল না পান করাইলে, জল পান করিব না । এইরূপ কঠিন প্রতিজ্ঞা করিয়া, একমনে একধ্যানে ঈশ্বরারাধনায় নিযুক্ত হইলাম । দেখিতে দেখিতে ঊনচল্লিশ দিন অতীত হইয়া গেল, তথাপি কেহই আসিয়া আমাকে পান আহার করাইল না । চল্লিশ দিবসের দিনে অকস্মাৎ একটা লোক আসিয়া, নানাপ্রকারের খাদ্যদ্রব্য আমার সম্মুখে রাখিয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল । সম্মুখে আহাৰ্য্য সাগরী দেখিষা, জ্বঠরানল জ্বলিয়া উঠিল, ক্ষুধাও উত্তেজিত হইয়া, খাও খাও বলিয়া তোয়ামদ করিতে লাগিল । আবার বলিল, আর কতদিন সহ্য করিয়া থাকিবে, অনাহারে মারা পড়িবে, তোমার কে এমন বন্ধু আছে যে, মুখে তুলে খাওয়াইয়া যাইবে ? তখন আমি বলিলাম, রে ক্ষুধা ! রে লোভ ! ধৈর্য্যা-

বলঘন কর ; আমার ভীষণ প্রতিজ্ঞার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ ? আমি তোমাদের উত্তেজনায় কখনই বিচলিত হইব না । এমন সময় উদর হইতে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন শব্দ শুনিতে পাইলাম, ক্ষুধা কাতরস্বরে বলিয়া উঠিল, মলাম, মলাম, আবার একদিকে লোভ বলিতেছে, খাই, খাই । কিন্তু আমি সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া অটল, অচল ভাবে বসিয়া বিভূপ্রেমে মননিবেশ করিলাম । আবু সাইদ (রঃ) সেই পথ দিয়া কোথায় যাইতেছিলেন, তিনি রিপুগণের চীৎকার ধ্বনি শুনিল, আমার নিকটে ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে সাধু প্রবর ! এমন অধৈর্য্য চীৎকার কেন ? আমি তাহাকে বলিলাম, এ আমার ক্ষুধা, লোভ, অধৈর্য্য রিপুগণের আওয়াদ । কিন্তু আমি, আমার প্রতিজ্ঞা পালন করিতে, অটল, অচল, স্থির, ধীর ■ গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া, একমনে একধ্যানে, খোদাপ্রেমে নিমগ্ন আছি । তখন তিনি বলিলেন, হে আব্দোল কাদের ! তুমি আমার সঙ্গে চলিয়া আইস, তোমাকে আহাৰ করাইয়া দিব ; এই বলিয়া তিনি তখনই চলিয়া গেলেন । আমি সে সময় মনে মনে ধারণা করিলাম, খোদাতায়ালার আদেশ ব্যতীত এখান হইতে কখনই উঠিব না । এমন সময় খাজের আলায়হে-চ্ছালাম আসিয়া বলিলেন, যাও উঠ ! খোদাতায়ালার

আদেশ এইরূপ যে, তুমি শেখ আবু সৈয়দের বাণী তাঁহার হস্তের অন্ন ভক্ষণ করিয়া প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবেন । তখনই আমি উঠিয়া তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইলাম, তিনি আমার জন্ম অপেক্ষা করিতেছিলেন ; আমাকে দেখিবামাত্র বলিলেন, আমার আস্থানে তোমার মনঃতুষ্টি হয় নাই, এখন খাজের আলায়হে ছালাম পাঠাইতেই আসিয়াছ, এস ! এই বলিয়া তিনি আমাব মুখে তুলিয়া আহার করাইয়া দিলেন । আমিও উদর পুরিয়া আহার করিলাম । পরে তিনি একখানি পরিচ্ছদ লইয়া, নিজের হস্তে আমার অঙ্গে পরাইয়া দিয়া, আশীর্বাদ পূর্বক বিদায় করিয়া দিলেন ।

হজরত বড়পীর সাহেব নদীর মধ্যে জল-
জন্তুগণকে গুপ্ততত্ত্ব শিক্ষা দেন ।

একটি আরবী রেসালা হইতে উর্দু অনুবাদ করিয়া মওলানা শাহু আহাম্মদ আপন গ্রন্থে লিখিয়াছেন, শেখ আহাম্মদ মগরবী বলিয়াছেন যে, একদিন কোতবে আলম গওসল আজম মহবুবে সোবহানি শিষ্য সমভিব্যাহারে কোথায় যাইতেছিলেন ; সম্মুখে একটি নদী দেখিয়া নির্ভয় অন্তরে সবল মনে মুসা আলায়হেছালামের ল্যায় জলেব উপর দিয়া নদীর মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন ।

সে সময় জল-জন্তু হাসর, কুস্তির, শুশুক ও বৃহৎ বৃহৎ মৎস্যগণ হজরত বড়পীরের চতুর্দিকে ঘিরিয়া কাতারে কাতারে ভাসিয়া উঠিল। এদিকে শিষ্যগণ গুরুদেবকে জলের উপর, নদী মধ্যে চলিতে যাইতে দেখিয়া, তাহারা অগ্নি পশ্চাৎপদ হইল, জলের উপর গমন করিতে কাহারই সাহস হইল না। তখন তাহারা নিরুপায় হইয়া নদীর তীরে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। পরে নদীর মধ্যস্থলে সকলে লক্ষ্য করিয়া দেখিল যে, তিনি সমুদ্রের জলের উপরে অটল অচলভাবে বসিয়া আছেন, আর তাঁহার চতুর্পার্শ্বে জলজন্তুগণ বেঁটন করিয়া ইলাল্লা ইলাল্লা শব্দ করিতেছে। আপনি জলজন্তুগণকে, গুণ্ডতত্ত্ব মারফৎ বিদ্যা মহাতেজঃপুঞ্জ শরীরে শিক্ষা দিতেছেন। হজরতের মারফৎ বিদ্যা শিক্ষার গুণে সাগরের প্রত্যেক মৌজা (তরঙ্গ) হইতে যেন ইলাল্লা শব্দে তোলাপাড় করিয়া ভুলিতেছে। শিষ্যগণ গুরুদেবের ঐ মোহিনী শক্তি দর্শন করিয়া, সে সময় তাহার সে মহামূর্তি দর্শন করা অবিধেয় মনে করিয়া একটু প্রচ্ছন্ন ভাবে অন্তরালে লুক্কাইত হইয়া রহিল। এদিকে বড়পীর সাহেব ধীজমদ্র (মারফৎ) জলজন্তুগণকে শিক্ষা দিতে দিতে উপসনার সময় দেখিয়া, চঞ্চলা ভাব ধারণ করিলেন, তখন সমস্ত বদনমণ্ডল নীলবর্ণ হইয়াগেল। এমন সময় একজন

সব্জা রঙ্গের স্বর্গীয় দূত আসিয়া জলের উপর বিছানা
 বিছাইয়া দিলেন, হজুর এমামতি আচার্য্যের কার্য্য সমাধা
 করিতে দণ্ডায়মান হইলেন, দলে দলে স্বর্গীয় দূতগণ
 আসিয়া পশ্চাৎভাগে সারি সারি দাঁড়াইয়া গেল । পরে
 হজরত বড়পীর সাহেব এমামতি করিবার পূর্বে শিষ্যগণের
 দিকে মুখ ফিরাইয়া তাঁহাদিগকে উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিয়া
 বলিলেন, হে শিষ্যগণ তোমরা শীঘ্র শীঘ্র সাহসে নির্ভর
 করিয়া জলের উপর নিঃসন্দেহে চলিয়া আইস এবং স্বর্গীয়
 দূতের সঙ্গে যোগদান করিয়া জামাতে নাযাজ পড়িয়া
 লও । ইহা শুনিয়া শিষ্যগণ নিঃসন্দেহে সমুদ্রে উপরে গমন
 করিয়া, জামাতে যোগদান করিলেন । হজরত বড়পীর
 সাহেব যখন এমাম হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহু আক্বার
 বলিলেন, ফেরস্তাগণ ও শব্দ করিয়া (আল্লাহু আক্বার)
 ঈশ্বর মহান বলিলেন, এমন সময় একজন জ্যোতির্মান মহা-
 পুরুষ আসিয়া দক্ষিণভাগে জামাতে যোগদান করিলেন(১) ।
 যখন সেই মহাপুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন ;
 তখন তাঁহার জ্যোতিতে আকাশ, পৃথিবী ও সমুদ্রে পর্য্যন্ত
 আলোকিত হইয়া গেল । সে সময় বড়পীর সাহেব
 আল্লাহু আক্বার ধ্বনি এমন শব্দে বলিয়াছিলেন যে,
 সমস্ত আকাশ ও পৃথিবীতে শব্দটি পৌঁছিয়াছিল । পরে

(১) সেই জ্যোতির্মান মহাপুরুষ হজরত মহাম্মদ (সঃ)

উপাসনা শেষ করিয়া, হস্ত উঠাইয়া এই দোয়া প্রার্থনা করিলেন । স্বর্গীয় দূতগণ পশ্চাৎ থাকিয়া হাত তুলিয়া, আমিন আমিন বলিতে লাগিলেন ।

বড়পীর সাহেবের আরবী প্রার্থনা ।

আল্লাহোম্মা ইন্নি আসলোকা বেহাঙ্কে

জাদি মোহান্মাদেন হাবিবেকা ও খায়রোন

মেন খালকেকা ইম্মাহো লাতাক্বিজ রুহে মুরিদি

ও মুরিদাতোল আওসিইয়াল্লা ইল্লা আলা তওবাতে ।

অর্থ ।

হে দাতা দয়াময় খোদাতায়ালা আমি তোমার নিকটে সত্যের সঙ্গে প্রার্থনা করিতেছি । মহান্মাদ সল্লাল্লাহে আলায়হেছাল্লাম তোমার বন্ধুর সাহায্যে যে সমুদয় পৃথিবীর লোকের প্রাণ তোমার অধীনে আছে, আমার সমুদয় শিষ্য এবং শিষ্যের শিষ্যগণকে আর আমার বংশ-ধরগণ ও তাঁহাদের শিষ্যগণকে ক্ষমা করিয়া দাও ; আমিন অর্থাৎ কবুল কর । মনাজাত সম্পূর্ণ হইবার পরেই দৈববাণী হইল । তোমার প্রার্থনা গ্রহণ করিলাম, যখন তোমাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি ।

বড়পীর সাহেবের ধ্যানযোগে খোদা দর্শন ।

শেখ আহাম্মাদ ফারুকি সেরহেন্দী নকসাবন্দী (রঃ)
বর্ণনা করিয়াছেন যে, একবার হজরত বড়পীর সাহেব
ধ্যানযোগে বিশ্ব ত্রক্ষাণ্ডের অধীশ্বর খোদাতায়ালাঁর সঙ্গে
সাক্ষাৎ করিলেন, তখন আদেশ হইল, হে প্রিয়বন্ধু
আব্দোল কাদের ! তুমি কি চাও ? তখন তিনি বলিলেন,
হে কৃপাময় করুণাসিন্ধু ! আপনি অনুগ্রহ করিয়া এ
দাসকে সকল বিষয়ই দান করিয়াছেন, হজরত মহাম্মদ
(সঃ) মের যে নবুওত মাধুর্য্যগুণ, আলি করমুল্যা
অজহর বেলায়েত গুণবিদ্যা, হাসিন সহিদে কাববালাঁর
সাহাদতে কবরি মৃত্যুর সহিযু ধৈর্য্যগুণ, এবং আপনাঁর
কাদরিয়েত মোহিঐশি শক্তি বহুদর্শিয় ক্ষমতা উহা
সকলই আমাকে দান করিয়াছেন । তবে আর কি যাচ্ঞা
করিব ? তখন আদেশ হইল, আর তোমাকে তিনটী
গুণ দান করিলাম । প্রথম সাধুত্ব, দ্বিতীয় দাতব্য, তৃতীয়
আশক্ত । হজরত বড়পীর সাহেব এই সকল গুণে পূর্ণ
ছিলেন বলিয়া সকল লোকের মন প্রাণ হজরত পীর
সাহেবের দিকে পড়িয়া থাকিত, যেমন আমলাতাল কাজীয়ে
নামক গ্রন্থে, শেখ আহাম্মাদ বোগদাদী লিখিয়াছেন ।

সকলের অন্তঃকরণ বড়পীর সাহেবের দিকে ।

শেখ ওমর বোজাজ বলিয়াছেন, এক সময় জোন্মার দিনে হুজরত বড়পীর সাহেব আমাদের সঙ্গে যাইয়া জামে মসজিদে জুম্মা পড়িতে পৌঁছিলেন। আমরা মসজিদে যাইয়া দেখিলাম যে, লোকে লোকালয় লক্ষ লক্ষ লোক জুম্মার উপসনা করিবার জন্ত উপস্থিত। কিন্তু আমরা যখন উপস্থিত হইলাম, কি আশ্চর্য্য একটা লোকও বড়পীর সাহেবের দিকে ফিরে তাকাইল না, সালাম করিবার যাহা প্রথা তাহাও করিল না, সম্মান সূচক করমর্দন করিতে হয়, তাহাও করিল না। তখন আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, অন্য অন্য দিন বড়পীর সাহেবের লোকে কতই সম্মান করিয়া থাকে, কিন্তু আজ কেন, কেহই হুজরত বড়পীরের প্রতি দৃষ্টিপাতও করে নাই, ইহাব কারণ কি? আমি যখন এইরূপ মনে মনে বলিতেছিলাম, তখন তিনি একবার মাত্র আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, অন্য সকল লোকের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তখন সমুদয় লোক পীর সাহেবকে সালামের উপর সালাম করিতে লাগিল এবং মোসাফা করিবার জন্ত চতুর্দিক হইতে লোকের ঠেলাঠেলি, ছড়াছড়ি, মস্ত একটা ভিড় পড়িয়া গেল; এমন কি মসজিদে আমাদের প্রবেশ করা ছুস্কর

হইয়া পড়িল । পরে নামাজ পড়িয়া, বক্তৃত্তা করিয়া সকল লোক দিগকে শুনাইয়া দিলেন । তৎপরে আমার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে ওমর ! তোমার ইচ্ছাত পূর্ণ হইয়াছে । তাহাত তুমি জান নাই যে, জগতের সমুদয় লোকের অন্তঃকরণ আল্লাহু তায়ালা আমার অধীনে রাখিয়া দিয়াছেন । ইচ্ছা হয় ত আমি সকল জগৎবাসীর মনপ্রাণ আমার দিকে আকর্ষণ করি । নহে তাঁহাদের অন্তঃকরণ অন্যদিকে ফিরাইয়া রাখি । আমি বড়পীর সাহেবের এ আশ্চর্য্য মহিমা অবগত হইয়া, কৃতাপ্রলি-পূর্ব্বক কোটি কোটি প্রণিপাত করিয়া ফিরিয়া আইলাম ।

হজরত বড়পীর সাহেবের হাঁবলি মজহাব ত্যাগ করিবার ইচ্ছা ।

খাণ্ডারকাল আখিয়ার নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, আবু মহান্নাদ সৈয়দ আব্দোল জব্বার বলিয়াছেন, হজরত বড়পীর সাহেব হাঁবলি মজহাবে ছিলেন, কিন্তু একদিন মনে মনে ইচ্ছা করিলেন, হাঁবলি মজহাব ত্যাগ করিয়া হান্ফি মজহাব গ্রহণ করিব । তিনি এইরূপ কেবল মনে মনে ধারণা করিলেন সত্য কিন্তু তখন ও পথ ত্যাগ করেন নাই । সন্ধ্যাকালে মোরাকেবায় খ্যানযোগে দেখিতে-ছেন কি, হজরত মহান্নাদ মস্তুফা (সঃ) কে এমাম

আহাম্মদ হাঁবল সাহেব, তাঁহার হস্তের একগাছি রজ্জু ধরিয়া বলিতেছেন, হে ভবপারের কাণ্ডারি রহুলে করিম (সঃ) আপনার বংশধর রজ্জুকুল চূড়ামণি আব্দোল কাদের জ্বিলানী ! আমার মজ্জহাব ত্যাগ করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, আপনি একটু বলিয়া কহিয়া, আমার মজ্জহাব ত্যাগ করিতে উহাকে নিষেধ করুন । কেননা উহার দ্বারায় আমি পরকালে সকল এমামের নিকট গৌরব করিতে পারিব । এমাম সাহেবের বিনয় বচনে, হজরত মহাম্মদ মস্তুফা (সঃ) সম্মুখে হইয়া, বড়গীব সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে বংশধর গুণমণি মহবুবে সোবহানি ! একজন মহাদর্শি লোকের অমান্য করিয়া ইহার মজ্জহাব ত্যাগ করা তোমার পক্ষে উচিত নয়, তুমি এমাম আহাম্মদ সাহেবের হাঁবলি মজ্জহাবে যেমন আছ অমনি থাকিয়া যাও । তখন হজরত বড়পীর সাহেব এমাম সাহেবকে বলিলেন, হে পূজ্যপদ পুরুষ ! আমি যতদিন জগতে জীবিত থাকিব, কখনই আপনার মজ্জহাব ত্যাগ করিয়া অন্য মজ্জহাব গ্রহণ করিব না এবং অন্তরের মধ্যেও স্থান দিব নাই ইনশাআল্লা ! আপনার মজ্জহাবেই আমাকে চিরকাল দেখিতে পাইবেন । বড়পীর সাহেবের এরূপ সংকল্প দেখিয়া, হজরত মহাম্মদ (সঃ) এমাম সাহেবকে সঙ্গে লইয়া অন্তর্ধ্যান হইয়া গেলেন । এই

ঘটনার কিছুদিন পরেই হজরত বড়পীর সাহেব পবিত্রে মক্কাধামে হজ্জ্বতে আগমন করিলেন । হজ্জ্বতে যাইয়া উপাসনা করিতে কাবাগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, কাবার চারিদিকে চাব মজহাবের চার জন এমামেব মছাল্লা বিছানা আছে । অন্য অন্য সকল এমামের দিকে শত শত লোক দণ্ডায়মান, তবে আবু হানিফার এমামের দিকে কোটী কোটী লোক সমবেশ আছে, কিন্তু হাঁবলি এমামের দিকে ছু দশজন মাত্র লোক বর্তমান । বড়পীর সাহেব যখন হাঁবলি দলভুক্ত, কাজেই তিনি সেই দিকে এমামতি করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন । তখন চারি মজহাবের লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া বড়পীর সাহেবের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িয়া লইলেন । কেবল সেই দিনেই হাঁবলির দিক লোকে পূর্ণ হইয়াছিল ।

বড়পীর সাহেবের হাঁবলি এমামের জিয়ারত ।

উক্ত খাওয়ারকাল আখিয়ার নামক গ্রন্থে, সৈয়দ আব্দোল জব্বার ও আবু মহাম্মদ রহমাতুল্যা আলায়হে দ্বয় বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমরা সাহাজাদা আলির মুখে শ্রবণ করিয়াছি । তিনি বলিলেন, একবার মহাজান পীর গুণধর মহরুবে সোবহানি হজরত এমাম আহাম্মাদ

বেন হাঁবল সাহেবের জিয়ারত করিবার মানসে তাঁহার সমাধি স্থানে উপস্থিত হন । প্রথম তাঁহার সমাধি পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিলেন, “আচ্ছালাগো আলায়কুম ইয়া এমামো” তখনই কবর বিদীর্ণ হইয়া এমাম আহাম্মাদ হাঁবল সাহেব কবর হইতে বহির্গত হইয়া, সালামের জওয়ার দিবার পরে তাঁহাব হাত ধরিয়া মোসাফা করিলেন, তৎপরে একটি পরিচ্ছদ লইয়া স্বয়ং তাঁহার অঙ্গে পরাইয়া দিলেন । পরিচ্ছদটি অঙ্গে পরাইয়া, আশীর্বাদ করিতে করিতে বলিলেন, উজ্জলকর দিন মহাম্মদী এবং শিক্ষাদাতা ও জগতের লোকে এলমে শরিয়ত, এলমে হকিকত, এলমে তরিকত ও এলমে মারফত । এই বলিয়া কবর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং বড়পীর সাহেব জেয়ারত ভক্তিদর্শন করিয়া তথা হইতে ফিরিয়া আসিলেন ।

বড়পীর সাহেব আবু হানিফার সহিত সাক্ষাৎ করেন ।

তহফাতুল আসন্ন নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ বাকায়ে কদ্দুস সেরহো হইতে বর্ণিত আছে যে, হজরত বড়পীর সাহেব স্বয়ং বলিয়াছেন, অকস্মাৎ মনে মনে এক সময় চিন্তা করিতেছিলেন, এমন কোন অদৃশ্যভাবে শূন্যে ভ্রমণকারী যত মহাপুরুষের জেয়ারত করিতে পাই,

তাহা হইলে আমার মনবাসনা পূর্ণ হয় । ইহা বলিতে বলিতেই আমাকে নিদ্রায় অচেতন করিয়া ফেলিল । সে সময় আমি সপ্নে দেখিতে পাইলাম, এমাম আহাম্মদ ইঁাবল সাহেবের সমাধিস্থলে একজন জ্যোতির্ময় মহা সাধু পুরুষ শয়ন করিয়া আছেন । আর একবার একবার তাহা হইতে শব্দ হইতেছে, দর্শন কর, দর্শন কর, ঐ আমি । যাহার সাক্ষাৎ লাভ করিবার জন্ত, তুমি আকাঙ্ক্ষা করিয়াছ ? এমন সময় নিদ্রা ভঙ্গ হইল । তাহার পর-দিনে এমাম ইঁাবলির সমাধিস্থলে যাইয়া দেখিলাম যে, একজন জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ সমাধিপার্শ্বে শয়ন করিয়া আছেন । আমার পদ শব্দ পাইবামাত্র তিনি উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া উড়িয়া চলিলেন, একটি নদীর তীরে আসিয়া আর একজন মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিল । তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই আমিও উড়িয়া গেলাম এবং উচ্চৈঃস্বরে খোদাতায়ালার সপথ দিয়া কহিলাম, সত্য করিয়া বলুন আপনি কে ? তখন তিনি বলিলেন, “হানিফান মোসলেমান” অর্থাৎ মুসলমানের সত্য পথ প্রদর্শক, এই বলিয়া তিনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন । পরে এক সময়ে হজ্জবত মহাম্মদ (সঃ) কে অদৃশ্য পুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, সমুদয় জগতেব মধ্যে ঐ একজন আবু হানিফা মরদানে স্ত্রুত অদৃশ্য

পুরুষ । যাঁহার মজহাব সত্যপথ সমস্ত পৃথিবী
ব্যাপিয়া আছে ।

রুক্ন হইতে আলোক প্রদান ।

সেফাতল আওলিয়া নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ আব্দোল্যা আহাম্মদ বেন খাজের চিশ্তি মুছালি বলিয়াছেন, একদিন তিমিরাচ্ছন্ন ঘোব অন্ধকার অমাবস্তার নিশিথ সময়, হজরত বড়পীর সাহেব আমাকে সঙ্গে লইয়া এমাম আহাম্মদ হাঁবল সাহেবের সমাধি জেয়ারত করিবার মানসে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন । পথে আসিয়া দেখি চতুর্দিক অন্ধকার, কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর হয় না, পথে কোথা কি আছে তাহাও দেখিতে পাওয়া যায় না, কোথায় যে পা পড়ে তাহারও ঠিক নাই, সে সময় রাত সাঁই সাঁই কবিতেছে, একে চতুর্দিকে পথের চারিধারের নানাপ্রকারের রুক্ন আছে, কোথায় পড়িয়া যাইব কি না, তাহারও ভাবনা । এ অবস্থায় অন্ধকারে পথ চলা কঠিন জীবিয়া, বড়পীর সাহেবকে কহিলাম, হুজুর ! আজকে জিয়ারত করিতে যাওয়া কঠিন বলিয়া বোধ হইতেছে । ভয়ানক অন্ধকার, কাছের বস্তু যে তাহাও দেখা যায় না, তাহাতে কেমন করিয়া যাওয়া যায় । তবে আলোক হস্তে থাকিলে, নিঃসন্দেহে চলিয়া যাইতাম ।

আমার মুখের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই, অমনি তিনি রুক্মদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে রুক্ম সকল ! তোমরা আলোক দান করিয়া, আমার পথ চলার কষ্ট নিবারণ কর । পীরবাক্যের কি অনির্বচনীয় শক্তি, রুক্মের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলা মাত্রেই প্রদীপের আলোর স্থায় সকল রুক্ম হইতে শত শত আলোক বাহির হইল । আমরা ক্রমাগত যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই অগ্নের রুক্ম হইতে আলোক পাইয়া সমাধিস্থলে উপস্থিত হইলাম । পরে সমাধি জেয়ারত করিয়া, ফিরিয়া আসিবার সময় ঐরূপ পরম্পর রুক্মের আলোক পাইয়া বিনা কষ্টে গৃহে ফিরিয়া আসিলাম ।

মদিনায় রসুলের সমাধি জেয়ারত ।

নেকাতাল আসরার গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ মহান্মদ ওসমান বোগদাদি রহমাতুল্যা আলায়হে হইতে বর্ণিত হইয়াছে, একবৎসর হজ্বের সময়ে, হজরত মহবুবে সোবহানি আব্দোল কাদের জ্বিলানি বড়পীর সাহেব হজ্বত সম্পূর্ণ করিবার মানসে; পবিত্র মক্কাধামে গমন করেন । তিনি হজ্বত পূর্ণ করিয়া মদিনা শরিফে আগমন করিলেন । হজরত মহান্মদ মোস্তফা (সঃ) এর সমাধিস্থলে প্রবেশ করিয়া এক মনে এক ধ্যানে ভক্তি

ভাবে জেয়ারত করিতে আরম্ভ করিলেন । অনাহারে অনিদ্রায় তন্ময়চিত্তে ভক্তিভাবে এককালিন চল্লিশ দিবস পর্যন্ত জেয়ারত ভক্তি দর্শন করিলেন । তথাপি সেখান হইতে বাহির হইল না যখন, তখন আর হজরত মহান্মদ মোস্তফা (সঃ) স্থির থাকিতে না পারিয়া কবর হইতে বহির্গত হইয়া, বড়পীর সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং তাহার হস্ত চুম্বন পূর্বক কহিলেন, যাও বৎস আব্দোল কাদের ! গৃহে ফিরিয়া যাও, দয়াময় খোদাতায়ালা তোমাব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, এই বলিয়া, কবর মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন । বড়পীর সাহেবও সেখান হইতে বোগদাদ শরিফ ফিরিয়া আইলেন ।

বড়পীর সাহেব নরকে পাপীর শাস্তি দর্শন করেন তাহার বিবরণ ।

আম্মায়ে মশায়েখ কদ্দুসাল্লাসের হুে হইতে বর্ণিত আছে, একদিন হজরত মহবুবে সোবহানি বড়পীর সাহেব (মোরাকেবায়) ধ্যানযোগে নরকে পাপীগণের ভীষণ শাস্তি দেখিতে পাইলেন । যমদূতগণ যমদণ্ড লইয়া পাপীদের নরক মধ্যে কঠিন কঠিন শাস্তি করিতেছে । পাপীগণ লোহমুদগরের প্রহার খাইয়া, মলাম, মলাম বলিয়া, যাতনায় অস্থির হইয়া ভবামক চীৎকার করিতেছে,

কেহ বা দয়াময়ের দয়া হইতে বঞ্চিত হইয়া, যন্ত্রণা, শাস্তি, ভোগ করিয়া অগ্নিদাহনে দগ্ধভূত হইতেছে ; কাহার অঙ্গে অগ্নি পরিচ্ছদ পরা, তাহা ধূধু করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে, কেহবা অগ্নি শয্যায় শয়ন করিয়া, জল জল বলিয়া আর্তনাদ করিতেছে, কাহার বা যমদূতগণ জিহ্বা কর্তন করিতেছে এবং কাহার বা শাঁড়াসি দিয়া চক্কর তারা বাহির করিয়া লইতেছে ; কেহ বা ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া রক্ত, পুঁজ, মল, মূত্র, গরম জল, পান করিতেছে ; কাহাকে বা বিছা, সর্প দংশন করিয়া বিঘের জ্বালায় অস্থির করিয়া তুলিয়াছে ; কাহারও উদর, জ্বালায় মত উচ্চ হইয়াছে, তাহা হইতে শরিন্দ্রপ, সাপ ও বিচ্ছু নির্গত হইয়া, তাহাকেই দংশন করিতেছে, কেহবা অগ্নিময় নরকানলে পড়িয়া ধূধু করিয়া জ্বলিতেছে ; কাহাকে বা হেট মুণ্ডে রাখিয়া যমদূতগণ লৌহদণ্ডে প্রহার করিয়া তাহাদের অস্থি, পাঞ্জর, চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিতেছে, সেই সকল পাণীদের চীৎকার শব্দে, পর্বত পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিতেছে।

দয়ার সাগর গীরগুণধর পাণীগণের নরক যন্ত্রণা দর্শন করিয়া, রোষ নয়নে যমরাজ নরকের কর্তাকে ডকিয়া কহিলেন, হে নরকের মালেক ! আমার কোন শিষ্য কি শিষ্যের শিষ্য, তোমার কাছে পড়িয়, নরক যন্ত্রণা ভোগ

করিতেছে । বড়পীরের কর্কশ বচনে, আরক্ত লোচনে, তীব্র দৃষ্টিতে নরকের কর্তা হাত জোড় করিয়া কহিলেন, হুজুর ! আপনার কোন শিষ্য আমার অধীনে নাই, এবং আমি এমন কোন ক্ষমতা রাখিনা যে, আপনার শিষ্যের কঠিন শাস্তি প্রদান করি । তখন তিনি মালেককে কহিলেন, সপথ সেই জগত কর্তা বিশ্বপালকের, যাঁহার আদেশে পাপীর দণ্ড, পুণ্যবানের স্বর্গস্থ ভোগ । তাঁহারই নাম লইয়া সপথ করিয়া বলিতেছি, যদি আমার কোন শিষ্য পর্বত পরিমাণ পাপ করিয়া, নরকে পড়িয়া থাকিত, নিশ্চয় তাহাকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া, স্বর্গে লইয়া যাইতাম । যে দয়াময় খোদাতায়ালা আমাকে পাপীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য সনন্দ দস্তখত লিখিয়া দিয়াছেন, তাঁহারই প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি । পরকালে কেয়ামতের দিবস আমার শিষ্য ও শিষ্যের শিষ্য এবং আমার ভক্তদিগকে যতক্ষণ না সঙ্গে লইয়া, স্বর্গে গমন করি, ততক্ষণ পর্যন্ত স্বর্গের দ্বারে পা রাখিব না । হে পাঠকগণ ! দেখুন, হজরত বড়পীর সাহেবের কতদূর ক্ষমতা ছিল । * পরকালেত তাঁহার শিষ্যের প্রতি নরকাগ্নি স্পর্শ করিতে পারিবে না, এবং পৃথিবীতেও তাঁহার ভক্তের প্রতি শাসান অগ্নিতে দগ্ধ করিতে পারে নাই ।

একপীর ভক্ত হিন্দু শ্মশান ভূমিতে অগ্নিতে দাহন হয়না তাহার বিবরণ ।

মনজর আওলিয়া নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, ছামছামল কেরামত হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, বোরহান পুরগ্রামের হিন্দু পল্লিতে একজন ধনাঢ্য হিন্দু বাস করিতেন । তিনি কোন সময় কাহার মুখে বড়পীরের প্রশংসা শুনিয়া, দিনে দিনে বড়পীর সাহেবের প্রতি তাহার এত বিশ্বাস ও ভক্তি জন্মাইতে লাগিল যে, কেহ তাহার নিকট বড়পীর সাহেবের নাম করিলে, তাহাকে ধন, রত্ন, টাকা কড়ি দিয়া সন্তোষ করিয়া বিদায় করিয়া দিতেন । কেহ বড়পীরের নাম করিয়া কিছু তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিলে, তিনি তখনই তাহাকে অর্থ দিয়া, তাহার মনোআশা পূর্ণ করিয়া দিতেন । কেহ বড়পীর সাহেবকে আনিয়া সভা সমিতির ইচ্ছা করিলে, তাঁহাকে সভা খরচের জন্য কিছু কিছু দান করিতেন । ক্রমে এসলাম ধর্মের প্রতি এমন বিশ্বাসী হইয়া উঠিল যে, মুসলমান না হইয়া আর থাকিতে পারিল না । অনেক পুত্র, পৌত্র, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, আত্মীয় স্বজন থাকার কারণে, প্রকাশ্যে এসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া, গোপনে একজন বড়পীর সাহেবের শিষ্যের নিকটে মুসলমান হইয়া, দেব দেবীর

প্রতিমা মূর্ত্তি পূজা সকলই ত্যাগ করিলেন । কেবল মাত্র প্রকাশ্যে মুসলমানদের সহিত আহার ব্যবহার উঠাবসা, সমাজ ভয়ে করিতে পারিলেন না । কিন্তু দীন ছুঃখি মুসলমান দিগকে সমাদবের সহিত আহার করাইয়া ও তাঁহাদিগকে দান খয়রাত করিতেন । যখন সেই পীর-ভক্ত ছদ্মবেশী মুসলমান পরলোক গমন করিলেন তাঁহার আত্মীয় স্বজন, ভাই বন্ধু মিলিয়া মৃত শবদেহ দাহ করিবার জন্য হিন্দু প্রথানুযায়ী শশান ভূমে লইয়া গেল । মহা-সমারোহে ধূম ধামের সহিত নিম ও চন্দন কাষ্ঠে চিতা সাজানো হইল । তাহাতে ঘৃত ঢালিয়া অগ্নি জ্বলাইয়া দিল, দেখিতে দেখিতে প্রজ্বলিত ছতাসনে সমুদয় চিতা সঞ্জিত কাষ্ঠ পুড়িয়া, ছাই ভস্ম হইয়া গেল কিন্তু সবদেহের একটু পশম পর্য্যন্ত দগ্ন হইল না, তাহা দেখিয়া, ভাই বন্ধু সকল হিন্দুগণই আশ্চর্য হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল ; যে লোক বড়পীরের প্রধান ভক্ত প্রকৃত মুসলমান, অগ্নিতে তাহার কি করিবে ? ভালবাসার ভালবাসাকে করুণাময় খোদাতায়ালা কেমন করিয়া তাহাকে অগ্নিতে দাহন করিবেন । যে হেতু পৃথিবীর অগ্নি নরকাগ্নি হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে, তবে কেমন করিয়া ভালবাসার ভালবাসাকে সেই অগ্নিতে পোড়াইবেন । যখন মহাপাণী নমরুদ হজরত এব্রাহিম আলায়হেছালামের

অঙ্গে একখানি নিজের পরিচ্ছদ পরাইয়া, তাঁহাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তখন তাঁহার নমস্কৃত পরিচ্ছদটী অঙ্গ হইতে জুলিয়া পুড়িয়া ছাই হইল । কিন্তু দয়াময় দয়া করিয়া আপন বন্ধুকে অনল হইতে বাঁচাইয়া লইলেন, বরং বন্ধুর জন্য জ্বলন্ত অনল পুষ্পোষ্ঠান করিয়া দিলেন । ধন্য দয়াময়ের বিচিত্র লীলা, ধন্য তাঁহার ভক্তের প্রতি দয়া । এদিকে হিন্দুগণ শবদেহ পুড়াইতে না পারিয়া পুনরায় কাষ্ঠ আনিয়া চিতা সাজাইয়া জ্বলাইয়া দিল । কিন্তু সে বারেও পুড়িল না, তখন নিরুপায় হইয়া স্মৃতশব নদীগর্ভে ভাসাইয়া দিল । হিন্দুগণ শবদাহ করিতে অপারক হইয়া, নদীগর্ভে যখন ভাসাইয়া দিয়া যে যাহার ঘরে চলিয়া গেল, তখন আদর্শ পীরগুণধর জানিতে পারিলেন ।

খোদাতায়ালায় কি অপার মহিমা, তিনি জগতে যাঁহাকে পীর আওলিয়া করিয়া পাঠান, তাঁহাকে নানাওণে অভিযুক্ত করিয়া দেন । তাঁহার মন প্রাণ অস্তঃকরণ আদর্শ দর্পণের ন্যায় জাজ্বল্যমান হইয়া পড়ে । যিনি ভক্তবৎসল, তিনি কখন প্রিয় ভক্তকে জুলিয়া একদণ্ড নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারেন না । যখন স্মৃত শব নদীর স্রোতে পড়িয়া ভাসিয়া যায়, তখন হজরত বড়পীর সাহেব একজন দরবেসকে ডাকিয়া বলিলেন, হে দরবেস !

আজ আমার একটি প্রধান ভক্তের সদগতি হয় না, নদী-
 স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে । তাঁহার প্রকৃত বৃত্তান্ত
 তোমাকে অবগত করাইতেছি । বরহান পুরের যে ধনাঢ্য-
 শালী দাতা হিন্দু লোকটি মারা পড়িয়াছে, তিনি আমার
 পরম ভক্ত, তিনি গোপনে আমার একজন শিষ্যের কাছে
 মুসলমান হইয়াছিল, উহার এমলামী নাম সাইদালা,
 হিন্দুগণ তাঁহাকে তাহাদের প্রথানুযায়ী শ্মশানে পুড়াইতে
 যায়, কোন প্রকারে তাঁহাকে জ্বলাইতে না পারিয়া,
 শেষে নিরুপায় হইয়া নদীতে ভাসাইয়া দিয়াছে । তুমি
 এখন লোকজন সঙ্গে লইয়া, নদী হইতে তীরে তুলিয়া
 তাঁহার জানাজা পড়িয়া কবর দিয়া আসিবে । দরবেস
 পীর আজ প্রতিপালন কবিত্তে, তথাস্থ বলিয়া গমন
 করিলেন, শবদেহ নদী হইতে তুলিয়া সাইদালাকে কবর
 দিয়া সকলেই ফিরিয়া আইল । পরে সেই দরবেসটি
 বড় পীরের কাছে নিবেদন করিলেন, হুজুব ! সাইদালা
 এমন কি পুণ্যাহু করিয়াছিল যে, তজ্জন্য জ্বলন্ত অনলে
 উহার কিছুই পুড়িল না । তখন তিনি কহিলেন, হে
 দরবেস ! তুমি ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব বোধ হয় জান না,
 আচ্ছা, এখন তাহা তোমাকে শুনাইতেছি । যিনি
 নিরাকার নিরঞ্জন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর ! তাঁহার
 কৃপাশ্রমে পরকালে মহামহা পাণী মুক্তিলাভ করিয়া অক্ষয়

স্বর্গ লাভ করিবেন, সেই দাতা দয়াময় দয়া করিয়া আমার সহিত সত্য করিয়াছেন যে, তোমার শিষ্য বা ভক্তগণ বিশ্বাসী হইয়া যদি মৃত্যু হয় ইহকালে ও পরকালে কোন প্রকারেই তাঁহাকে অগ্নিতে দাহন করিতে পারিবে না । তবে কেমন করিয়া, হিন্দুগণ সায়দালাকে অগ্নি দিয়া জ্বলাইতে পারিবে । হে পাঠকগণ ! বুঝিয়া দেখ, ষাঁহার ভক্তকে এই ধরাতলে অগ্নিতে পুড়াইতে পারিল না, তবে কেমন করিয়া নরকাগ্নি পরকালে তাঁহার শিষ্য বা ভক্ত দিগকে জ্বলন্ত অনল স্পর্শ করিবে । আরও ভাবিয়া দেখ, যখন একজন ছদ্মবেশী মুসলমানকে অগ্নিতে জ্বলাইতে অপারক, তখন প্রকৃত বিশ্বাসী মুসলমান বড় পীর সাহেবের সঠিক ভক্তকে, নরকাগ্নি তাঁহার কি করিবে । হে পাঠক পাঠিকাগণ ! এখন সেই বড়পীর সাহেবের জীবনী ভক্তির সহিত পাঠ করিয়া নরকানল হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা কর ।

ত্রিপদ ।

কি ভয় তাঁহার, জগতে ষাঁহার, সখা হয় বড়পীর ।
নরক অনল, নিভিবে সকল, যদি মন থাকে স্থির ॥

মহর্ষি নেজামদ্দিন জরিজরবখ্‌সের সোলতানাল মসায়েখ নাম প্রাপ্ত।

আসরার সালেকিন ও মজলেস রোবাই আশার নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ ফরিউদ্দিন গজেসকর রহমাতুল্যা আলায়হে হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে; হজরত মহবুবে সোবহানি বড়পীর সাহেব, এক সময় হজ্জতে গমন করিয়া, মদিনা শরিফে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। এদিকে হজরত নেজামদ্দিন খাযি প্রবর কাযা শরিফে জুম্মা পড়িবার জন্ত প্রতি শুক্রবারে দিল্লি হইতে পবিত্র মক্কায় আসিতেন। যখন হজরত নেজামদ্দিন (রঃ) স্বাভাবিক নিয়মানুসারে মক্কায় জুম্মা পড়িতে আইলেন, আদর্শ পীরগুণধর তাহা জানিতে পারিয়া একটা পত্র লিখিয়া তৃত্যের হস্তে পাঠাইয়া দিলেন। এদিকে তিনিও মদিনা আসিতে-ছিলেন, পথিমধ্যে বড়পীরের পত্র পাঠিয়া, সন্তোষ ছদয়ে এক সঙ্গেই দুইজন মিলিয়া তাঁহার আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলেন। হজরত নেজামদ্দিন পীর চরণে চুম্বনদান করিয়া কহিলেন, হুজুব! আমি এখানে আসিয়াছি আপনি তাহা কেমন করিয়া জানিতে পারিলেন এবং কি জন্তই বা এ দাসকে আহ্বান করিয়াছেন? তখন তিনি বলিলেন, নেজামদ্দিন! তোমাকে সোলতান উপাধি

দান করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছি । আজ হইতে তোমার নাম নেজামদ্দিন সোলতানল মশাএখ হইল ! এস, আমার কাছে সরিয়া আইস । তোমার সঙ্গে গীর পরিচ্ছদ পরাইয়া দিই । এই বলিয়া পরিচ্ছদ খানি তাঁহার সঙ্গে পরাইয়া দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন । হজরত নেজামদ্দিন মনের মতন বস্ত্রদ্বয় প্রাপ্ত হইয়া, মহানন্দে দিল্লি ফিরিয়া আইলেন । এই সাধুপুরুষের অতিথি শালায় লোকের অন্ন ব্যঞ্জনের জন্য প্রত্যহ সতের-ম্ন লবন ব্যয় হইত এবং প্রত্যহ একটী উষ্ট্রে সপ্তদশবার পিয়াজ রন্ধনের খোঁটা বহিয়া ফেলিত । এই সাধু প্রবরের সমাধি স্থান পুরাতন দিল্লি, যদি কেহ ইহার সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইতে চান, ইহার জীবনী পাঠ করিলেই জ্ঞাত হইবেন । •

বড়পীর সাহেবের মাধুর্য্য ভাষায় এসলাম
ধর্ম প্রচার ও চারিজন সহচর সহ
শেষ নবী হজরত মহাম্মদের
সেই সভায় আগমন ।

একদিন বড়পীর সাহেব হর্ষ উৎফুল্ল চিত্তে প্রশান্তমনে মাধুর্য্য ভাষায় মিন্বরে বসিয়া এসলাম ধর্ম প্রচার করিতে

লাগিলেন । প্রায় লক্ষ লক্ষ লোক সভায় যোগদান করিয়াছিলেন, তিনি প্রথমেই বক্তৃতা করিয়া বলিলেন, হে মোসুলেমগণ ! তোমরা অদ্বিতীয় নিরাকার মিরঞ্জনের প্রতি ও তাঁহার শেষ নবি প্রেরিত পুরুষ প্রভু মহান্মদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর । যে খোদাতায়ালায় কৃপায় মানব দেহ ও বাকশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহারি প্রেমে মন, প্রাণ সমর্পণ করিয়া কায়মন বাক্যে তাঁহারই উপাসনা, অর্চনা, স্তব—স্তুতি ও তপশ্চা করিতে করিতে এ জীবন অতিবাহিত করিয়া অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্ত হওয়া যায় । আর সেই সত্য ধর্ম প্রচারক মহাত্মা প্রভু মহান্মদ (সঃ) যঁহার অনুগ্রহে সত্য সনাতন এসলাম ধর্ম প্রাপ্ত হইয়া সর্ব শক্তিমান . খোদাতায়ালাকে চিনিতে পারিয়াছে, যিনি পাপের অন্ধকার ময় কলুষকূপ হইতে উদ্ধার করিয়া, তোমাঙ্গিকে স্বর্গলোকে লইয়া যাইবেন, যিনি ভবান্নবের কাণ্ডারি, যঁহার ধর্মে ইহকালে শান্তি, পরকালে মুক্তি, তাঁহার উপরে তোমরা শুদ্ধ মনে সরল অন্তরে দরুদ পাঠকর । শেখ বেকার রহমাতুল্যা আলায়হে বলিয়াছেন, আমিও উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলাম, অকস্মাৎ হজরত বড়পীর সাহেব ওয়াজ করিতে করিতে নিঃশব্দ হইয়া গেলেন । তৎপরে তিনি মিস্বর হইতে নিম্নে নাবিয়া, সেই মিস্বরোপরে ফরশ বিছাইয়া দিলেন ; সে সময়

দেখিতে পাইলাম যে, হজরত মহাম্মদ (সঃ) জ্যোতির্ময় রূপে প্রধান চারিজন সহচর সঙ্গে সভায় উপস্থিত হইয়া মিস্বর উপরে বসিলেন । পরে হজরত বড়পীর সাহেব নিম্নে দাঁড়াইয়া এমন ভেজঃপুঞ্জ শরীরে উপদেশ দান করিলেন যে, নিজেই জ্ঞান হারাইয়া ভুতলে পড়িয়া গেলেন । তখন হজরত মহাম্মদ (সঃ) তাঁহাকে উঠাইয়া সহচর সহ সভা হইতে অদৃশ্য হইয়া চলিয়া গেলেন । শ্রোতাগণ সেই সময় নিবেদন করিল, হুজুর ! ওয়াজ করিতে করিতে মিস্বর হইতে নাবিয়া পড়িলেন কেন, কেনই বা পুনরায় অট্টোচ হইয়া পড়িলেন ? তখন তিনি সমুদয় ঘটনা আমাকে বর্ণনা করিতে আদেশ করিলেন । আমিও গীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, বলিতে আরম্ভ করিলাম, যে রূপে হজরত মহাম্মদ (সঃ) আবু বকার, ওমর, ওসমান, আলি করমুল্যা অজহ সহ সভায় আসিয়াছিলেন এবং যাহা যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা একে একে সমুদয় শুনাইয়া দিলাম । সেইদিন শ্রোতাগণে "পরম সৌভাগ্য লাভ করিয়া, যে যাহার গৃহমধ্যে চলিয়া গেল ।

সাধুদিগের পীর পদ স্কন্ধে ধারণ ।

একদিন হজরত বড়পীরের সভায় প্রায় সপ্ত সহস্র শ্রোতাগণ উপস্থিত ছিল । তিনিও উপদেশ দিবার

উপযুক্ত সময় বুঝিয়া, মিস্ত্রর উপরে আরোহণ করত, স্মিফট বা মাধুর্য ভাষায় জলদ গম্ভীর স্বরে এই বলিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন, হে শ্রোতাগণ ! তোমাদিগের সৃজন কর্তা বিশ্বপালক জগদীশ্বর বলিতেছেন, তোমরা কখনই জীবিকার জন্য চিন্তা করিও না, যে হেতু আমার ভাণ্ডারে ধন রত্ন ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ আছে, প্রলয়কাল পর্য্যন্তও পূর্ণ থাকিবে, ইহা হইতে ধন রত্ন দান করিয়া ভিখারীকে ধনবান করি, রাজ ভাণ্ডার পূর্ণ করি, এইরূপ প্রকারে সৃষ্টিকাল হইতে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত বিতরণ করিয়া আসিতেছি এবং আরও বিতরণ করিব, তথাপি আমার ভাণ্ডার কখন শূন্য হইবে না । দ্বিতীয় তোমরা অত্যাচারী প্রবল-প্রতাপ পবাক্রমশালী রাজাধিরাজ, নবাব জমিদার-দিগকে ভয় করিও না যে হেতু আমি সর্বস্থানে সর্ব সময় বর্তমান এবং সকলেরই আগমন আমার দিকে, আমিই সকলের বিচারক বা শাসন কর্তা শাস্তি দাতা । তৃতীয় তোমরা কাহার সঙ্গে বন্ধুতা করিও না ও কাহার নিকট প্রার্থিত হইও না, যেহেতু আমি তোমাদের পরম বন্ধু, দাতা দয়াময় নাম ধরি, সকল জীবগণকে পালন করিয়া থাকি এবং সর্বাপেক্ষা দান করিয়া সকলের প্রার্থনা পূর্ণ করি । চতুর্থ সকল বস্তু তোমাদের উপকারের জন্য সৃজন করিয়াছি, কেবল তোমাদিগকে আমার

উপাসনা, অর্চনা, আরাধনা করিবার জন্য সৃষ্টি করিলাম ।
 প্রথম, আমি তোমাদিগকে কল্যের বা আগতদিনের তরে,
 আমার অর্চনা উপাসনা করিতে আদেশ করিনাই এবং
 তোমারাও আমার নিকট আগে জীবনের কল্যের জন্য,
 জীবিকা চাহিও না । যষ্ঠ, চন্দ্র সূর্য্য, নক্ষত্র, আকাশ,
 পৃথিবী, বন, জঙ্গল, নদ, নদী, সাগর, সলিল, পর্বত,
 পাহাড়, দেব, দৈত্য, দানব, মানব, পশু, পক্ষি ইত্যাদি
 সৃষ্টি করিতে আমি কষ্ট বোধ করিনা, স্তরায় তোমা-
 দিগকেও জীবিকা দান করিতে তিলার্কিও কষ্ট বোধ করিনা ।
 সপ্তম, আমি তোমাদের জীবিকা দিবার কথা একদণ্ডও
 ভুলিনা, তোমারাও আমার নাম সহিতে কখনও বিস্মরণ
 হইও না । অষ্টম, আমি যাহা তোমাদের অদৃষ্টে
 ধার্য্য করিয়া দিয়াছি, তাহাতে তোমরা সন্তুষ্ট থাকিও ।
 কিন্তু কু-প্রবৃত্তির উত্তেজনায় বেশী আকাঙ্ক্ষা করিও না ।
 নবম, আমি জগত পালক খোদাতায়ালা যখন তোমাদের
 পরম বন্ধু, তখন তোমারাও আমার প্রকৃত বন্ধু হইবার
 চেষ্টা কর । দশম, তোমরা সকলেই আমার শাস্তি
 হইতে নির্ভয় হইয়া নিশ্চিত্ত মনে থাকিও না ; যতক্ষণ
 পর্য্যন্ত সুমুর্ কালের, কবরের, উত্থাপন দিনের ও
 বিচার দিবসের শাস্তি হইতে রক্ষা না পাও এবং পরীক্ষার
 সেতু পার হইয়া স্বর্গগামী না হও । এইরূপে বড়পীর

দশটি উপদেশ দান করিয়া পুনরায় বলিলেন, “লাও লাকালেমা খালাফতোল আফলাকে” যে সময় হজরত মহান্মদ মস্তফা (সঃ) মেয়ারাজ শরিফ পৌঁছিলেন, এবং আরশে উপস্থিত হইবার ইচ্ছা করিলেন, সে সময় আমি পরমাত্মা রূপে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম, আমার স্কন্ধে পদদিয়া আরশের পবিত্র সিংহাসনে উপবেশন করুন, তখন তিনি আমাব স্কন্ধে পা রাখিয়া আরশের উপর আরোহণ করিলেন । পরে তিনি খোদাতায়াল্লাকে বলিলেন, হে জগৎ পতি ! এ কোন মহাত্মা, আমার চরণ দুখানি স্বয়ত্তে স্কন্ধে ধরিয়া আরশে আরোহণ করাইলেন ? তখন দয়াময় আপন বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, এ তোমাবই পবিত্র বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমারই প্রচারিত এসলাম ধর্মকে নববলে বলিয়ান করিবেন । তখন তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে মহিউদ্দিন ! আমার চরণ যেমন তোমার স্কন্ধে স্থান পাইল, তেমনি তোমার ঐ পবিত্র চরণ জগতের সাধুগণের স্কন্ধে স্থান পাইবে । হে শ্রোতাগণ ! সেই জন্ম আজ আমি এই সভামধ্যে আমাব পবিত্র চরণের গৌরব করিতেছি । এই বলিয়া বড়পীর সাহেব, এই আরবী বচনটা পাঠ করিলেন ।

আরবী শব্দ ।

“কাদানি হাজেহী আলা বাকাবাতে
কোল্লৈ ওলিইয়ে আল্লাহে ।

অর্থাৎ আগার চরণ সমুদয় সাধুপুণ্ডের ক্ষক্ষে ; সেই সভাতে পঞ্চাশ জন সাধু ছিল, তখন তাঁহারা সকলেই আপন আপন ক্ষক্ষ মিস্বরের নিম্নে বুকাইয়া দিয়া, একত্রিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন ;—

“আমাম্মা ওা ছাদাকনা” সত্য সত্যই আপনার পবিত্র চরণ জগতের সমুদয় সাধুপুরুষগণের ক্ষক্ষে স্থান পাইবে । তখন হজরত বড়পীর সাহেব সকল তপসগণের ক্ষক্ষেই চরণ ধারণ করিয়াছিলেন । এমন কি সে সময় জগতের সাধু যে যেখানে ছিলেন সে সেইখানেই ক্ষক্ষ পাতিয়া দিয়াছিলেন, বড়পীর সাহেবও মোহিঐশী শক্তিবলে সকলের ক্ষক্ষে পা রাখিয়া সকল সাধুগণকেই ধন্য করিলেন । লাতায়েফ গারায়েব গ্রন্থে লিখিত আছে, সে সময় চতুর্বিংশতি বয়স্ক চিশ্তি তরিকার প্রধান পীর খাজা মইনদ্দিন চিশ্তি সাধুপ্রবর, এরাক পর্বতে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তিনিও আপন ক্ষক্ষ পাতিয়া দিলেন । কিন্তু সেই সভাস্থিত এসফাহান নিবাসী মদগর্ভিত এক সাধুপুরুষ, অহঙ্কার করিয়া মনে মনে বলিলেন, উনিও

একজন সাধু, আমিও একজন সাধুপুরুষ, তবে কি জন্ম
 হীনতা স্বীকার করিয়া উহাব পা আমাব স্কন্ধে ধারণ
 করিব । এই বলিয়া গর্বিত সাধু কু-প্রবৃত্তির কুইকে
 পড়িয়া, আপন ঘাড় না বাড়াইয়া অহঙ্কার বশত, বসিয়া
 রহিল । আদর্শ পীর গুণধর তাহা জানিতে পারিলেন,
 অহঙ্কারি তপস্বীর সেই সভায় তদেওই তাহাব গুণ্ড ও
 প্রকাশ্য বিদ্যা, পীরি ও ফকিবী বিনাশ পাইল । অতএব
 খোদাতায়ালা যাঁহার সম্মান বাড়াইয়া দেয়, তাঁহার
 অসম্মান করিয়া কে কোথায় রক্ষা পাইয় থাকে । যেমন
 পারস্য ভাষায় একটা কবিতা লেখা আছে ।

বয়েত ।

নাম নেকা রফৎগাঁ যায়ে মাকুন ।

তব্বেবা মানাদ নাম নেকতো পায়েরদার ॥

অর্থ ।

স্বজনের নাম লোপ না কর কখন ।

তবে নাম তব্ জগতে রহিবে স্বজন ॥

বিনা ওজুতে বড়পীর সাহেবের নাম

লইলে জিহ্বা কাটা যায় ।

শায়ে নছুছ নামক গছে লিখিত আছে দাউদ কিছরি

(রঃ) বলিয়াছেন, যিনি ওজুর সঙ্গে পবিত্র হইয়া হজরত মহবুবে সোবহানি আব্দোল কাদের জ্বিলানী বলিয়া বড়পীর সাহেবের নাম লইতেন তিনি সমস্ত দিবস সুখে থাকিতেন। আর যিনি বিনা ওজু অপবিত্র হইয়া ঐ নাম লইত তাহার জিহ্বা কর্তন হইয়া পড়িয়া যাইত। আর মনাকবে গোঁশিয়ে নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, হজরত মহবুবে সোবহানির নামাঙ্কিত “দোঁতা সায়ফাল্লা” তাঁহার বংশধর, প্রায়ই সন্ধ্যা সকাল পড়িয়া আসিতে ছিলেন। ক্রমাগত অনেক লোক তাহা শিক্ষা করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু অনেক লোক কয়েক শতাব্দী পবে আলস্য করিয়া বিনা ওজুতে জন্মবাস্থায় অপবিত্র অশুদ্ধ হৃদয়ে সেই দোঁতাটা যঁহার পড়িত, তাঁহাদের মস্তক বিচ্ছিন্ন হইয়া তখনই মৃত্যুমুখে পতিত হইত। এইরূপ শত শত লোকের যখন জিহ্বা ও মস্তক কাটিয়া মারা পড়িতে লাগিল, তখন হজরত মহাম্মদ মস্তফা (সঃ) বড়পীর সাহেবকে আদিয়া বলিলেন, হে আব্দোল কাদের ! তোমার একি অন্যায় জ্বালানী ফায়েজ অর্থাৎ জলন্ত ক্রোধময় শক্তি ! কত শত লোক তোমার দোঁতা ও নাম লইতে গিয়া জিহ্বা ও মস্তক কাটা যাইয়া অকালে প্রাণ হারাইয়া বসিতেছে। দেখ ! যিনি জগৎপালক সৃষ্টিকর্তা, তাঁহার নাম বিনা ওজুতে

অপবিত্র থাকতে শত সহস্রবার লইলেও কাহারও মস্তক কাটা যায় না। তুমি এখন এ সংকল্প ত্যাগ করিয়া ভক্তদের প্রতি শান্তিময় ভাব দেখাও। হজরত পয়গম্বরের কথায় লজ্জিত হইয়া, নিজের ভ্রম বুঝিয়া সে প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিয়া কহিলেন, হে ভবপারের কাণ্ডারি দয়ার সাগর রহমাতুল্লেল আলামিন! আমি আপনার কথায়, আমার তেজস্বয় মহাশক্তি আকর্ষণ করিয়া লইলাম, আর কাহার কখন মস্তক বা জিহ্বা কাটা যাইবেক না; তবে যাহারা বিনা ওজুতে অপবিত্র ভাবে আমার নাম লইবে, তাহাদের পৃথিবীতে কখনই উন্নতি হইবে না, তাহাদিগকে নানা কষ্টে দিনপাত করিতে হইবে।

হজরত বড়পীর সাহেবের গুণের ব্যাখ্যা ।

মালাফুজ কোতোবল আবরার নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, সাহেবদিন (রঃ) বলিয়াছেন, রছুলের বাদে অন্য অন্য সহচর হইতে, তিনজন সাধুপুরুষের মাস্ত বেনী হইতেছে, প্রথম সাধু ওয়েস করনি দ্বিতীয় সাধু শেখ জনিদ বোগদাদি, তৃতীয় সাধু হজরত বহুলুদাননা। আর এই তিন সাধু হইতেও উচ্চ পদ বা সম্মানীত হজরত বড়পীর সাহেব, কেননা ইনি সকল সাধুর সত্রাট। জগতে প্রায়কাল পর্যন্ত এমন সর্বগুণময় সাধু কেহই

জমাগ্রহণ করেন নাই, এবং করিবেনও না। যাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতাওনে সমুদয় জগৎবাসী মুগ্ধ হইয়াছিল। যাঁহার বুদ্ধির তেজ অতি শ্রবল। কেননা শেষ প্রেরিত পুরুষ বড়পীর সাহেবের দ্বারায় সর্বদা গৌরব করিয়া বলিতেন, বনিএশ্রাইল বংশের অন্য অন্য প্রেরিত পুরুষ হইতে, আমার উন্মত্ত মণ্ডলীর গৌরব অপেক্ষা অধিক বেশি। এই কথা সিদ্ধান্তের জন্য শেষ প্রেরিত পুরুষ মেয়ারাজ গমন করিলেন, সকল প্রেরিত পুরুষগণ একত্রে হইয়া হজরত মহান্মদ মশুফা (সঃ) কে বলিলেন, আপনি যে আপনার মণ্ডলীগণের সর্বদাই গৌরব করিয়া থাকেন, তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত আজ আমরা দেখিতে চাই। তখন হজরত শেষ প্রেরিত নবি অন্য উপায় না দেখিয়া বড়পীর সাহেবের পরমাত্মাকে আহ্বান করিয়া ছিলেন। আত্মারূপী বড়পীর সাহেব প্রেরিত পুরুষ-দিগের নিকটে যাইয়া সালাম করাতে, হজরত মুসা কলিম, তাঁহার সালামের জওয়াব দিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, হে উন্মত্তে মহান্মদি! তোমার নাম কি? তখন তিনি বলিলেন, আমার নাম আব্দোল কাণের, পিতার নাম সৈয়দ আবু শালেহু, পিতামহের নাম সৈয়দ মহান্মদ, তাঁহার পিতার নাম, সৈয়দ আবু আবদোল্লাহু এইরূপ প্রকারে সমস্ত পিতৃপুরুষগণের নাম বলিতে বলিতে আলি

করমূল্য। অজহু ও হজরত কাতেমা খাতুনের নাম পর্য্যন্ত বলিয়া দিলেন । তখন মুসা আলায়হেছাল্লাম বলিলেন, তোমাকে, তোমার নাম মাত্র জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাতে তোমার পিতৃপুরুষগণের পরিচয়? দিবার কি আবশ্যিক ছিল। আত্মারূপী বড়গীর সাহেব বলিলেন, মহাত্মন! আপনি যেখন কহতুর পর্বতে গিয়াছিলেন, তখন আপনাকে করুণাময় অন্তর্যামী বিশ্বপালক, কেবল মাত্র বলিয়াছিলেন মুসা! তোমার দক্ষিণ হস্তে ওটা কি? তখন আপনি বলিয়াছিলেন এটা আমার হস্তের একটা যষ্টি; ইহার দ্বারায় পশু চরাই, ইহাতে ঠেক দিয়া, ভর করিয়া থাকি, ছাগলের জন্য বৃক্ষের পত্র খাওয়াই এবং ইহার দ্বারায় আমার আরও অন্য অন্য কার্য্য হইয়া থাকে। তবে, কেন আপনি অন্তর্যামী খোদাতায়ালাকে এতগুলি পরিচয় দিয়াছিলেন, (১) তিনি ও অন্তর্যামী আপনার মনের ভাব অন্তরের ভাব সকলই জ্ঞাত আছেন। আপনি যে যষ্টির ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, আপনার সেই যষ্টির যে গুণ তাহা ও খোদাতায়ালাই দিয়াছিলেন। তবে কি আপনার সে কথা বলা ভ্রম নয়? আমি আপনার পূর্বের ভ্রম সংশোধন করিবার জন্য আমার পিতৃপুরুষগণের পরিচয় দিয়াছি, কেননা

(১) সূরা তোহা ।

যেহেতু আপনি একজন মানব মাত্র । একথা শুনিয়া মুসা নবি বলিলেন, হে শেষ প্রেরিত নবি ! সত্য সত্যই আপনার উম্মতের গৌরব অধিক । হজরত বড়পীর সাহেব প্রেরিত পুরুষগণের তুল্য কি জন্য জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা শেখ কামালদ্দিন বর্ণনা করিয়াছেন ।

লাতায়ফ লতিফ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ কামালদ্দিন (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে ; যখন মানব, দানব, দেব, দৈত্য প্রাণী ব্যতীত অন্য কিছু সৃষ্টি হয় না, এ পৃথিবী জনশূন্য নীরব নিঃশব্দ কাহারও কোথায় চিহ্ন মাত্রই নাই । কেবল অনাদি অনন্তময় বিশ্বপালক সৃষ্টি কর্তা নিজ মহিমা প্রচার করিবার জন্য, মানবগণের আত্মা সকল সৃষ্টি করিয়া, তিন সারি করিয়া দাঁড় করাইয়া ছিলেন । প্রথম কাতারে প্রেরিত পুরুষগণের পরমাত্মা, দ্বিতীয় কাতারে সাধুপুরুষগণের পরমাত্মা, তৃতীয় কাতারে সমুদয় মানবের আত্মা । এইরূপে আত্মা সকলকে যখন দাঁড় করিয়াছিলেন । সে সময় স্বর্গীয় দূতে বড়পীর সাহেবকে মধ্যম কাতারে সাধুগণের সঙ্গে দাঁড় করাইয়া ছিলেন । কিন্তু বড়পীর সাহেবের আত্মা মধ্যম কাতারে না দাঁড়াইয়া, প্রথম কাতারে প্রেরিত পুরুষগণের সঙ্গে গিয়া দাঁড়াইলেন । তখন স্বর্গীয় দূত তাঁহাকে সেখান হইতে তাড়াইয়া, সাধুদের সঙ্গে মধ্যম কাতারে দাঁড়

করাইয়া দিলেন । পুনর্বার তিনি প্রথম কাতারে গিয়া পয়গম্বরগণের সহিত যোগ দিলেন । আবার ফেরাইল । এইরূপ বারবার পাঁচ ছয় বার পাল্টা পাল্টী করাতে, স্বর্গীয় দূত বিরক্ত হইয়া দয়াময় সৃষ্টিকর্তাকে জানাইলেন । তখন করুণাময় জগদীশ্বর হজরত মহাম্মদকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে মহাম্মদ (সঃ) ! তুমি তোমার বংশধর আব্দোল কাদেরকে মধ্যম কাতারে স্থির হইতে বল । তবে উনি প্রলয়কালের শেষ বিচারের দিনে, প্রথম কাতারে তোমাদের সঙ্গে থাকিতে স্থান পাইবে । হজরত মহাম্মদ (সঃ) বলিলেন, হে আমার বংশের ধ্রুব নক্ষত্র পূর্ণময় জ্যোতিঃ ! পয়গম্বরী যখন আমা হইতেই শেষ, আমার পশ্চাতে আর কেহই প্রেরিত পুরাষ হইবে না, তখন তুমি কেমন করিয়া প্রথম কাতারে, আমাদের সঙ্গে স্থান পাইবে । এখন যাও, খোদাতায়ালায় আদেশ মাগ্য করিয়া মধ্যম কাতারে সাধুদিগের সহিত দাঁড়াও । তবে আমি সত্য করিতেছি প্রলয়কালের শেষে বিচার দিবসে সকলের প্রথম কাতারে আমার দক্ষিণ ভাগের পহ্লুর নিম্নে মকাম মহম্মদ নামক উত্তম স্থানে তুমি থাকিতে পাইবে । হজরত বড়পীর সাহেব সৃজনকালে পয়গম্বরগণের সঙ্গে লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জগতে তিনি সর্বগুণে গুণময় হইয়াছিলেন ।

বড়পীরের নিকট পৃথিবীর চাতুরি করিবার বিবরণ ।

এল্‌তাবাসাল আনওয়ার নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, আবু আব্দোল্যা মহাম্মদ আপন পিতার মুখে শ্রবণ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ; হজরত গীর দস্তগীর মহবুবে সোবহানি আব্দোল কাদের জ্বিলানী দয়া, দান, দাক্ষিণ্য, বিনয়, সৌজন্য, সদালাপ, মিষ্টিভাষা, ধৈর্য্য-সহিষ্ণুতা, পরোপকারিতা প্রভৃতি সকলপ্রকার সদগুণে বিভূষিত ছিলেন । তাঁহার আদর্শভাব, কেয়ামত দর্শনে লোকে বিমোহিত হইত । নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিচক্ষণ পীরি ফকিরী গুণে, লোকের মন কাড়িয়া লইতেন । কেহ তাঁহার প্রতি অন্যায় আচরণ করিলে, তাঁহার প্রতিশোধ লইতে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতেন না, বরং ক্ষমতাগুণের দ্বারা নিজের মহত্ত্ব ও ক্ষমাশীলতার অতি আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত দেখাইতেন । অতি ভয়ানক মহা পরাজয়শালী শত্রুকে দাঁয়ে পাইলেও, তাহাকে ছাড়িয়া দিতেন । নিরাশ্রয় ব্যক্তি বিপদে পড়িয়া স্মরণাগত হইলে তাহাকে প্রাণপণ চেষ্টায় বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেন । ভক্ত ও শিষ্যগণে তাঁহার আদেশ পাইবামাত্রই সম্পূর্ণ করিয়া দিতেন । তিনি কোন কার্য্যে কাহারও সাহায্য লইতেন না এবং কাহার

নিকট কোন বস্তু যাচঞা করিতেন না। কখন তিনি ধনাঢ্য কি আমিব কি বাদসা কি উজির দিগের সম্মানের জন্য খাড়া হইয়া দাঁড়াইতেন না, তাঁহাদের প্রতি অত্যন্ত ভক্তি সমাদর করিতেন না এবং তাঁহাদের সভায় বসি উঠা করিতেও ভাল বাসিতেন না। রাজাধিরাজ বাদসাদিগের ঐশ্বর্য দেখিয়া কখনই দুঃখিত হইতেন না এবং তাঁহাদের দর্প, ভেজ ও প্রতাপ দেখিয়া ভয়াকুর হইয়া পড়িতেন না। কোন বাদসা কি উজির দেখা করিতে আসিলে হটাৎ তাঁহাদিগকে দেখা দিতেন না, যদি ভবিষ্যতে দেখা হইত তাঁহাদিগকে রাজনীতি শিক্ষা দিয়া বিদায় করিয়া দিতেন। কখন অর্থশালী কি ধনবান বাদসালোকের মনরাখা কথা বলিতেন না এবং তাঁহাদের অর্থ সাহায্যের প্রত্যাশা করিতেন না। কখন ধনবান, অর্থশালী, আমিব, উজির, বাদসার পুরস্কার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইতেন না। কোন লোক কোন সময়ে তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইয়া কুপথগামী করিতে পারিতেন না। কখনই করুণাময় খোদাতায়ালাকে বিশ্বরণ হইয়া পৃথিবীর মায়াঘোরে আশক্ত হন নাই। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, আমার যুবকালে একদিন পথে যাইতে যাইতে একটি যুবতীকে দেখিতে পাইলাম, সেই মায়াবিনী আগাব দিকে চাহিয়া ফিক করিয়া হাসিয়া

উঠিল। আমি মস্তক হেঁট করিয়া চলিয়া আইলাম, আমার উপাসনামায়ে আসিয়া দেখি যে একটি পরম-সুন্দরী সঞ্জাল মুক্ত করিতেছে ! পরদিন প্রাতঃকালে আমার মাদরাসায় যাইয়া দেখি, সেই মায়াবিনী রমণী ঘাট দিতেছে ; তখন তাহাকে বলিলাম, রে মায়াবিনী তুই কে ? সে কহিল, আমি পৃথিবী, তোমাকে ভুলাইবার জন্য প্রত্যহ বেশ পরিবর্তন করিয়া থাকি। তখন তাহাকে বলিলাম, ছরহু, পাগীরসী ! সেই দিন হইতে মায়াবী পৃথিবী আমার নিকটে আসিতে আর সাহস পাইল না ।

বড়পীর সাহেবের পরিচ্ছদের বিবরণ ।

সেরাল আরকিম নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, অখতুম আশরফ জাহান বলিয়াছেন, হজরত মহবুবে সোবহানি সময়ে সময়ে শত শত কৃতদাস ক্রয় করিয়া তাহাদিগকে বিনাকারণে মুক্তিদান করত, শুণ্ডতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া, সাধু-পদে অভিব্যেক করিয়া ছাড়িয়া দিতেন । তাহারও সাধুত্ব লাভ করিয়া আপনাকে ধম্ম মনে করিত । আবুল মজাফ্ফার বলিয়াছেন, তাঁহার দরবারে প্রত্যহ শত সহস্র সাধু, ফকির, গরিব, অনাথা ও নিরাশ্রয় লোক থাকিত, তিনি তাহাদের সহিত এমন মাধুর্য্য ভাষণ

বাক্যালাপ করিতেন যে, তাহাতে সকলেই মনে করিত পীর সাহেব সর্বজন অপেক্ষা আত্মকেই অধিক ভাল বাসেন । সর্বদা দারিদ্র লোকের সঙ্গে আহার করিতেন ও তাহাদের সঙ্গে উঠা বসা করিতেন, কেহ কোন বস্তুর প্রার্থনা করিলে তাহাকে বৈগুণ্য করিয়া ফিরাইয়া দিতেন না । দাস দিগকে কখন কড়া কথা বলিয়া তাহাদের মনে ব্যথা দিতেন না, তাহারা কোন কৃতি করিলে, তাড়না না করিয়া ধৈর্য ধারণ করিতেন । কোন দাসকে বেশী পরিশ্রম করাইয়া লইতেন না এবং তাহাদের কোন বস্তুর অনাটন হইলে সময়ে সময়ে দিয়েও সাহায্য করিতেন । তিনি পার্থিব ভোগ বিলাসে সম্পূর্ণ স্পৃহাহীন ছিলেন । তাহার আহার্য ও পরিধেয় পরিচ্ছদের কিছুমাত্র অভাব ছিল না । তাহার পরিধেয় বস্ত্র ও অঙ্গাবরণ জাঁক-জগক বিহীন অতি অল্প মূল্যের ফকিরী সাজসজ্যা ছিল ; তবে পরিধেয় জামা লম্বা মৌলবীগণের পিরহানের মত । কখন কখন বেশী মূল্যের বস্ত্র ক্রয় করিয়া পরিধান করিতেন । কথিত আছে একবার কোন বনিক বেশী মূল্যের বস্ত্র বোগদাদ অধিপতি সম্রাটের কাছে লইয়া গিয়াছিলেন, সেই বস্ত্রের অধিক মূল্য বলিয়া বনিককে ফিরাইয়া দেন ; কিন্তু সেই বেশী মূল্যের বস্ত্র বড়পীর সাহেব ক্রয় করিয়া

পরিধান করেন । আবার সময়ে সময়ে এক আশরফি মূল্যের গজের কাপড় ক্রয় করিয়া পরিচ্ছদ সেলাই করাইতেন । আবুল ফজল বজাজ বলিয়াছেন, একদিন হজরত বড়পীর সাহেবের একটি দাস আমার দোকানে আসিয়া একদিনার মূল্যের গজের থান কাপড় চাহিলেন, তখন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এত উচ্চ মূল্যের বস্ত্র কাহার জন্য চাহিতেছ ? তখন সে কহিল, হজরত বড়পীর সাহেবের জন্য আবশ্যিক । তখন আমি মনে মনে বলিলাম এ কাপড় বাদসাঁ' লোকের যোগ্য, ফকির লোককে পরিধান করা উচিত নয়, তিনি ফকির লোক হইয়া এরূপ কিস্মতি বস্ত্র ব্যবহার করিতে কি লজ্জা-বোধ করিবেন না ? এইরূপ কথা বলিতে বলিতেই আমার পায়ে শুই ফুটিয়া গেল, জ্বালায় অগ্নির হইয়া পড়িলাম, সে শুইটা কিছুতেই বাহির হইল না । পরদিন পান্ধীতে আরোহণ করিয়া পীরদরবারে যাইয়া পৌঁছিলাম । তখন তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে বনিক তনয় আবুল ফজল ! কে আমার কে ফকির, তাহা তোমার অত বিবেচনা করিবার কি আবশ্যিক ছিল এবং আমাকেই বা তোমার এত তাচ্ছিল্য ভাবিবার কারণ কি ? তোমার নিজের দোষেই তুমি দৈব যাতনায় অগ্নির হইয়া পড়িয়াছ । ছি এমন নীচ প্রকৃতিকে কখনই

মনে স্থান দিও না এবং ফকির লোকের প্রতি কখনই
মন্দ বলিও না । এই বলিয়া তিনি আমার পদে হাত
বুলাইতেই শুই বাহির হইয়া গেল ; জ্বালা, যন্ত্রণা,
স্যাথা মকল নিবারণ হইয়া, পীরের কৃপায় আরোগ্য
হইলাম । পরে পীরের নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা লইয়া,
তাঁহার চরণ ধূলা গ্রহণপূর্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম ।

বড়পীর সাহেবের আহার্যের বিবরণ ।

আবু আব্দোল্লাহু বলিয়াছেন, বড়পীর সাহেবের
নির্দুষ্ক করা কিঞ্চিৎ জমি ছিল, তাহা কেবল নিজের
জীবিকার জন্য রাখিয়াছিলেন, সেই জমি স্বয়ং চাকর
সঙ্গে লইয়া চাষ করিয়া ক্ষেত্রে ফসল উৎপন্ন করিতেন ।
সেই ক্ষেত্রের সমুদয় শস্য নিজের আহার্যের জন্য রাখিয়া
দিতেন । সেই জমির শস্য হইতে প্রত্যহ চারটি রুটি
প্রস্তুত করিতেন, তাহা হইতে একটি রুটি সহচর দিগকে
খাইতে দিতেন ও তিনটি রুটি নিজে আহার করিতেন ।
বিনা ওজুতে, এবং অতিথি ভোজন না করাইয়া আহার
করিতেন না । প্রতিবাসীগণ কখন কোন বস্তু খাইতে
দিলে তিনি 'তখনই' গ্রহণ করিয়া, তাহার পরিবর্তে অন্য
দ্রব্য তাহাদিগকে খাইতে দিতেন । কিন্তু শুদ্ধ বস্তুর
তওকা বাতীত অপবিত্র বস্তুর তওকা গ্রহণ করিতেন না ।

যদি কোন সময়ে কোন বড়লোক কি বাদশা কি উজির
 খাশ্ব দ্রব্য পাঠাইতেন, কি কাফারার বস্ত্র ছজুরকে দিতেন,
 তিনি তাহা স্পর্শও করিতেন না। খেদমতগার দিগকে
 আদেশ করিতেন, উহা ফকির মিস্কিন দরিদ্র বালক
 দিগকে বণ্টন করিয়া দিতে। কখন উপবাস থাকিয়া
 রাত্র দিন কাটাইয়া দিতে, কখন ষা চল্লিশ সের
 আটার রুটী ও চল্লিশ সের কাবাব করা মাংশ
 খাইয়া ফেলিতেন। আবার এমন সময় উপস্থিত
 হইত যে সপ্তাহ কাল উপবাসে থাকিয়া না খাইয়াও দিন
 কাটাইতে হইত। তথাপি কাহারও নিকট কোন বস্ত্র
 চাহিয়া খাইতেন না। আহান্নাদ বোগদাদি ছজুরের
 খেদমতগার বলিয়াছেন, এক সময় পীর সাহেব জীবিকার
 নিরূপায় হইয়া দয়াময় প্রতিপালকের সাহায্যের প্রতি
 নির্ভর করিয়া বসিয়াছিলেন। আচানক একজন অপরি-
 চিত লোক আসিয়া, এক তোড়া স্বর্ণ মোহর সম্মুখে
 রাখিয়া বলিলেন, এই তোড়ার মোহর গুলি আপনার
 খরচের জন্য দিলাম; এই বলিয়া তখনই সেই লোকটী
 দরবার হইতে চলিয়া গেলেন। পরে তিনি আমা-
 দিগকে বলিলেন, ঐ লোকটাকে তোমরা কি চিন ?
 উনি স্বর্গীয় দূত। আজ আমি তোমাদের মাহিনা দিবার
 জন্য চিন্তা করিতে ছিলাম, আমার প্রতিপালক আমাকে

ঐ মোহর গুলি পাঠাইয়া দিয়াছেন, ইহা হইতে তোমাদের বাকি মাহিনা আদায় করিয়া দিব । আবার কোন সময়ে বাজারের অতি আবশ্যিক হইয়া পড়িলে, বাজারে যাইয়া তাহা ক্রয় করতঃ নিজেই মস্তকে করিয়া বহিয়া আনিতেন । কোন সময়ে খেদমতগার (গোলাম) বিমার পড়িলে, নিজেই হাট বাজার করিতেন, গেছ পিসিয়া আটা বাহির করিয়া রুটী প্রস্তুত করিয়া খাইতেন । মেহমান (অতিথি) সংকার নিজেই করিতেন, তাঁহাদের জন্ম কাহাকেও বেশী কষ্ট পাইতে হইত না । আপনি ঋণ্য দ্রব্যের মধ্যে দুগ্ধ, দধি, স্নাত, মধু ও মাংস অধিক ভাল বাসিতেন । সদা সর্বদা বিনা লবণে আহার করিতেন ; কাহাকে কোন বস্তুর উপলক্ষ করিয়া অধিক কষ্ট দিতেন না । একবার সাতটি পয়সার মেঠাইর জন্ম সাতজন বালককে বাজারে পাঠাইয়া, নিজে পথের ধারে তাহাদের অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহারা ফিরিয়া আসিলেই সকলেব মস্তকে হস্ত বুলাইয়া দোণা করিয়াছিলেন ।

বড়পীর সাহেবের তপস্শা করিবার বিবরণ ।

আদর্শ সাধুপুরুষ হজরত মহবুবে সোবহানি আব্দোল কাদের ছিলানী সরিয়ত, তরিকত, হকিকত ও মাযকত এই চারি প্রকার বিদ্যায় বিদ্বান ছিলেন, এবং সালেহিন সাধুপুরুষদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেণে অগ্রগণ্য । তিনি বিনা অবগাহন ও ওজু ব্যতীত, নিয়মিত পঞ্চ সময়ের উপাসনা সম্পূর্ণ করিতেন না । প্রত্যেক নিয়মিত উপাসনা সমাধা করিবার জন্য নব ওজু করিয়া লইতেন । কিন্তু চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত এক ওজুতেই সকালের ও প্রভাতের নামাজ পড়িয়া ছিলেন । সমস্ত রজনী নিজা ত্যাগ দিয়া বিশ্বপালক জগদীশ্বরের অর্চনা আরাধনায় মননিবেশ করিতেন । অষ্টাদশ বৎসর পর্য্যন্ত রজনীযোগে একপদে দাঁড়াইয়া পবিত্র কোরাণ শরিফ পাঠ করিয়া সম্পূর্ণ করিতেন । ভোরের সময় ছাদশ রেকাত তাহজ্জদ নামাজে কোরাণ খতম করিয়া সকলের পূর্বে দুইশত রাকাত নফল নামাজ পড়িয়া, এই দোতা পাঠ করিতেন ; “আলু মোহিজ্জোল আলেমোল হাসিবো আলু গায়্মালো আলু খালেকোল বাবিইয়ো আলু মোছাষেরো” ইহা বার বার পাঠ করিতে করিতে অদৃশ্য

হইয়া শূন্যভরে আকাশে উড়িয়া যাইতেন এবং আকাশ হইতে নিম্নে আসিয়া, খোদাতায়ালাকে সন্মুখে প্রণিপাত করিতেন । পবে সকাল হইলে ফরজ নামাজ সমাধা করতঃ কোরান শরিফ পাঠ করিয়া, অজ্জিফা ■ অশ্চাশ্চ জেকের উপাসনায় লিপ্ত থাকিতেন । তিনি রাত্রিকালে তাহাজ্জদ পড়িয়া তৎপরে চেহেল আসমা দোওয়া তিন শত ষাটবার এবং দোওয়া সফি, দোওয়া বানতাহায়াজ্ মত, দোওয়া বানতাহা আতরত, দোওয়া সায়ফোল্লাহ্ পড়িতেন । চাশ্ত নামাজ সম্পূর্ণ করিয়া আজমতে কেবির নামক দোওয়া বারো বার পাঠ করিতেন । জোহরের নামাজ পড়িয়া, দরুদ তাজ, দরুদ আকবর, নিরানবুই নাম খোদাতায়ালার ও নিরানবুই নাম মহাম্মদের জপ করিতেন । যখন তিনি যোগবলে মোহুহেদ মোকাম তৌহিদ স্থানে পৌঁছিতেন, তখন তাঁহাকে, কেহ দেখিতে, পাইত না অদৃশ্য থাকিতেন, সে সময় তিনি না খোদা, না তাহা হইতে পৃথক, না স্বর্গীয় দূত, না দেব, না দৈত্য, না দানব, না মানব, না মারফতে, না শব্বিত্তে, না গোপনে, না প্রকাশ্যে, না স্বর্গে, না নরকে, না আলোকে, না অন্ধকারে, না আকাশে, না পৃথিবীতে, না গৃহে, না বসিয়া, না দাঁড়াইয়া, না এসলামে না কুফরিতে, না মুসলমান, না হিন্দু, না অর্চনায়, না

বিস্মরণতায় ইহার কিছুই নির্ণয় করিবার কাহারই সাধ্য থাকিত না। তাঁহার বিষয়ে খোদাতায়ালার ব্যতীত কাহার সাধ্য নাই যে স্থির সিদ্ধান্ত করেন এ বিষয়ে আল্লাহু তায়ালাই সর্বজ্ঞ। আর তিনি সদা সর্বদা এই দোঙা পাঠ করিতেন।

আরবী দোঙা ।

কুতা কোলুবোল মোছাকিনা সাহাওলা ওলা ওকুতা
কোলুবোল আশেকিনা লাএলাহা ইল্লাল্লাহো ।

হজরত বড়পীরের নিদানকাল ।

বেহজাতুল আসরার নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ সাহাবদ্দিন, সহরদ্দি বলিয়াছেন, হিজররি পাঁচশত একষট্টি সালে রবিওল আওয়াল মাসে হজরত বড়পীর সাহেব কঠিন পীড়ায় শয্যাগত হইলেন। দিনে দিনে ক্রমেই জ্বর জীর্ণ হইয়া অন্তিমকাল নিকটবর্তী বলিয়া বুঝিয়া লইলেন। কিন্তু তাহার পরমাসে রবিওসু সানি শুক্রবার দিবস হইতে অন্ত্যস্ত ক্রান্ত হইয়া হাড়মাসে জড়িভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শেষদশা দর্শন করিবার জন্য দেশ বিদেশ হইতে শত শত সাধু, দরবেশ, ধনি, নির্ধনি, 'আলেম, পণ্ডিত, জ্ঞানী ও শিষ্যগণ আসিয়া চতুর্দিশে ঘিরিয়া বসিয়া রহিলেন।

কেহবা সর্বাস্ত্রে হস্ত বুলাইতে লাগিলেন, কেহবা পাখার বাতাস দিতে লাগিলেন, কেহবা গীরের মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, হায় ! এবার বুঝি গুরুদেব আমাদের মত শোক সাগরে ভাসাইয়া অনন্তধামে চলিয়া যাইবেন । তিনি শিষ্যগণের কাতর বচনে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, আমি জগতের সকল লোক হইতে নির্ভয়ে আছি, এবং মৃত্যু-পতি শমনকেও ভয় করি না । তৎপরই আবার বলিলেন, তোমরা স্থান প্রশস্ত কর ; সাবধান সতর্ক হও, নিঃশব্দ হইয়া আদবের সাথে বস । আমার বড়ই সৌভাগ্য যে, দয়াময় দয়ার দ্বার মুক্ত করিয়াছেন । আমার সাক্ষাৎ-লাভে দলে দলে স্বর্গীয় দূতগণ স্বর্গ হইতে আসিতেছেন ; ঐ দেখ, প্রেরিতপুরুষগণ একে একে সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইল । তখন তিনি মুছ'মুছ বলিতে লাগিলেন, ও আলায়কা আচ্ছালামো ও রহমাতুল্লাহে ও বরাকাতুছ, ও গফারাল্লাহো ও লাকুম ওাতাবা আলা আলায়কুম ।

সন্তান ও শিষ্যগণকে অন্তিম কালের
উপদেশ শুনাইবার বিবরণ ।

আনবার আহাম্মদি গ্রন্থে লিখিত আছে, মৈয়াদ

আহান্নাদ বলিয়াছেন, বড়পীর সাহেবের নিদানকালে, সৈয়দ আব্দোল ওহাব বিনয় বচনে পরম পূজনীয় পিতৃ-দেবকে বলিলেন, পিতঃ ! এই হতভাগ্য সন্তান দিগকে শেষ উপদেশ দান করুন। তখন তিনি বলিলেন, বৎসগণ ! আমি অন্তিম সময়ে তোমাদিগকে কতকগুলি সত্বপদেশ প্রদান করিতেছি, তাহা তোমরা মনযোগের সহিত শ্রবণ কর। ভ্রমে কখনও পাপ পথে পদার্পণ করিয়া কুপথগামী হইও না। অনিত্য সংসার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া অবৈধ্য বস্তু ভ্রমণ করিয়া সঞ্চিত সংকর্ষ নষ্ট করতঃ, পরকালের পথে জলাঞ্জলি দিও না। ঐকান্তিক ভক্তিসহ প্রকাশে ও গোপনে করুণাময় সৃষ্টিকর্তার স্মৃতি উপাসনা করিবে, এবং নিরূপিত পঞ্চবার নামাজ পড়িয়া শরিয়তের আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য হইবে। সেই শাসনকর্তা খোদাতায়ালা ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভয় করিও না এবং এ জীবনের আশা, ভয়সা, দুঃখ, সুখ, ভাল, মন্দ, অনাটন ও অভাব যখন যাহা ঘটে তৎ সমুদয় তাঁহার উপরেই নির্ভর করিও। আপদে বিপদে পড়িয়া কখনই তাঁহার অংশি স্থাপন করিতে প্রস্তুত হইও না। কেননা তিনি একেশ্বর অংশিহীন; এই একেশ্বর ধর্ম প্রচার করিতেই পীর, পয়গম্বর, মুনি, ঋষি, মহর্ষি, সাধু, বিদ্যান ও আলেমগণ জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

তবে যদি কোন লোক আমার বিনিময়ে খোদাতায়ালায় নিকটে প্রার্থনা করে, অবশ্য দয়াময় সয়া করিয়া তাহাকে আশু বিপদ হইতে রক্ষা করিবেন। যখন এরূপ করিলেও রক্ষা না পাইবে তখন একান্ত ভক্তিসহ ছুরেকাত নফল নামাজ পড়িয়া সয়া এখলাছ একাদশবার, দরুদ শরিফ এগারবার পাঠ করিয়া, আমার নাম এগারবার বলিতে বলিতে এগার পা এবাকাভিগুথে গমন করিবে পরে আল্লাহ তায়ালায় নিকটে প্রার্থনা করিবে যে, হে দয়াময় সৃষ্টি-কর্তা আমার বাসনা পূর্ণ করুন। অবশ্যই কৃপাময় কৃপা করিয়া তাহার আশা পূর্ণ করিবেন। কিন্তু যদি আমার নামে কোন বস্তু মানসিক করে কিম্বা আল্লা ব্যতীত আমার নিকট প্রার্থনা করে ত, মহাপাপী অংশীবাদী হইয়া নরকগামী হইবে।

হজরত বড়পীর সাহেবের পরলোক গমন।

তশারেক আওলিয়া নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ আবুল ফতে বোগদাদী বলিয়াছেন যে, রবিবার গতে সোমবারের রাত্রিতে এশার সময়ে বড়পীর সাহেব স্নান করাইয়া দিতে বলিলেন ; তাঁহার আদেশানুসারে পুত্রগণ স্নান করাইয়া দিলেন ; তিনি অবগাহন ও ওজু করিয়া, এশাব নামাজ সমাপ্ত করতঃ, তৎপরে একটা লম্বা সেজ্জদা

কতক্ষণ পরে একটি অস্তিম প্রার্থনা করিলেন ।

আরবী প্রার্থনা ।

আল্লাহোম্মাগ ফেরলে উম্মাতে মহান্মদেঁও
ও! আরহেম উম্মাতো মহান্মদেঁও
ওতাজাবেজ আন উম্মতে মোহান্মদেন
ছাল্লাল্লাহে আলায়হে ওচ্ছাল্লাম ।”

হে করুণাময় সৃষ্টিকর্তা হজরত মহান্মদের উম্মত-
গণের অপরাধ মার্জনা করিয়া, তাঁহার উম্মতের প্রতি
দয়াবারি বর্ষণ করুন । দয়াময় তাঁহার প্রার্থনা গ্রহণ
করিয়া দৈববাণী দিয়া বলিলেন, হে প্রিয় সখা । তোমার
অস্তিম প্রার্থনা গ্রহণ করিয়া হজরত মহান্মদের (দঃ)
উম্মতগণের পাপ ক্ষমা করিয়া দিলাম (১) । ইহার
কতক্ষণ পরেই মৃত্যুপাতি শমন আসিয়া, একটি লিপিবদ্ধ
কাগজ লইয়া সৈয়দ আব্দোল ওহাবের করে সমর্পণ
করিলেন । তিনি তাহা পাঠ করিয়া, পিতার সম্মুখে
ধরিলেন, তাহাতে আরবী অক্ষরে এই ঈশ্বরের পবিত্র মহা
বাক্য লেখা ছিল ।

হাজাল মাকিনুযো মেনাল মোহেবেব এলাল মোহেবুবে ।

(১) যাহারা হজরত মহান্মদ সাল্লাল্লায়হে ফালায়হে ওসাল্লামের প্রকৃত উম্মত
তাঁহারাই মুক্তি পাইবেন ।

অর্থাৎ আশকের পত্র মাস্কের নিকটে প্রেরণ করিলাম, হে বন্ধু ! বন্ধুবিচ্ছেদ হইতে শান্তিলাভ করিয়া বন্ধুর সঙ্গে মিলন করিতে শীঘ্র করিয়া আইস । তিনি এই পত্রটি পাঠ করিয়া হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন । দেখিতে দেখিতে তাঁহার জ্যোতির্ময় পবিত্র মুখমণ্ডল স্থির, ধীর ও প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল । একবার মাত্র চক্ষু উন্মীলন করিয়া : ছুরন্ত কালকে ইসারা করিয়া কি ইঙ্গিত করিলেন । তখন কৃতান্ত আজরাইল বড়পীর সাহেবের প্রতি নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিলেন । তিনি মহাবচন পাঠ করিতে করিতে ইহখাম ত্যাগ করিয়া অনন্ত স্বর্গধামে চলিয়া গেলেন । পাঁচশত একষট্টি হিজরী রবিয়ন্ সানি একাদশ তারিখ সোমবার দিবসে প্রাতঃকালে একানব্বুই বৎসর জগতে থাকিয়া, জগতের শান্তি-মাতা আদর্শ বড়পীর সাহেব আত্মীয় বন্ধু বান্ধব, পুত্র পৌত্র ও শিষ্যগণকে শোকমাগরে ভাসাইয়া স্বর্গারোহণ করিলে, সকলেই বিষন্ন ভাব ধারণ করিলেন । তাঁহার পরলোক গমনে সমুদয় আরব ও আজম নিবাসী মানবগণ শোকে অধীর হইয়া, অশ্রুপাত কবিত্তে লাগিলেন । অবশেষে সৈয়দ আব্দোল গুঁহাব পিতার শবদেহকে স্নান করাইয়া হুগন্ধ দ্রব্যে স্वासিত করিবার পরে শুভ্রবস্ত্রে ঢাকা দিয়া বোগদাদ নগরেই সমাধিস্থ করা হইল ।

অন্যাবধি সাধুগণে সকলেই সেই সমাধিস্থানে জিয়ারত করিয়া থাকেন। কিন্তু যে লোক অহঙ্কার বশতঃ, সেই পবিত্রে মহা সাধুপুরুষের কবর জিয়ারত না করেন, তখনই তাঁহার ফকিরী সাধুত্বগুণ লোপ পায় ।

হজরত বড়পীর সাহেবের সন্তান সন্ততিগণের বিবরণ ।

বেহুজাতল আসবার নামক গ্রন্থে শেখ শাহাবদ্দিন সহরদ্দাদি রহমাতুল্যা আলায়হে লিখিয়াছেন ; হজরত বড়পীর সাহেবের বাইশজন কন্যা আব দশজন পুত্রে সন্তান । প্রথম পুত্র সৈয়দ আব্দোল ওহাব তাঁহার পঁচশত বাইশ হিজরীর সাবান মাসে জন্ম গ্রহণ করেন এবং একাত্তর বৎসর জীবিত থাকিয়া মৃত্যুগুথে পতিত হন। ইহার আর একটি অপর নাম সরফদ্দিন আবু আব্দোল্যা। দ্বিতীয় পুত্র সৈয়দ শরফদ্দিন, ইনি পঁচশত তিয়াত্তর হিজরীতে পরলোক গমন করেন। তৃতীয় পুত্র সৈয়দ শামসদ্দিন, ইনি পঁচশত আটাম হিজরীতে মৃত্যুগুথে পতিত হন। চতুর্থ পুত্র সৈয়দ সেরাজদ্দিন, ইনি পঁচশত তিয়াত্তর হিজরীর সত্তরই শাবান মাসে সংসার মায়া ত্যাগ করিয়া অক্ষয় স্বর্গলাভ করেন। পঞ্চম পুত্র সৈয়দ আব্দুর বেজাক পঁচশত আটাম হিজরীতে জন্ম হয়, তার পঁচ-

শত তেরিশ হিজরীর ৬ই তারিখে সওাল মাসে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হন। ষষ্ঠ পুত্র সৈয়দ এব্রাহিম, ইনি বোগদাদ নগরে ছয় শত হিজরীর পঁচিশে জেলকদ মাসে স্বর্গারোহণ করেন। ইহার দ্বিতীয় নাম আবুলহক। সপ্তম পুত্র সৈয়দ আব্দোল্লাহ্, ইহার দ্বিতীয় নাম আবু আব্দোর রহমান। ইনি পঁচশত আট হিজরীতে ডুমিফট হন, আর সাতাশ বৎসব জীবিত থাকিয়া, পঁচশত সত্তর হিজরীর একুশে সফর মাসে নশ্বর জীবন ত্যাগ করেন। অষ্টম পুত্র হজরত আবুল ফজল সৈয়দ মহাম্মদ, ইনি ছয়শত হিজরীর সাতাশে রোমজান মাসে বোগদাদ নগরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। নবম পুত্র সৈয়দ এহিয়ে (রঃ) ইনি পঁচশত পঞ্চাশ হিজরীর ৬ই রবিওলআউয়ল মাসে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং ছয়শত হিজরীতে পবিত্র দেহ ত্যাগ করেন। দশম পুত্র সৈয়দ জিয়াউদ্দিন আবুনসর, ইনি পঁচশত ঊনচল্লিশ হিজরীর রবিওলআউওল মাসে জন্ম গ্রহণ করিয়া, পরে দামেস্ক যাইয়া বসবাস করেন, ছয়শত একাদশ হিজরীর জমাদিয়ল আথের মাসে দামেস্ক সহবেই পরলোক গমন করেন। ঐ মহাত্মাগণের বংশ হইতেই অদ্যাবধি জগতে বড়পীর সাহেবের বংশাবলী অনেক স্থানে রহিয়া গিয়াছেন ঐ

বংশাবলী দিগের বর্ণ গুরুগণকে আমার শত শত
প্রণিপাত ।

বড়পীরের হস্তে মনকের নকিরের বন্দি হইবার বিবরণ ।

আকতাবাল আসরার নামক গ্রন্থে লিখিত আছে ;
যখন হজরত মহবুবে সোবহানি আব্দোল কাদের জ্বিলানী
রহমাতুল্যা আলায়হে নখর দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন
করেন । সেই সময় শত শত সাধুপুরুষ দেশ বিদেশ
হইতে কবর জিয়ারত ভক্তি দর্শন করিতে আসেন ।
একজন মহা পরাক্রম শাবফতী মহর্ষি বিদেশ হইতে
হজরত বড়পীরের সমাধি জীয়ারত করিয়া, রজনীকালে
সমাধিস্থ স্থলে শয়ন করিয়াছিলেন । আবু মহাম্মদ
বোস্তামি .(রঃ) বলিয়াছেন, সেই মহর্ষি সাধুপুরুষ
রজনীযোগে স্বপ্নে বড়পীর সাহেবকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন, হুজুর ! আপনি মনকের নকির প্রণাকাবী
স্বর্গীয় দূতদ্বয়ের প্রশ্ন হইতে কিরূপে অব্যাহতি পাইলেন ।
তখন তিনি একটু ফ্রেকুটী করিয়া বলিলেন, হে মহর্ষি !
এরূপ প্রকার জিজ্ঞাসা না করিয়া, বরং আমাকে এরূপ
প্রকার জিজ্ঞাসা করুন মনকের ও নকির ফেরেশতাদ্বয়
কেমনে আমার হস্তে পরিত্রাণ পাইল । তখন সেই

পরম তাপসিক সাধুপুরুষটি বলিলেন, মহাজ্ঞান ! আমাকে ক্ষমা করিবেন । আপনার মহাঐশী-শক্তি বুঝিতে না পারিয়া, আপনাকে এরূপ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি ? এখন এ অকৃতজ্ঞের প্রতি সদয় হইয়া বলুন যে, আপনার হস্ত হইতে সেই সূচতুর প্রশ্নকারী ফেবেস্তাদ্বয় কিরূপ প্রকারে রক্ষা পাইল । তখন পীর সাহেব বলিলেন, ভ্রাতা ! মৃত্যুর পর একটি বড়ই কঠিন সময় নিষ্কারিত আছে, কেননা পৃথিবীতে জীবিতাবস্থায় লোক বল, সহায় বল, সকলই পাওয়া যায়, সাহায্যকারীরও অভাব থাকে না ; আজিয় বন্ধু বান্ধব সকলেই চতুষ্পার্শ্বে ঘেরিয়া থাকে । কিন্তু মৃতকে কবর মধ্যে রাখিয়া আসিলে সেই নির্জন অন্ধকারময় কবর গৃহে কেহই সাহায্যকারী থাকে না ; উহা কি জ্ঞানক সময়, যাহা মনে হইলে সর্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া যায় । যখন আমার আজিয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, এই কবর মধ্যে একাকী রাখিয়া যে যাহার স্থানে চলিয়া গেলেন, এমন সময় প্রশ্নকারী ফেবেস্তাদ্বয় ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করিয়া, তর্জন গর্জন করিতে করিতে কবর মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে ভীমরবে জিজ্ঞাসা করিল, “মানরাবোকা” তোমার প্রতিপালক কে ?” মান নাবিয়েকা, তোমার নবি শেরিত পুরুষকে ? “মান দিনোকা, তোমার ধর্ম কি ?

তখন আমি তাহাদিগকে বলিলাম, তোমরা কি মুসলমান ? না অন্য কোন ধর্মাবলম্বী ? তখন উভয়েই বলিল, আমরা মুসলমান বৈকি । তখন আমি বলিলাম, মুসলমানের লক্ষণ কি ? প্রথম সালাম করা, দ্বিতীয় মোসাফা করা, পরে অন্য কথা বলা, তোমাদের এ ছুয়ের একটাও হইল না ; আর বল আমরা মুসলমান । এমন প্রথা কোন দেশে আছে যে বিনা সালামে বিনা মোসাফায় মমিন হইয়া মমিনের সঙ্গে কথা বার্তা কহে । তখন তাহারা আমার কথায লজ্জিত হইয়া, অগ্রে সালাম করিয়া, পরে মোসাফা করিল । আমি অমনি দুই জনের হস্ত ধরিয়া বলিলাম, হে প্রস্কাৰী ফেরেশ্তাৱয় ! প্রথমে তোমরা আমার সওয়ালের জবাব দাও । পরে তোমাদের প্রশ্নের প্রতিউত্তর পাইবে । তখন তাহারা নিরুপায় হইয়া, করযোড়ে বিনয় বচনে আমাকে বলিল, আচ্ছা । কি জিজ্ঞাসা করিবেন করুন । তখন আমি তাহাদিগকে বলিলাম, যখন সৰ্ব্ব শক্তিময় সৃষ্টিকর্তা আদি পুরুষ আদম আলায়হেছাল্লামকে সৃজন করিবার মানসে, তাহাদিগকে এই পবিত্র বচনে জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন ।

“ইনি জায়েলুন ফিল আরদে খালিফাতান ।” অর্থাৎ নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি (খলিফা) পাঠাইব (১)

(১) সূরা বকর চার ককুর প্রথমে

তখন তোমরা বলিলে, তুমি কি তথায় এমন লোক সৃজন করিবে যে, সেখানে যাহারা শান্তি ভঙ্গ, রক্তপাত করিবে ? অতএব আমরা তোমার শুণের প্রশংসা করিয়া থাকি ও পবিত্রতা স্বীকার করি। এরূপ ভাবে খোদাতায়ালাকে যখন প্রতিউত্তর দিয়াছিলে, তখন তোমাদের এ কথায় কি তাঁহার আদেশের অমান্য করা হয় নাই, এ কথায় তোমাদের অপবাধ, গোঁরব, অহঙ্কার ও মাৎস্য প্রকাশ পাইয়াছিল কিনা। প্রথম তোমরা মনে করিয়াছিলে যে, খোদাতায়ালা আমাদের পরামর্শ লইয়া কার্য করিবে, তজ্জন্য আমরাই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি অনাদি অনন্তময়, যিনি নিজের মস্তব্য হইতে তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিল। তিনি কখন কাহার পরামর্শ লইয়া কার্য করেন না, কেবল তোমাদের মন পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। দ্বিতীয় তোমরা আপনাদিগকে উত্তম জানিয়া, সকল মানবগণকেই বিবাদী অত্যাচারী, রক্তপাতকারী বলিয়া স্থির করিয়াছিলে। কিন্তু তোমরা ইহা বুঝিলে না যে, মানবগণের মধ্যে এমন লোক অনেক হইবে, যাহারা সাধুতায় তোমাদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠতা লাভ করিবে। তৃতীয় তোমরা এরূপ অনুমান করিয়া বলিয়াছিলে যে, প্রথমেই জেনেরা যখন পৃথিবী মধ্যে গিয়া অত্যাচারী হইয়াছিল, তখন

আদমের বংশগণ খোদাতায়ালার অর্চনা না করিয়া দৈত্যগণের স্যায় অত্যাচার করিয়া বেড়াইবে । যখন তোমরা এরূপ ভাবিয়া, জ্ঞানময় খোদাতায়ালার জ্ঞান অপেক্ষা নিজেদের জ্ঞান অধিক ভাবিলে, তখন তিনি তোমাদিগকে এই পবিত্র বচনের দ্বারায় চৈতন্য করিয়া দিবেন ।

আয়েত ।

কালো ইরি আলামো মালা তালামুন ।

অর্থাৎ নিশ্চয় আমি যাহা জানি তাহা তোমরা জানিতে পাব নাই । যখন তোমরা এরূপ প্রভু কর্তৃক জ্ঞানময় বাণী প্রাপ্ত হইলে, তখন তোমরা নিঃশব্দ হইয়া চূপ করিয়া রহিলে । কেমন এ কথা সত্য কিনা ? এখন তোমরা, আমার এ প্রশ্নের প্রতিউত্তর দিয়া, তোমাদের প্রশ্নের উত্তর আমার নিকট হইতে অবশ্যই লইতে পার, নতুবা আমি কখনই তোমাদের হাত ছাড়িয়া দিব না । মনকের ও নকির গীরের মুখে এরূপ নিজেদের পুরাতন অসম্ভব প্রাচীন কথা শুনিয়া এক বারেই তাজ্জব হইয়া পড়িল এবং তাহারা অনেকক্ষণ ধরিয়া আমার সওয়ালের জবাব দিবার জন্য বুদ্ধি খাটাইয়া দেখিতে লাগিল । কোন প্রকারে তাহাদের জ্ঞানে আমার কথার উত্তর দিতে

যোগাইল না বলিয়া, শেষে আশাব হাত হইতে পলায়ন করিবার চেষ্টাও পাইতে লাগিল । তাহাদের সেকুট বুদ্ধি পলকেই লয় পাইয়া গেল । অবশেষে সকল দিকেই নিরুপায় হইয়া, মনকষ্টে ছল ছল নেত্রে এ উহাব মুখদিকে চায়, সে তাহার দিকে দৃষ্টিকরে । দর্শকগণ তখনকার তাহাদের সে ভাব দর্শন করিলে সত্য সত্যই মনে করিবেন, না জানি ইহারা কতই অপরাধি হইয়া আজ চোরের মত পীর হস্তে বন্দী । তাহারা আদিপুরুষ হইতে এযাবৎ কাল যে, প্রশ্ন করিয়া আসিতেছিল, একদিনের তরে এমন কঠিন ভাবে কাহারও হস্তে বন্দী হয় নাই এবং এরূপ দুর্দশা সংঘটন হইবে বলিয়া স্বপ্নেও ভাবে নাই, অবশেষে পলাইবার জগ্য আর একটা বুদ্ধি খাটাইয়া আমাকে কহিল, কেবল আমরা দুজনে ত একথা বলিনাই ; আমরা সমুদয় ফেরেস্তাগণ একত্রে হইয়া বলিয়াছিলাম । তবে কেমন করিয়া দুইজনে এ কথার জবাব দিতে পারিব ? এখন আমাদের দুইজনকে ছাড়িয়া দিন । একটু পরে সকলের নিকট হইতে জবাব আনিয়া আপনার কথার প্রতিউত্তর করিব । তাহাদের মনোগত ভাব বুঝিয়া কহিলাম, তোমরা যদি ফিরিয়া আর না আইস, তখন আমি তোমাদের দেখা কোথায় পাইব তবে এই পর্যন্ত করা যাইতে পারে, একজনকে ছাড়িয়া দিতেছি ।

সকলের পক্ষ হইতে জবাব আনিয়া দাও । তাহারা তাহাতেই স্বীকার পাইলে, আমি মনকের কে ছাড়িয়া দিলাম । সে তখনই স্বর্গে গিয়া সকল ফেরেশতার নিকটে উক্ত প্রমাণ প্রকাশ করাতে তাঁহারা প্রমাদ গণিয়া পূর্ব্ব-কর্ম্মের ফলাফল চিন্তা করিতে লাগিল। কেহই তাঁহার কথার কোনই উত্তর করিতে পারিল না, তখন মনকের দয়াময় খোদাতায়ালাকে জানাইল, হে অনাদি অনন্ত-ময় অন্তর্য্যামী । এ দায় হইতে রক্ষা করুন, আজ আপ-নার দূতগণ বিষম সমস্যায় পতিত । নিরুপায় দিগের মানব হস্তে রক্ষা পাইবার উপায় করিয়া দিন তখন প্রভু বাণী হইল, তোমরা আদম আদিপুরুষের সময়ে যে কথার আপত্তি করিয়া অপরাধি হইয়াছিলে, তাহা আজ তাঁহার বংশাবলী মহা তাপস প্রবর বড়গীর সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন । এখন তোমরা তাঁহার নিকটে যাইয়া অপরাধ স্বীকার করিয়া, ক্ষমা প্রার্থনা কর । কেন না তিনি যে পর্য্যন্ত তোমাদিগকে ক্ষমা না কবিবেন, সে পর্য্যন্ত তোমাদের সকলই দায়িত্ব হইয়া বহিবে । অনন্তব সমুদয় স্বর্গীয়দূতগণ একে একে সকলেই আমার নিকটে আসিয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া, নিজদের দোষ স্বীকার পাইয়া, অপরাধ মার্জনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল । আমি হটাৎ তাহাদিগকে ক্ষমা না করায়, দয়াময়

খোদাতায়ালার আদেশ হইল, হে সখা! আগার ফেরেস্তাগণকে ক্ষমা করিয়া দাও। আমি উপযুক্ত সময় বুঝিয়া, করুণাময় সৃষ্টিকর্তার নিকটে গর্ষ করিয়া বলিলাম, দয়াময় করুণাসিন্ধু! আজ উপযুক্ত সময় পাইয়াছি? অগ্রে আপনি স্বীকার করুন যে, মনকের নকির প্রশ্নকারী-দ্বয়ের প্রশ্ন হইতে আগার শিষ্য ও শিষ্যের শিষ্য এরূপ পরস্পর শিড়ি অনুযায়ী সেজরা দৃষ্টান্ত শিষ্যগণ, যদি উহাদের প্রশ্ন হইতে নিরাপদ থাকে, তবে আমি এখনই উহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিব। তখনই প্রত্যাদেশ হইল হে সখা! তোমার প্রার্থনা গ্রহণ কবিলাম, উহাদের অপরাধ মার্জনা করিয়া দাও। তখন আমি তাহাদের পূর্বকৃত অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিলাম। তবে প্রশ্নকারী ফেবেস্তাদ্বয় আমার হস্তে মুক্তিলাভ করে।

বড়পীর সাহেব কবর হইতে তিন শত
লোককে মুরিদ করেন।

আখিয়ারাল আওলিয়া নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ আবুল ফাতেহু (রঃ) বলিয়াছেন যে, দামেস্কের অধিবাসী একজন ধনাঢ্য বণিকের বাসনাছিল যে, বড়পীর সাহেবের হস্ত স্পর্শ করিয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া, পরকালের জন্য কিঞ্চিৎ অমূল্য বস্তু সংগ্রহ করিয়া লইব।

কিন্তু বাণিজ্য কার্যে লিপ্ত থাকায় নানা বাজারে পড়িয়া, ক্রমান্বয়ে বিলম্ব হইয়া পড়িল । এদিকে বড়পীর সাহেব দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন । কিছুদিন পরেই বনিক তনয় সংসার কার্য হইতে অবসর পাইয়া, আপনার দলবল সহকারে বোংগদাদ শরিফে আসিয়া উপস্থিত হইল । তথায় আসিয়া লোকগুণে বড়পীর সাহেবের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া, অত্যন্ত শোকাফুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল । অবশেষে তাহার মাজার শরিফ জিয়ারত করিতে সমাধিস্থানে প্রবেশ করিয়া কেবল চীৎকার ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে অচেতন হইয়া পড়িল, ক্রমে রাত্র হইয়া গেল, তথাপি চেতন হইল না, কাজেই তাহার সঙ্গিগণ মাজার শরিফেই রাখিয়া গেল । পীর-সাহেব তাহাব ভক্তিতে আবদ্ধ হইয়া, বনিকের মনোবাঞ্ছা পূরাইতে স্বর্গীয়কায় কবর হইতে উত্থান হইয়া হস্ত প্রসার করিয়া দিলেন । তখনই বনিক-তনয় চেতন প্রাপ্ত হইয়া, হজুরকে সালাম করিয়া দাঁড়াইল । হজরত বড়পীর সাহেব তাহার হস্ত ধরিয়া (বয়েত) অনুমরণ ভ্রতে দীক্ষিত করিয়া দিলেন । তখন একে একে বনিক-দলম্ব সগুদয় লোক হজরতের হস্তে হাত দিয়া মুরিদ হইয়া গেল । বনিকতনয়কে লইয়া তিনশত একজন লোককে মুরিদ করিয়া, তাহাদিগকে মারফতি (গুপধনে) বিভূষিত

করিয়া বিদায় করিয়া দিলেন । পাঠকগণ ! নিশ্চয় জানিবেন সাধুপুরুষগণ খোদাতায়ালাব নিকট জীবিত, তবে পৃথিবীর লোকের নিকট অদৃশ্য ।

একজন মহাপাপী বড়পীরের কবরের
জঞ্জাল মুক্ত করিয়া মনকের নকি-
রের হস্ত হইতে রক্ষা পায় ।

সরে নছুছ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, শেখ আবু মৈয়াদ কিলুলি হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, বোংদাদ নগরে একজন মহা দুর্দান্ত গুণ্ডা বাস করিত, তাহার পাপ কার্য ব্যতীত পুণ্য কার্য কখনই ছিলনা, সর্বদাই পাপ কর্মেই লিপ্ত থাকিত । এমন কি সুরাপান, পরদার হরণ, নৃত্য, গীত, আমোদ প্রমোদ সকলই করিত, জন্মে নাশাজ, রোজা, দান-খায়রাত, এ সকল সংকর্ম কিছুই করে নাই এবং মুরিদ হইয়াও ছিল না । কিন্তু হজরত বড়পীর সাহেবের উপর যাবপর নাই ভক্তি ছিল । সেই পাপী যখনই কোন কার্যে গমন করিত, তখনই স্নান করিয়া পীরের মাজার শরিফ গিয়া সূফের পাতা, জঞ্জাল ইত্যাদি মুক্ত করিয়া দিত । পরে অন্য কাজে গমন করিত । এইরূপ প্রকারে কবরের জঞ্জাল মুক্ত করিয়া জীবন কাটাওয়া অবশেষে কালের করাল গ্রাসে পতিত হইয়া

মৃত্যু হইল । গ্রামবাসীগণ তাহার সংকার্য্য করিয়া কবর দিয়া আসিলে, মনকের ও নকির ফেবেস্তাদ্বয় তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে বিকট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কবরমধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, রে মানব-তনয় ! তোমার প্রতিপালক কে ? তখন সে কহিল, যিনি সমুদয় জীবগণকে প্রতিপালন করিয়াছেন, তিনিই আমার পালনকর্ত্তা । পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নবি কে ? উত্তর হইল, আব্দোল কাদের জ্বিলানী । বিপরীত উত্তর শুনিয়া ফেবেস্তাদ্বয় অবাক হইয়া রহিল । আবার প্রশ্ন কবিল, তোমার ধর্ম্ম কি ? সেত ধর্ম্ম কাহাকে বলে জানিত না, তবে ধর্ম্ম প্রচারক বড়পীর সাহেব কে জানিত । সেই জ্ঞানে উত্তর দিল, আব্দোল কাদের জ্বিলানী ; তখন তাহার তাহার বিপরীত জবাব শুনিয়া, কঠিন শাস্তি দিবার ইচ্ছা করিল । অমনি অনাদি অনন্তময় অন্তর্য্যামী, কৃপাময় করুণাসিন্ধু, ফেবেস্তাদিগকে কহিলেন, ক্ষান্ত হও, ও ব্যক্তি সত্য সত্যই শাস্তি পাইবার উপযুক্ত বটে, কেন না জগোও কুকর্ম্ম ব্যতীত সংকর্ম্ম করে নাই । তবে আমার সখা আব্দোল কাদের জ্বিলানীর পবন ভক্ত ও আশক্ত এবং জগতে তদ্রূপ অনুযায়ী কার্য্য করিয়াও ছিল । নিজের প্রতিজ্ঞা হইতে একদিনের জগোও বিস্মৃত হয় নাই । তর্জ্জন্য উহার সকল অপরাধ ক্ষমা

করিয়া দিলাম এবং উহার কবর প্রশস্ত করিয়া স্বর্গে
তুল্য করিয়া দাও। দয়ান্বয়ের অশ্রুত্যাগে তখনই মহা-
পাণ্ডুর কবর স্বর্গের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়া গেল। অতএব
বুঝা গেল যে, ভক্তিতেই মুক্তি।

সৈয়দ মুখ্‌ছুম সাহেবের গুণবিদ্যা বিন্যস্ত হয়।

বেসালাতুল আওলিয়া নামক গ্রন্থে লিখিত আছে,
সৈয়দ হাশেম আলুই বিজাপুরি রহমাতুল্লা আল্লায়ছে
বলিয়াছেন, মুখ্‌ছুম বান্দহ্ নেয়াজ সাহেব, ইনি শরিয়ত,
গারফত, হকিকত সকল প্রকার বিদ্যায় মহা বিদ্বান
ছিলেন। ইহার বসবাস ডেকান মুল্লকের নিকটবর্তী
গুলবর্গা শরিফ। একদিন হজরত মুখ্‌ছুম সাহেব
আপনার কক্ষে বসিয়া শিষ্য ও অন্য অন্য লোক সহ
কথোপকথন করিতেছিলেন। সেই সভায় নানাদেশের
বিবিধ পীরসাহেব দিগের গুণকীর্তন হইতেছিল। এক
একজন এক একদেশেব সাধুর বর্ণনা করিয়া মোজ্‌লেসকে
গোলজাব করিয়া তুলিয়াছিলেন। সেই মোজ্‌লেসে
একজন বোয়দাদ নিবাসি দেশ পর্যটনকারী মুন্সী বসিয়া-
ছিলেন, তিনিও আমোদে উৎফুল্ল হইয়া, হজরত মহবুবে
সোবহানি আব্দোল কাদের জ্বিলানি বড়পীর সাহেবের

আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কেয়ামতের কথা বর্ণনা করিতে লাগিলেন । বড়পীর সাহেবের কেয়ামতের কথা শুনিয়া, হজরত মুখ্‌দুম সাহেব তাঁহাকে বলিলেন, বাপু হে ! তুমিত অস্ত্রলোক, সাধুগণের চরিত্রের বিষয় সকল কথাত বুঝিতে পার না । বড়পীর সাহেব তাঁহার সময়কালে পাঁচশত হিজরিতেই সাধুতায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন, এই সাতশত হিজরীর মধ্যে এখন আমি যে সাধুতায় সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ ডাহাত তুমি জান না । যেমন তাঁহার মুখে এই কথাটী উচ্চারণ হইল, অমনি তাঁহার আলোকিত অন্তঃকরণে দৈব কালিমা পড়িয়া অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল । পলকের মধ্যে বহুকক্ষের উপার্জিত অমূল্য ফকিরী ধন লোপ পাইল । তখন তিনি মণিহাৰা ফণির মত অন্ধকারে হাত পা আছাড়ে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন । মদগর্বিবভ সাধু মুখ্‌দুম সাহেব একবারেই সঞ্চিত পুঞ্জি হারা হইয়া হায় হায় করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । কোথায় গেলে যে হারাধন প্রাপ্ত হইবেন, প্রাণপণে তাহার চেষ্ঠা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই ফলোদয় হইল না । অবশেষে নিরুপায় হইয়া, আপন গুরুদেব হজরত রোসন-জমির নছিরদ্দিন চেরাগ দেহুলি বহমাতুল্লা আলায়হের নিকটে যাইবার ইচ্ছা করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন । অনেক দিবসেব পরে দিল্লি আসিয়া, আপন দুর্দশার কথা

গুরুদেবের নিকট বর্ণনা করিয়া শুনাইলেন । হজরত নছিরদ্দিন চেরাগ দেহ্লি, বড়গী:বর সানে বে আদবীর কথা শুনিয়া প্রথমে কাঁপিয়া উঠিলেন । পরে আপন শিষ্য মখ্‌ছুম সাহেবকে অনেক লাঞ্ছনা করিয়া বলিলেন, আমার ক্ষমতা নাই যে, তোমার সাহায্যের জন্য বড়গী:বর সাহেবকে কিছু বলিতে পারি । তবে তোমার গোপা-রেনের জন্য আমার গুরুদেব সোলতানল মশায়েখ নেজামদ্দিন রহমাতুল্লা আলারহের নিকটে নিবেদন করি । এই বলিয়া তিনি শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া নির্জন কক্ষে বসিয়া ধ্যান যোগে (মোবাকিবায়) আপন গুরুদেব নেজামদ্দিন সাহেবকে আহ্বান করিলেন । তাঁহার পরমাআ উপস্থিত হইলে সকল ঘটনাই বলিলেন । তখন তিনি বলিলেন, আচ্ছা একটা উপায় অবলম্বন করিতেছি । ইহা বলিয়া তিনি, প্রেরিত পুরুষ হজরত মহাম্মদ মস্তোফা (সঃ) কে সাধনাবলে আনয়ন করিয় তাঁহাকে বলিলেন, হে অকুলের কাণ্ডারী ভবপারের কর্ণধার ! মখ্‌ছুম বান্দা গিয়াজের উপায় কি হইবে বলুন ? তখন তিনি বলিলেন, বড়গী:বর সাহেবকে এ বিষয়ের জন্য অনুবোধ করিতে আমি পারি না, তবে জগজ্জননী ফাতেমা খাতুন আমার স্নেহের জনয়াকে ডাকাই । তখনই জগজ্জননী ফাতেমাদেবীর আআ উপস্থিত হইলে, হজরত রহুলোলা তাঁহাকে বলি-

লেন, মা ফাতেমা ! তোমার বংশধর রত্নকুল চুড়ামণি আব্দোল কাদের জ্বিলানী অবশ্যই তোমাব কথা রক্ষা করিবেন । তুমি তাঁহাকে বলিয়া কহিয়া, কৃত অপরাধী মথ্‌তুমের অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া দিতে বল । হজরত ফাতেমা দেবী পিতৃ আজ্ঞা পালন করিতে, বড়পীর সাহেবকে আহ্বান করিলে, তিনি তখনই আসিয়া উপস্থিত হইলেন । পবিত্রপুরুষগণের আত্মা একত্রিত হইলে যে কি মনোহর ভাব ধারণ করেন, তাহা পাঠক-গণ কখন যদি কেহ ভাগ্যাগুণে, সেই পবিত্রপুরুষগণের একত্রিত ভাব স্বপ্নে কি যোগবলে কি ধ্যানেন দর্শন করিতেন তবে জগ্নের সার্থকতা লাভ করিয়া নিজেকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতেন এবং সে মাধুর্য্যভাব বুঝিতে পারিতেন । ধন্য, মহাতাপসকুল চুড়ামণি নসিরদ্দিন চেরাগ দেহুলি ধন্য ! তুমি জগতে যোগবলে যে রূপ দর্শন করিয়াছ, তাহাতে তোমার সকল সাধ পূর্ণ হইয়াছে । বলি হে তাপস-প্রবর তুমি কি ঐ সকল জ্যোতির্ম্ময় রূপ দর্শন করিয়া কি নেহুলির প্রদীপ হইয়াছ ? না অন্য আর কোন গুণ ছিল ? ধন্য তুমিই জগতে এই অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া ধন্য হইয়াছ । হও ধন্য হও ! আমিও তোমার পবিত্র মাজার শরিফ ভক্তিভাবে দর্শন (জেয়ারত) করিয়া ধন্য হইয়াছি ।

বড়পীর সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া, হজরত ফাতেমা

খাতুনে জেমাত (বাঘি ভায়া আনহা) বলিলেন, হৃদয়স্বয়ং
 বৎস আব্দে'ল কা'দের ! আজ তে'মারি জন্ম আগ'দের
 সকলেব আগমন। প্রাণাধিক ! এখন দু'গ আমা'ব
 বিনিময়ে, মথ'দু'গ বান্দা নিয়াজেব অপবাধ মার্জনা কবিল্লা
 উহাকে ক্ষমা কবিয়া দাও। তখন তিনি বলিলেন, মা
 জগজ্জননী ! আপনার আচ্ছা অবাধেই পালন করিব।
 তবে আমি ইচ্ছা করিয়া উহাব ফকিরী ধন কাড়িয়া লই-
 নাই, উনি নিজেব দোষেই সে ধন হারা হইয়াছে।
 এতদূর আশ্পর্কী যে, আনা হইতে উচ্চপদ লাভ করিতে
 চায় এবং লোক সাফাতে নিজের আত্মগরিমা করিয়া
 থাকে যাহা হউক এখন আপনার আদেশ মান্য
 করিয়া, উহাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। তৎপরে বড়পীর
 সাহেব মথ'দু'গ বান্দা নিয়াজেব দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন,
 জাত মথ'দু'ম ! তুমি তে'মার গুরু হইতে যে গুণ
 ফকিরী ধন সংগ্রহ করিয় ছিলে, এখন তা'হা তুমি প্রাপ্ত
 হইলে এবং আমা হইতে বিত্ত মাবফতি গ্রহণ কর।
 আমি তে'মাকে প্রসন্ন : নে দানি কবিলাম। গুরুদেবের
 সাহায্যে বড়পীরের রূপ 'মথ'দু'গ বান্দা নিয়াজ তৃতীয়-
 গুণ গুণবিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া আনন্দমনে গুলবর্গী শরিকে
 ফিরিয়া গেলেন। হে পাঠকগণ ! এই জন্মই উপযুক্ত সদ্গুণ
 বিভূষিত গুরুদেবের কাছে শিক্ষালাভ করিয়া মনস্কামনা

সিক্কি করিতে হয় । হজরত মখ্‌ছুমের উপযুক্ত ওরু হজরত নসিরদিন চেবাগ, দেহুলি না থাকিলে, উঁহার দুর্দশার একশেষ হইত (১) ।

বড়পীর সাহেবের জুতা ও পিরহান চুরি কব্রিয়া নবাবের নবাবি নফ্ট ।

হজরত মহবুবে সোবহানি আব্দোল কাদের জ্বিলানি বড়পীর সাহেবের বংশধর, সৈয়দ আবুল মজ্জাফফার কাদরী দানাপুৰ নিবাসী ইঁহার গৃহে প্রায় ছয়শত বৎসব হইতে ক্রমাগত পরম্পর বংশাবলী বড়পীর সাহেবের একজোড়া জুতা ও একটি পিরহান সকলের কাছ হইতে, আবুল মজ্জাফফাবের হস্তে পৌঁছিলে, ইনি অতি যত্ন সহকাবে তাহাকে রক্ষা করিয়া রাখিলেন । সময়ে পাছুকাছুটা চখে মুখে লাগাইয়া কতই আনন্দ উপভোগ করিতেন । প্রতি বৎসরে রবিয়সুমানির এগারুই তারিখে সেই অমূল্য পাছুকা দুইটা বাহির করিতেন ঐ দিন সহরের আমির, ফকির, গরিব ধনবান প্রায় শত শত লোক, তাহা দেখিব'র

(১) হিন্দুস্থানের পাঞ্জাবতনের মধ্যে নছিরদিন একজন । প্রথম মইনদিন চিশ্‌তি, দ্বিতীয় কোতোবদিন বখতিয়ার কাকি, তৃতীয় ফরিদ-উদ্দিন গঞ্জসকর, চতুর্থ নেওয়ামদিন জরিজব বক্স চিশ্‌তি, পঞ্চম নছিবদিন চেবাগ দেহুলি এই পঞ্চজন ।

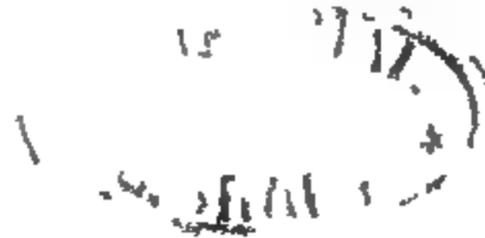
জন্ম জড় হইত । সেই পাছুকা ছুটি চোখে মুখে বুলাইয়া সকলেই আপনাকে ধন্য মনে করিতেন । ঐ কারণেই দানাপুর মধ্যে আসদহাম উপলক্ষে পাছুকা দর্শন অভিলাষে সহস্র সহস্র লোকের সমারোহ হইত । একবার আবুল মজাফ্ফার দিল্লী দর্শন মানসে পাছুকা ছুটি ও পিরহানটী গাঁঠবিতে বান্ধিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন । যে সময় তিনি দিল্লী সহবে উপস্থিত হইলেন । সে সময় বড়ই গোলযোগ । ঐ সময় খোরশান অধিপতি সত্ৰাটী নাদের সাহ পারস্ত-রাজ্য জয় করিয়া এবং বহু সংখ্যক পারস্তবাসী সৈন্য লইয়া কাবুল ও কান্দাহার অতিক্রম পূর্বক ভারতবর্ষে আসিয়া, লাহোর অধিকার করিয়া কর্ণাল মহান্মদ সাহকে পরাজিত করেন । মহান্মদ শাহ দিল্লীরাজ, নাদির শাহার স্মরণাপন্ন হইলে, নাদির শাহ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দিল্লি রাজধানি আক্রমণ করিতে আইসেন । নাদির সাহ যখন সৈন্যসহ পথে আসেন তখন দিল্লিবাসীগণ সংবাদ পাইয়া, প্রাণের ভয়ে ও ধন লুণ্ঠনের ভয়ে একেবারেই সমাক্রান্ত হইয়া পড়িল । ধন, রত্ন, ঐশ্বর্য্য, ঘর কন্নার জিনিষপত্র ইত্যাদি লুকাইয়া রাখিবার জন্য সহরে ছুটাছুটা পড়িয়া গেল । আবুল মজাফ্ফার সহরবাসীদের ছুটাছুটা দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, আগিত ফকির মানুষ, তাহাতে আবার যিনেশী লোক,

সঙ্গে এমন কিছু সম্পত্তি নাই যে, ভাবনা করিতে হইবে । যেখানেই থাকিবা কেন, ও সব ভাবনা করিবার আবশ্যিক কি । তবে একটা ভাবনা টাকাকড়ি হইতেও অধিক ; আমার ঐ গাঁঠরিতে পাছুকা ও পিরহান যাহা আছে, তাহা যদি কোন পাষণ্ড সৈনিক কাড়িয়া লয় তখন কি করিব । যদি এমন দুর্লভ বস্তু হারাইয়া বসি তবে আমার শূন্য জীবনেই বা কি ফল । তাহা হইতে আগেই সতর্ক হওয়া ভাল, কথায় বলে সাবধানের বিনাশ নাই । আবুল মজাফফার অনেকক্ষণ ভাবা চিন্তার পরে, মনে মনে এই যুক্তি স্থির করিলেন যে, আমার গাঁঠরি নবাব জেকরিয়া খান বাহাদুরের বাটীতে গচ্ছিত রাখিয়া আসি, তিনি সৎচরিত্রে স্বভাবের লোক, শুনেছি পরবস্তু প্রাণগণ চেষ্টায় রক্ষা করেন । দ্বিতীয়ত উহার ওখানে কোন শত্রুর ভয় নাই, দুর্গের ন্যায় চতুর্দিকেই প্রাচীর, দ্বারে শত শত সৈন্য দ্বার রক্ষকে নিযুক্ত, অর্থাৎ তিনি একজন সম্ভ্রান্ত মান্যমান লোক, অথ্রে হইতেই নাদির শাহার সহিত পত্রের দ্বারায় একটা বন্দবস্ত করিয়া রাখিবেন । সৈয়দ মজাফফার সাহেব এই মনে করিয়া গাঁঠরি হস্তে নবাব সাহেবের নিকটে গিয়া বিনয় বচনে কহিলেন, হুজুর ! আমার গাঁঠরিটা গচ্ছিত রাখিবেন ? নবাব বাহাদুর

জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার এ গাঁঠরিতে কি আছে ?
 সৈয়দ সাহেব কহিলেন ইহাতে আশাব ছুই প্রকার
 অমূল্য বস্তু আছে, প্রথম প্রকার হজরত বড়পীর
 সাহেবের পাদুকা, দ্বিতীয় প্রকার তাঁহার পবিত্র
 অঙ্গের একটি পরিচ্ছদ । ইহা শুনিয়া নবাব সাহেব
 বলিলেন, আচ্ছা রাখিয়া যান তৎক্ষণ্য আপনারকে
 কোন চিন্তা করিতে হইবে না, চাইবা মাত্রই আপনার
 বস্তু আপনি পাইবেন । সৈয়দ সাহেব চলিয়া গেলেন ।
 নবাব বাহাদুর অতি যত্নসহকারে সেই গাঁঠরিতে
 লইয়া আপনার ধনাগারে রাখিয়া দিলেন । এদিকে
 নাদের সাহ সৈন্যসহ দিল্লিতে প্রবেশ করিয়া যেখানে
 ঘাहा পাইতে লাগিল তাহা লুণ্ঠন করিয়া আত্মসাৎ
 করিতে লাগিল । নাদের সাহ একাদশ উনচল্লিশ
 হিজরীতে দিল্লি লুণ্ঠন করিয়া অপরিমিত ধনরাশি
 লইয়া পারস্য অভিমুখে গমন করিল । যখন তাহাবা
 লোকের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া গেল তখন
 সহবে শান্তি স্থাপিত হইল । প্রাণভয়ে যেখানে যে
 পলাইয়াছিল, একে একে সকলেই আসিয়া আপনার
 ষরবাড়ী সাবাইয়া বাস করিতে লাগিল । পরে সৈয়দ
 সাহেব নবাবের কাছে গাঁঠরি চাহিলে, নবাব সাহেব
 জামা ও জুতা যোড়াটা খুলিয়া রাখিয়া যেমন কার

গাঁঠরি তেমনি ফেরৎ দিলেন। সৈয়দ সাহেব গাঁঠরি লইয়া অগ্নি গৃহে পৌঁছিলেন। অনেক দিবস অবধি জুতা ও জামা না দেখিয়া পাগল প্রায় হইয়াছিলেন, ওজু ও অবগাহন করিয়া তাড়াতাড়ী গাঁঠরি খুলিয়া দেখিলেন যে, পিবহান ও পাছুকা কিছুই নাই, খালি গাঁঠরি মাত্র আছে, তখন হতাশ হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। পরে নবাবের ধূর্ততা বুঝিতে পারিয়া বড়ই আক্ষেপ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, পরে এশার নামাজ পড়িয়া মনস্থখে ঐ বিছানাতেই শুইয়া পড়িলেন তখনই চক্ষু তন্দ্রা আসিল। কতকক্ষণ পবে হজরত বড় সাহেবকে দেখিয়া নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন যে, সম্মুখে হজরত বড়পীর সাহেব দাঁড়াইয়া আছেন। যখন চাঁরচক্ষু একত্র হইল বড়পীর সাহেব বলিলেন, মজাফ্ফার! তুমি আমার পরিচ্ছদ ও পাছুকার জন্য কেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া আছ? আমার পাছুকা ও জামা তোমার গৃহের মধ্যেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। নবাবের সাধ্য কি যে, আমার পাছুকা ও জামা অপহরণ করিয়া বাখিয়া দেয়। সে যেমন তোমার সঙ্গে ধূর্ততা করিয়া চাতুরি করিয়াছিল, দেখিতে পাইবে কিছুদিন পরেই এই ধূর্ততার প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। এই বলিয়া সেখান হইতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। মজাফ্ফার

তখনই উঠিয়া পরিচ্ছদ ও পাছুকা দেখিয়া যাত্রপর নাই
 আনন্দিত হইলেন। এদিকে অল্পদিন মধ্যেই গীরের
 কোপে নবাব সাহেব সমস্ত ধন জন হারাইয়া ভিখারির
 বেশে ঘারে ঘাবে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে লাগিল,
 সদাসর্বদা মুখে কেবল হায় হায় করিতে লাগিল
 সহর বাজার গলি গলি ফিরিলেও কেহ এক মুষ্টি ভিক্ষা
 দিতনা। যাহারা তাহার সে ধূর্ততা জানিতে পারিয়াছিল,
 তাহারা তাহাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিত। অবশেষে
 দোকানে বাজারে ভিক্ষা না পাইয়া, দিল্লির জামে মসজিদে
 বসিয়া পয়সা পয়সা করিয়া চীৎকার ছাড়িত, তাহাতে
 কেহবা দিত কেহবা না দিত কিন্তু ঐ অবস্থাতেই হতভাগ্য
 নবাব চোঁচায় চোঁচায়ই মারা পড়িল।



বড়পীর সাহেবের পীরি সেজ্জা ।

গওসল আজম সৈয়দ মহিউদ্দীন আব্দোল কাদের
 জ্বিলানী বড়পীর সাহেবের . পির (গুরুদেব) শেখ আবু
 সৈয়দ মখজুনি (রঃ), তাঁহার পির শেখ আবি হাসেন
 কোরশি (রঃ), তাঁহার পির শেখ আবুল ফারেয় তরতুসি
 (রঃ), তাঁহার পির শেখ আবিল ফাজেল আব্দোল
 ওহাদ তোমুমি (রঃ), তাঁহার পির শেখ আব্দোল
 আজিজ তোমুমি (রঃ), তাঁহার পির শেখ আবি বকার
 শিব্লি (রঃ), তাঁহার পির সৈয়দ তায়েফ জনিদ বোগ-
 দাদি (রঃ), তাঁহার পির শেখ আবি হাসেন সরি সকুতি
 (রঃ), তাঁহার পির শেখ মারুফ করথি (রঃ), তাঁহার
 পির সৈয়দ এমাম আলি রেজা (বঃ), তাঁহার পির
 সৈয়দ এমাম মুসা কাজেম (রঃ), তাঁহার পির সৈয়দ
 এমাম জাফর ছাদেক (বঃ), তাঁহার পির সৈয়দ এমাম
 বাকের (রঃ), তাঁহার পির সৈয়দ এমাম জয়নাল আবে-
 দিন (রাজিঃ), তাঁহার পির সৈয়দ এমাম হামিন (রাজিঃ),
 তাঁহার পির হজরত আলি কবমুল্লা অজ্জু, তাঁহার পির
 হজরত মহাম্মদ রসুলোলা সালাল্লাহো আলায়হেছালাম ।

সম্পূর্ণ ।

সূচীপত্র ।

১৯১৩

| | |
|--|----|
| প্রশংসা | ১ |
| শান্তি | ৭ |
| ভবিষ্যৎ বাণী | ৮ |
| হজরত বড়পীরের পিতৃপুরুষগণের নাম | ১৩ |
| হজরত বড়পীরের জন্ম বিবরণ | ১৪ |
| হজরত বড়পীর সাহেব মাতৃগর্ভ হইতে বাহির হইয়া ব্যাঘ্ররূপে একজন লম্পট ফাকিরের প্রাণ সংহাব করেন | ১৭ |
| হজরত বড়পীরের শিশুকালের রোড়া | ২৯ |
| হজরত আব্দুল কাদেরের প্রতি দৈববাণী | ৩১ |
| হজরত বড়পীরের বিদ্যা অধ্যয়ন করা | ৩৪ |
| বড়পীর সাহেব মাতাকে দৈব আলোক দান করিয়া সাহায্য করেন | ৩৫ |
| হজরত বড়পীর সাহেবের বোংদাদ গমন | ৩৭ |
| হজরত বড়পীর সাহেব দস্তাগগকে মুরিদ করিবার বিবরণ | ৪৩ |
| হজরত মহিউদ্দীন নামের ব্যাখ্যা | ৪৪ |
| কেরামতি কোবা | ৪৭ |
| হজরত বড়পীরের বক্তৃতা করিবার বিবরণ | ৫০ |
| বক্তৃতার সম্বন্ধে একটা জীলোকের অদৃশ্য রসাল | ৫২ |
| বড়পীর সাহেব স্বপ্নে হজরত আম্রুসা সিদ্দিকার ছুঁ পান করার বিবরণ | ৫৫ |
| বড়পীর সাহেব হজরত রসূলকে স্বপ্নে দর্শন করেন | ৫৬ |
| শুভ্র ভ্রমণকারী এক সাধুপুরুষের শান্তি | ৫৭ |
| বড়পীর সাহেব আলি আল্লাহ হইবার নিদর্শন | ৬০ |
| ভাঙ্গা ভিন্ন হইতে বাচা বাহির হইয়া *ক করিবার বিবরণ | ৬২ |

| | |
|---|-----|
| সর্পরূপী একটি দৈত্যের এসলাম ধর্ম গ্রহণ করিবার বিবরণ | ৬৭ |
| হজরত বড়পীরের আশীর্বাদে ইসানবির পুনঃ আগমন পর্য্যন্ত একটি গোক জীবিত থাকে | ৭০ |
| হজরত বড়পীরের আশীর্বাদে একজন চোর কোতব হইয়া যাইবার বিবরণ | ৭২ |
| " বড়পীরের কুকুবে একজন তপস্বীর ব্যাঘ্র সংহার করিবার বিবরণ | ৭৫ |
| একজন খৃষ্টান দবজী হজরত বড়পীরের নিকটে মোসলমান হয় | ৮১ |
| একজন এমনবাসী খৃষ্টান হজরত বড়পীরের নিকট মোসলমান হইবার বিবরণ | ৮৭ |
| হজরত বড়পীরের প্রাশ্নাৰ দর্শন কবিয়া চারিশত ইহুদীর মোসলমান হইবার বিবরণ | ৯০ |
| ধর্ম সন্ধক্ষে খৃষ্টান ও মুসলমানেব বিবাদ করিবার বিবরণ | ৯৪ |
| একজন সদাগরের স্বপ্নযোগে ডাকাতি হইয়া ধনে প্রাণে বাঁচিয়া যায় | ১০২ |
| হজরত বড়পীর সাহেব পড়ম ফেকিয়া দস্যু বধ করিয়া এক সদাগরকে রক্ষা করেন তাহাব বিবরণ | ১০৭ |
| একটি রমণীর সতীত্ব রক্ষা হয় | ১১১ |
| হজরত বড়পীরের নিকটে দোণ্ডা শিখিয়া দৈত্যপতিকে আনয়ন কবিয়া একজন লম্পট দৈত্যেব প্রাণবধ করিবার বিবরণ | ১১৪ |
| হজরত বড়পীরের আজ্ঞায় কুমরি পাখিতে কথা কয় ও পায়রাতে ডিম দেয় | ১১৯ |
| হজরত বড়পীরেব ভৃত্য সর্পরূপী জেন হত্যা করিয়া বন্দি হইবার বিবরণ | ১২১ |
| দৈব হস্ত শয়তানকে প্রহাব করিবার বিবরণ | ১২৯ |
| হজরত বড়পীরের দোণ্ডায় ডুবোতরি ও বরকতা যাত্রিসহ জীবিত হইবার বিবরণ | ১৩২ |

| | |
|--|-----|
| হজরত বড়পীর সাহেব আকসরাইগের নিকট হইতে আত্মা কাড়িয়া লইয়া অনেকগুলি লোকের জীবন দান করেন তাহার বিবরণ | ১৩৯ |
| হজরত বড়পীরের নামের গুণে পঞ্চদশ বর্ষীয় রোগী রোগমুক্ত হয় তাহার বিবরণ | ১৪৫ |
| হজরত বড়পীরের দোড়ায় বোগদাদ সহরের কলেমা বিনাশ পায় তাহার বিবরণ | ১৪৬ |
| হজরত বড়পীরের দোড়ায় একটি জীলোকের সাতটি সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া পুনর্জীবন লাভ করিবার বিবরণ | ১৪৮ |
| হজরত বড়পীর সাহেব একটি মোরগ খাইয়া পুনরায় জীবিত করেন তাহার বিবরণ | ১৫৩ |
| শেখ জালি, হজরত বড়পীরের পৃষ্ঠে পৃষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া একটি পুত্রলাভ করে তাহার বিবরণ | ১৫৭ |
| হজরত সাহাবদ্দিনের জীবন বৃত্তান্ত | ১৬১ |
| হজরত বড়পীরের ক্রপায় বিংশতি জন জীলোক পুষ্কবাণ প্রাপ্ত হয় তাহার বিবরণ | ১৬৭ |
| হজরত বড়পীর সাহেব একটি লোককে সাধু হইতে দান করেন তাহার বিবরণ | ১৭০ |
| একজন দীখরা জ্ঞান প্রেমোন্মত্ত সাধুপুরুষের বিবরণ | ১৭৫ |
| হজরত বড়পীর সাহেব আবুবকর হামামির কাওয়ালী গাওয়ান বক্ত করিয়া তাহার ফকিরি কাড়িয়া লইবার বিবরণ | ১৭৬ |
| খালী মইনদ্দিন চিশতি ও বক্তিয়ার কাকির সামান বিবরণ | ১৭৯ |
| হজরত বড়পীর সাহেব বোগদাদের বাদশাকে স্বর্গীয় সেব ফল জ্ঞাপন করিতে দেয় তাহার বিবরণ | ১৮৫ |
| হজরত বড়পীর সাহেবের হস্ত স্পর্শে স্বর্ণ মোহর রক্তময় হয় | ১৮৭ |
| হজরত বড়পীরের দান করা বস্ত পচিশ বৎসর এক রক্তময় থাকে | ১৮৯ |

| | |
|--|-----|
| হজরত বড়পীরের নিকটে সমস্তানের ছল চাকুরি | ১৯১ |
| হজরত বড়পীর সাহেব একদিনে সমস্তর স্থানে রোজা এফতাব করেন | ১৯০ |
| হজরত বড়পীরের উপাসনা শুনে শুক বৃক্ষে ফল ধরে তাহার বিবরণ | ১৯৫ |
| হজরত বড়পীর সাহেবের তপস্বী ও প্রতিজ্ঞা পূর্ণ | ১৯৬ |
| হজরত বড়পীর সাহেব নদীর জলজন্তুগণকে গুণ্ডতত্ত্ব শিক্ষা দেন | ১৯৯ |
| হজরত বড়পীর সাহেব ধ্যানের খোদা দর্শন কবির বিবরণ | ২০৩ |
| সকলের অন্তঃকরণ বড়পীর সাহেবের দিকে | ২০৪ |
| হজরত বড়পীরের হাঁবলি মজহাব ত্যাগ করিবার ইচ্ছা | ২০৫ |
| হজরত বড়পীরের হাঁবলি এমামের কবর জিয়ারত | ২০৭ |
| হজরত বড়পীর আবু হানিফার সহিত সাক্ষাত কবির বিবরণ | ২০৮ |
| হজরত বড়পীরকে বৃক্ষ আগোকদান করে | ২১০ |
| বড়পীর সাহেব মদিনার যাইরা হজরত রসূলের সমাধি জিয়ারত | ২১১ |
| বড়পীর সাহেব নরকে পাণীর শান্তি দর্শন করেন | ২১২ |
| এক পীর-শক্ত হিন্দুর শ্মশান ভূমিতে অগ্নিতে দাহন হয় না তাহার বিবরণ | ২১৫ |
| মহর্ষি নেজামদ্দিন জরিজর বকের সোলতানাল মসায়খ নাম প্রাপ্ত | ২২০ |
| বড়পীর সাহেবের ওয়াজের সমস্তর স্হচর সহ হজরত রসূলের আগমন | ২২১ |
| সাধুদিগের পীর-পদ আগম আপন স্বক্ষে ধারণ | ২২৩ |
| বিনা ওজুতে বড়পীর সাহেবের নাম লইলে জিহ্বা কাটা যায় তাহার বিবরণ | ২২৮ |
| হজরত বড়পীরের গুণের ব্যাখ্যা | ২৩০ |
| হজরত বড়পীরের নিকট পৃথিবীর চাকুরি করিবার বিবরণ | ২৩৫ |

| | |
|---|-----|
| হজরত বড়পীর সাহেবের পরিচ্ছেদেব বিবরণ | ২৩৭ |
| হজরত বড়পীর সাহেবের আহার্যের বিবরণ | ২৪০ |
| হজরত বড়পীর সাহেবের তপস্যা করিবার বিবরণ | ২৪৩ |
| হজরত বড়পীরের নিদান কাল | ২৪৫ |
| সন্তান ও শিষ্যগণকে অন্তিমকালের উপদেশ শুনাইবার বিবরণ | ২৪৬ |
| হজরত বড়পীর সাহেবের পরলোক গমন | ২৪৮ |
| হজরত বড়পীর সাহেবের সন্তান সন্ততিগণের বিবরণ | ২৫১ |
| হজরত বড়পীরের হস্তে মনকের ও নকিব বন্দি হইবার বিবরণ | ২৫৩ |
| হজরত বড়পীর সাহেব কবর হইতে তিনশত লোককে মুক্তি করেন | ২৬০ |
| একজন মহাপাপী হজরত বড়পীরের কবরের জজাল মুক্ত কবিয়া মনকের নকিরের হস্ত হইতে রক্ষা পায় | ২৬২ |
| নৈয়দ মখছুম সাহেবের গুপ্ত বিদ্যা বিনষ্ট হয় | ২৬৪ |
| হজরত বড়পীরের গিরহান ও জুতা চুরি কবিয়া নবাবের নবাবি নষ্ট হয় | ২৬৯ |
| বড়পীর সাহেবের পীরি সেজরা | ২৭৫ |



